ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথের শ্রীমুখনিঃসৃত

অমৃত বাণী

চতুর্থ ভাগ

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

[এই পুস্তকের বর্ত্তমান মূল্য]
৩৷৷০ মাত্র

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের শ্রীমুখনিঃসৃত

অমৃত বাণী

চতুর্থ ভাগ

প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু

৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—

'অমৃতবাণী কার্য্যালয়'

৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট ও

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

মুদ্রাকর—

শ্রীসুনীলকুমার বসু

"অমৃতবাণী প্রেস"

৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ-নিঃসৃত-

১। **অমৃতবাণী,** ১ম ভাগ—শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সারগর্ভ উপদেশ বাণী ; সুন্দর বড় বড় অক্ষরে ছাপা। মনোরম কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য—৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা।

২। **অমৃতবাণী,** ২য় ভাগ—সংসার, সমাজ ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সরল উপদেশ বাণী, 'অমৃতবাণী' যথার্থই অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সুন্দর বড় বড় অক্ষরে ছাপা। মনোরম কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য—৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা।

৩। **অমৃতবাণী,** ৩য় ভাগ—সংসার, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চমৎকার উপদেশ এবং সংসারে থেকে সামাজিক নিয়ম রক্ষা ক'রেও কি ভাবে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহার সহজ উপায় অতি সরলভাবে বোঝান হইয়াছে। ভাল এন্টিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর ছাপা। মনোরম কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা।

৪। **অমৃতবাণী,** ৪র্থ ভাগ—যন্ত্রস্থ।

৫। **বড়ু চণ্ডীদাস** (ধর্ম্ম মূলক নাটক)—মূল্য ১৸০ দেড় টাকা।

৬। **ভক্ত প্রসাদ** (ধর্ম্ম মূলক নাটক)—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৭। **অমৃতগীতি**—গানগুলি সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত এবং প্রত্যেকটীর সুমধুর সুর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের। মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা।

৮। **গুরুকীর্ত্তন ও শ্যামাকীর্ত্তন**—কীর্ত্তনের গানগুলি সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত এবং সুর তাঁহার নিজের। মূল্য—।৵০ ছয় আনা।

৯। **শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটী উপদেশ**—অমৃতবাণী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ বাণী কিছু কিছু উদ্ধৃত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

১০। **গোবিন্দ নাম** (সংকীর্ত্তন)—কীর্ত্তনচ্ছলে সাংসারিক ও ধর্ম্মমূলক উপদেশ। মূল্য ।০ চারি আনা।

১১। **কয়েকটী স্তব**—প্রত্যহ মঠে পাঠ করা হয়। মূল্য ।০ চার আনা।

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ

"অমৃতবাণী কার্য্যালয়"
৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৩

পরম আরাধ্যা স্নেহময়ী মা জননী,

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী যাহা পুস্তকে প্রকাশিত ও বর্ত্তমানে অপ্রকাশিত আছে তৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ আপনার সুগোচরার্থে পুনঃ নিবেদন করিলাম।

(১) '**অমৃত গীতি** ১ম ও ২য় খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিবার ১ হাজার কোরে বই ছাপান হবে এবং খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে ১ হাজার বই ছাপানর খরচ রেখে বাকী অর্থ দ্বারা মঠের যে সব মেয়েরা আমার নির্দ্দেশ মত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন কোরবে তাদের প্রয়োজনে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।'

(২) '**অমৃতবাণী** বই-এর অর্থ দিয়ে **অমৃতবাণীই** ছাপান হবে।'

(৩) 'অন্যান্য যে সব বই আছে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রয়োজন মত বই ছাপান ও বাকী টাকা বই-এর প্রচার কাজেই লাগবে।'

(৪) 'কালী—তোমার ওপর এ সব কাজের ভার রইল।'—(নিজেকে এই গুরুভার বহন করিবার অযোগ্য ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করি—ঠাকুর, আমি একা পারবো ত? শ্রীশ্রীঠাকুর গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন) "যারা গুরুগত প্রাণ প্রয়োজন মত তারা সবাই তোমায় সাহায্য কোর্‌বে। তুমি স্থির বিশ্বাস রেখো। যাঁর কাজ তিনি ঠিক করিয়ে নেবেন ও তোমায় সেইমত শক্তি ও বুদ্ধি যোগাবেন। স্থির জেনো গুরু আজ্ঞা পালন করার নামই গুরু সেবা।"

ইতি— সেবকাধম 'কালী'

১৫ই আষাঢ় ১৩৫৬ সন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

'শ্রীরামপুর মঠ'
১৭-৩-১৩৫৬

স্নেহের কালীবাবু—

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র এই সাথে দিলাম। মা, আমার ও মঠের সকলের যে কি আনন্দ এই 'অমৃতবাণী' প্রকাশের কথা শুনে তা লিখে জানাতে পারছি না। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাকে খুব শক্তি ও উদ্যম দিন তাঁর শ্রীচরণে এই নিবেদন।

আপনার চির স্নেহের
দিদি 'অন্নপূর্ণা'

'মায়ের আশীর্ব্বাদ'

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

'শ্রীরামপুর মঠ'
১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৬

পরম স্নেহের বাবা কালী ও আমার সন্তানগণ—

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আমার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করি। কালীর উপর ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত সমস্ত পুস্তকের ও তাঁর বাণী প্রকাশ ও প্রচারের সকল ভার দিয়েছেন। এই কাজে বাবা কালীকে তোমরা সবাই সহায়তা কোর্বে। ইহা কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের 'অমৃতবাণী' প্রকাশ ও প্রচার।

এই 'অমৃতবাণী' ভবিষ্যতে ঘরে ঘরে বিশেষ শান্তি দেবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা শ্রীমুখে বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্ব্বস্ব এইভাবে যে যত ভালবেসে তাঁকে আপন কোর্‌তে পারবে তার মানব জীবন তত পূর্ণ ও সহজে ধন্য হবে। এর চেয়ে সহজ উপায় এ যুগে আর কিছু আছে বোলে আমার জানা নেই। এই জন্যেই তো ভগবান ভক্ত বৎসল রূপ ধ'রে শ্রীশ্রীগুরুরূপে নিরুপায় অসহায় সন্তানদের জন্যে এলেন।

বাবা, তোমাদের সকলের ঠাকুরের চরণে খুব ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতা হোক, তাঁর শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা করি। 'অমৃতবাণী প্রেসের' সকলকে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি—

তোমাদের চির স্নেহময়ী 'মা'

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা
ওঁ তৎ সৎ

পরম প্রিয় ভাই কালীদা (শ্রীঅনাথনাথ বসু)
সমীপেষু—

৬৫এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিরআপন ভাই কালীদা,

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময়ী 'অমৃতবাণী ৪র্থ ভাগ' (নূতন) ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ভাগ—(মোট ৪ খণ্ডে) প্রকাশ করছ শুনে কত আনন্দ যে হ'লো তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। বাগবাজার মঠে ১৯৪৪ সালে বসন্ত পঞ্চমীর আগের দিনের কথা আমার মনে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত সমস্ত পুস্তকের ভার তোমাকে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন "এখন আর আমার ও সম্বন্ধে কোন চিন্তাই নেই, কালী যা হয় ব্যবস্থা করবে"। এই গুরুদায়িত্ব বহন করা সম্বন্ধে তুমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে যে কৃপা নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তা আমার স্মরণে আছে যথা :—

(১) 'অমৃতগীতির' (১ম ও ২য় ভাগের) বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিবার এক হাজার ক'রে বই ছাপান হবে এবং খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে এক হাজার বই ছাপানর খরচ রেখে বাকি অর্থ দ্বারা মঠের যে সব মেয়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মত নিয়মানুসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করবে তাদের প্রয়োজনে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।

(২) 'অমৃতবাণী' বইএর অর্থ দিয়ে 'অমৃতবাণীই' ছাপান হবে।

(৩) অন্যান্য যে সব বই আছে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রয়োজন মত বই ছাপান ও বাকি টাকা বইএর প্রচার কার্য্যে লাগবে। শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছিলেন তোমার ওপর এইসব কার্য্যের ভার রইল * * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণী ঘরে ঘরে পঠিত হবে, কত সংসারীর তাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি এনে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার নির্দ্দেশ দিলেন না। তাঁর অতুলনীয় অমৃতবাণী, অমৃতগীতি এখনও তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ দান করছে ও চিরদিন করবে। তাঁর ভাবধারায় মঠ ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে, পুস্তকাকারে তাঁর অমৃতধারা বাণী প্রচারের গুরুভার তিনি তোমাকে দিয়ে গেলেন। ভাই তুমি ধন্য।

তাঁর পরম আপনদের ভিতর পরম প্রিয় একজন তুমি। তাই আমাদের কাছে তাঁর অমৃতবাণী মন্ত্র, প্রত্যেক দিনের ঘটনা যখন পড়ি ধ্যানের কাজ হয়ে যায়। কি আশ্চর্য্য! আধ্যাত্মিক পথের এমন কোন জটিল সংশয় নেই যা ঐ চারি খণ্ড অমৃতবাণী সহজে দূর করতে না পারে। একথা ভাবালুতা বা অতিরঞ্জিত উক্তি নয়।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি—একমাত্র পুত্রের শোকে সন্তপ্তা জননী অমৃতবাণী পাঠে শান্তি পেয়েছে। যখন সংসারের নিস্পেষণে মানুষ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছে, সমস্ত বায়ু যার কাছে বিষিয়ে উঠেছে অমৃতবাণীর মধ্যে সে পেয়েছে আশা ও শান্তির আলো, অমৃতের সন্ধান, দাঁড়াবার ভিত্তি। হবে নাই বা কেন? এবার তিনি এসেছিলেন কাল-প্রপীড়িত তাঁর শরণাগত সংসারীদের উদ্ধার করবার জন্য। অন্যান্য বারের মত শীল সাধন, যোগ, প্রাণায়াম বা পৃথক কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা তিনি করেন নি। বলতেন "গুরুতে বিশ্বাস রেখে ঠিক ঠিক তাঁকে ভালবাসলে তিনি নিজে তার সকল ভার বহন করেন। এই ঘোর কলিযুগে মানব জীবন ধন্য করার সবচেয়ে সহজ উপায় গুরুনিষ্ঠার দ্বারা তাঁকে আপন ভাবা ও তাঁর হওয়া। সদ্‌গুরুকে সন্দেশ খাওয়ালে বা অর্থ সম্পদ ভেট দিলে গুরুসেবা হয় না। দেহ-মন-প্রাণে, ভালবাসার টানে, তাঁকে পরম আপন-সর্ব্বস্ব জ্ঞানে গুরুআজ্ঞা পালন করার নামই গুরুসেবা"।

তিনি নিজেই আমাদের ভালবেসে গেলেন। যো সো করে যে-ই তাঁর সঙ্গ করেছে সেই তাঁর কৃপা পেয়েছে। এখনও তাঁর আশ্রিতরা দৈনন্দিন জীবনে তাঁর পরশ পাচ্ছে। এতো আর কথার কথা নয় ভাই এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা যখন তাঁর সঙ্গ করেছি কত ভাবের কতকথাই না হয়েছে, আর কি সুন্দর সহজ ভাবেই না তার মীমাংসা তিনি করেছেন ও অন্তরে তা গেঁথে দিয়ে গেছেন। অতি সাধারণ বদ্ধ সংসারীর দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার কথা থেকে এ যুগে ঈশ্বর লাভের সহজ উপায় সম্বন্ধে তাঁর মীমাংসা ও নির্দ্দেশ অতুলনীয়। একমাত্র যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যে গোপনে ধরায় পুনরাবির্ভাব হয়েছিল যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ লাভ করেছে—তাদের আর এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

বহু ভাগ্যে তাঁকে আমরা দেখেছি, তাঁর পরশ পেয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি, তা না হলে এ রকম বিরাট আপনত্বের মহান মূর্ত্তী জাগতিক বুদ্ধি তত্ত্বের দ্বারা নাগাল পেতো না। চার ভাগ অমৃতবাণীতে মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েক মাসের অমূল্য উপদেশাবলী লেখা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অফুরন্ত কৃপা তাঁর আশ্রিত সকলের ওপর বর্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই কাজ তিনি নিজেই করেন—তোমায় যার জন্য তিনি উপলক্ষ্য করেছেন ও যাদের এই কাজে তোমায় সহায়তা করবার প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমি একবাক্যে আবার বলি তারা সবাই ধন্য। শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্।—ইতি

২৭শে জুন, ১৯৪৯
"অমৃত কুটীর"
২৫নং ভূতেশ্বর-কাশীধাম

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত
তোমার চির আপন
অপূর্ব্ব

শ্রীশ্রীঠাকুরভরসা
শ্রীরামপুর মঠ
১৭।৩।১৩৫৬

স্নেহের কার্ত্তিবাবু

শ্রীশ্রীমায়ের আশির্ব্বাদ
এবং এই মাসে দিলাম।
মা, আমার ও সমস্তের
সকলের যে কি আনন্দ
এই অমৃত বাণী প্রকাশের
কথা শুনে তাহা লিখে
জানাতে পারছিনা। শ্রীশ্রী
ঠাকুর আপনাকে খুব শক্তি
ও উদ্যম দিন তাঁর শ্রীচরণে
এই নিবেদন। আপনার চির
স্নেহের দি দিদিমা

শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

শ্রীরামপুর মঠ

১৭ আষাঢ় ১৩৫৬

পরম স্নেহের বাবা কালি ও আমার সন্তান গণ,

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আমার সন্তানদের আশির্ব্বাদ করি। কালীর উপর ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখ নিসৃত সমস্ত পুস্তকের ও তাঁর বাণী প্রকাশ ও প্রচারের সকল ভার দিয়েছেন। এই কাজের বাবা কালীকে তোমারা সবাই সহায়তা কোরবে। ইহা কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত বাণী প্রকাশ ও প্রচার, এই অমৃত বাণী ভবিষ্যতে জগতে বিশেষ শান্তি দিবে শ্রীশ্রীঠাকুর

স্বয়ং ইহা শ্রীমুখে বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্ব্বস্ব—এইভাবে যে যত ভাল বেসে তাঁকে আপন কোরতে পারবে তার মানব জীবন তত পূর্ণ ও মহত্ত্বো-ময় হবে। এর চেয়ে সহজ উপায় এ যুগে আর কিছু আছে বোলে আমার জানা নাই।

এই জন্যেই তো ভগবান ভক্ত বৎসল রূপধরে শ্রীশ্রীগুরুরূপে নিরুপায় অসহায় সন্তানদের জন্যে এসেছেন।

বাবা, তোমাদের সকলের ঠাকুরের চরণে খুব ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতা হোক, তাঁর শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা করি। অমৃত বাণী প্রেসের সকলকে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ দিও ইতি

তোমাদের চিরস্নেহময়ী মা।

সূচীপত্র

দশম অধ্যায় ঃ ৯৪-১১২

একাদশ অধ্যায় ঃ ১১৩-১৩৩

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ১৩৪-১৪৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ১৪৫-১৬০

গানের সূচীপত্র

উপদেশপূর্ণ গল্পের সূচীপত্র

— ———

ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথের

অমৃতবাণী

—o—

চতুর্থ ভাগ—প্রথম অধ্যায়

—o—

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ১১ই শ্রাবণ ১৩৪০ সাল,
ইং ২৭শে জুলাই ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাঃ সাহেব, প্রফুল্ল, তারাপদ, জ্ঞান, অপূর্ব্ব, কেষ্ট, শ্যাম, দ্বিজেন, হরপ্রসন্ন, কৃষ্ণকিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, সুধাময়, পঞ্চানন, মতি ডাক্তার, অজয়, কিরণ, মৃত্যুন, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। ঊর্দ্ধবাহু, একপদ, হেঁটমুণ্ড প্রভৃতি ভীষণ কঠোরতা ক'রে সাধনা করার দরকার কি? এতে কি এগিয়ে যায়?

ঠাকুর। এ গুলো উগ্র তপস্যা। এর উদ্দেশ্য দেহকে একেবারে মেরে ফেলা, রস শুষ্ক ক'রে দেওয়া। এতে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ ক'মে যায় কারণ দেহকে না পাওয়ায় ওরা কাকে নিয়ে কাজ করবে? আর, ঊর্দ্ধবাহু, হেঁটমুণ্ড প্রভৃতি অসাধারণ দেহের প্রতি কঠোরতার ভাব হচ্ছে তোমার জন্যে কত কঠোরতা করছি এতে জীবন যায় যাক, এমন কি এক একটা অঙ্গ যেন তোমার জন্যে পণ করছি। যারা ভক্তি বিশ্বাসের ওপর গতি করে তাদের এত কঠোরতার প্রয়োজন হয় না।

জিতেন। বেশ খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়াচ্ছে অমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে গেল, এ দেখা যায় কি? না, তিতিক্ষা নিয়ে সাধনা করা ছাড়া তাঁকে কিছুতেই পাবার উপায় নেই?

ঠাকুর। তিতিক্ষা ও সাধনা ব্যতিরেকে তাঁকে পাওয়া যায় না। যার হঠাৎ কৃপা লাভ হয়ে বিনা সাধনায় তাঁকে লাভ হয়ে যায় তারও পূর্ব্ব জন্মে সাধনা করা আছে। তবে, বস্তু লাভের পর জীবন্মুক্ত অবস্থায় এইভাবে খেয়ে দেয়ে বেড়াতে পারে কারণ ইচ্ছা করলেই আবার তখনই ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তপস্যা জিনিষটা হচ্ছে কোন জিনিষ প্রাপ্তির জোর ইচ্ছা হলে তার জন্যে গতি করা। মনের স্বভাবই হচ্ছে যেটাতে জোর ক'রে লাগে তার জন্যে মেলা কঠোরতা করতে পারে। সাধারণ সংসারীর সংসারে মন লাগায় তার জন্যে কত কঠোর করছে। অনবরত রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধিতে জর্জরিত হয়েও ছাড়তে পারে না। তেমনি যার আবার এ দিকে অর্থাৎ ধর্ম্মের দিকে মন লেগেছে সে আবার এর জন্যে কত কঠোরতা করতে পারে। গুরুতে যার ভালবাসা পড়েছে সে গুরুর জন্যে সংসার মায়া ছেড়ে তাঁর কাছে ছুটছে কারণ তাঁকে না দেখলে সে থাকতে পারে না। তাঁর জন্যে রোদ, বৃষ্টি, ব্যাধি সব তুচ্ছ ক'রে আসছে, আত্মীয় স্বজনের ঠাট্টা, বিদ্রূপ এমন কি উৎপীড়নকেও গ্রাহ্য করে না। তবে কি জান এই কঠোরতা তাকে চেষ্টা ক'রে করতে হয় না আপনি হয়ে যায়।

কানন। ভগবান পাওয়া বলতে কি বুঝব?

ঠাকুর। সেই সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্য, চৈতন্য, আনন্দকে গুণজ ভাবে ভগবান বলা হয়। ভগবানকে পাওয়া মানে সেই মহান শক্তির প্রভাবে তোমার মনের শক্তি বাড়বে, সংসারের দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, মনে শান্তি আসবে। এ ছাড়া, তিনি যে কি, ঠিক সেই ভাব ভাষায় বোঝান যায় না। এ উপলব্ধির জিনিষ, সে অবস্থা হলে তবে ধরতে পারবে, নইলে চেখে দেখলেও বুঝতে পারবে না।

কানন। কীর্ত্তন বা গীতা পাঠ বা ভাগবত পাঠ যেখানে হয় সে সব জায়গায় গেলে একটা ভাবের পরিবর্ত্তন বোঝা যায় কিন্তু ভগবান পেলে যে কি পরিবর্ত্তন হয় সেটা বোঝবার যো নেই ?

ঠাকুর। বোঝা যায় বৈ কি। সে অবস্থা এলে, উপলব্ধি হলে, তবে ত বুঝতে পারবে, তখন সমস্ত জগৎটা এক হয়ে গিয়ে চোখের সামনে ভাসবে। আর কীর্ত্তন প্রভৃতি শুনে যে ভাব আসে সেটা ত যে ভাবে রয়েছ তার মধ্যে সেই মাপের মধ্যে ব'লে ধরতে পার।

কানন। সংসারে পড়াশুনা করবার সময় পিতা মাতা বা শিক্ষক যা বলে সেই কথা শুনে তখন ত আর কোন বিচার করি না, তেমনি এই ধর্ম্ম পথে যাবার সময় সাধু বাক্য বা গুরু বাক্য সেইভাবে মেনে চলতে পারি না কেন ? তখন বিচার করি কেন ?

ঠাকুর। কারণ হচ্ছে, তুমি ধর্ম্মের পথের চেয়ে সংসার পথের জিনিষকে বেশী প্রয়োজন বোধ করছ। জাবত্ব ধর্ম্মে ভোগের দিকে গতি করে, তখন মানুষ রিপুর অধীন থাকে এবং ভিতরে বাসনা ভরা থাকে। এই বাসনা নিয়েই জন্মেছ, বাসনা না থাকলে ত জন্মাতেই না। তবে, সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ করতে করতে জ্ঞান বিচার দ্বারা ত্যাগের ভাব এসে গেলে, অথবা গুরুতে ভালবাসা লাগলে সংসারের ওপর অশ্রদ্ধা আসে এবং ধর্ম্মের পথে বেশী প্রয়োজন বোধ হয়। তখন ঋষি বাক্যে, সাধু বাক্যে বিশ্বাস আসে, কারণ তখন নজর হয় যে এরা ত সব ত্যাগী, এদের নিজেদের ত কোন স্বার্থ নেই যে তার জন্যে আমাদের মিথ্যা কথা বলবে। তারা যেটা ভাল বুঝেছে ও দেখেছে আমাদের মঙ্গলের জন্যেই সেইটে বলছে।

জিতেন। মুক্তিলাভের জন্যে আত্মহত্যা করলে দোষ আছে কি ? শাস্ত্রে আছে অসাধ্য ব্যাধি হলে গঙ্গায় প্রাণ ত্যাগ করলে পাপ হয় না এবং মুক্তি হয়।

ঠাকুর। আত্মহত্যা জিনিষটাই দোষের, তবে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মহত্যা করলে তার পাপ কিছু কম হতে পারে। ব্যাধির যন্ত্রণায়

হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গঙ্গায় প্রাণ ত্যাগ করলে ব'লে মুক্তি হবে কেন? তুমি ত মুক্তি চাচ্ছ না। তবে, গঙ্গার মাহাত্ম্যে তোমার আত্মহত্যার পাপ না হতে পারে। সংসার থেকে একেবারে মুক্ত হতে ক'টা লোক চায়? সংসারের দুঃখের হাত থেকে মুক্তি চায়। আবার ভক্ত যে দেহ মন প্রাণ সব অর্পণ করেছে, যার কোন কামনা বাসনা নেই, সে যাকে ভালবাসে তার কাছে থাকতে চায়, সে মুক্তি চায় না। বিচ্ছেদ তার পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর বোধ হয় কারণ ভালবাসায় রোদ, বৃষ্টি, ব্যাধি, অনাহার সব তুচ্ছ করতে পারে কিন্তু বিচ্ছেদে বড় বেশী ব্যথা পায়। সে সেই এক ছাড়া অন্য কিছুই জানে না বা চায় না। এরই নাম নিষ্ঠা, নৈষ্ঠিক ভক্তি। মন জোর ক'রে পড়লে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভয় কিছুই গ্রাহ্য করে না, যে কোন বাধা বিঘ্নই আসুক সব উপেক্ষা ক'রে চলে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান, বিশেষতঃ যারা বিবেক বৈরাগ্য বা অনুরাগ দ্বারা গতি করতে পারবে না তাদের সঙ্গ ছাড়া কোন উপায় নেই। সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলে তিনি মনকে ঐ দিকে ঘুরিয়ে দেন। একবার মন লেগে গেলে, একবার অনুরাগ এলে তখন আপনি গতি করে। যখন যাতে মন পড়ে তখন তার ভাবাপন্ন হয়। সংসারে রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধির তাড়নায় অধীর হচ্ছ তত্রাচ মন সংসারে থাকায় সে গুলো সুখময় বোধ ক'রে তাতেই আবার ডুবে রয়েছ। সৎ সঙ্গ, সৎ কথা তখন ভাল লাগবে না। কিন্তু যেই মন ঘুরে ধর্ম্মের দিকে পড়ে অমনি সেই এত প্রিয় সংসার বস্তুই বিষ বোধ হয়, তখন সংসার দুঃখময় বোধ আসে এবং সৎ সঙ্গ, সৎ কথা বড় মিষ্টি লাগে। মনের স্বভাবই হচ্ছে এই, যখন যেটায় পড়ে তখন সেইটেই সব চেয়ে বড় করে এবং অপর গুলোকে নীতি পালনের মত রক্ষা ক'রে যায়। যত ক্ষণ সংসারে মন প'ড়ে থাকে তত ক্ষণ যেখানে যে টুকু সময় পায় সবটাই সংসারে দেয় কিন্তু নীতি পালনের মত সৎ সঙ্গে সেই অল্প সময়ই রেখে দেয় সেটা বাড়ায় না।

আবার যেই মন ঘুরে যায় ও সৎ এর দিকে পড়ে তখন যেখানে যে টুকু সময় পায় সবটাই সৎ সঙ্গে দেয়, নাম মাত্র নেহাৎ যে টুকু না হ'লে নয় সেই টুকু সংসারে দেয়। উন্মাদ বা পাগল একটার জন্যেই হয়, দুটোর জন্যে কখনও এ পর্য্যন্ত হয় নি আর কেউ হতেও পারবে না, কারণ মন দুটোকে এক সঙ্গে জোর ক'রে ধরতে পারে না। একটার জন্যে উন্মাদ হলে বা পাগল হলে আর সব ছেড়ে যায়, তখন পিতা মাতার কর্ত্তব্য, স্ত্রী পুত্রের কর্ত্তব্য সৎ নীতি হিসাবে কোন রকমে পালন ক'রে যায়। এর ছেলে, বুড়ো নেই, বালক হোক, যুবা হোক, বৃদ্ধ হোক মন একবার লেগে গেলে সকলকেই সমান ভাবে পাগল ক'রে দেবে। নিয়মিত কিছু সময় সৎ নীতি পালন, গুরু সঙ্গ ও গুরু সেবা করলে সৎ সংস্কার লাগবে এবং ক্রমশঃ ভালবাসা প'ড়ে ক্রমান্বয়ে অনুরাগে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। সৎ সংস্কার লাগলেই কত উপকার হয়, তখন আর তার দ্বারা কুকর্ম্ম হয় না। সে যথাযোগ্যের সম্মান দিতে শেখে এবং ক্রমশঃ তার জ্ঞানের উদয় হয় ও তাকে কোমল ক'রে দেয়। জ্ঞানের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে নরম হবে। যথাযোগ্যকে সম্মান দেওয়া মনুষ্য বুদ্ধির কাজ, নইলে ত পশুর সমান। এটা মানুষের কর্ত্তব্য; যথাযোগ্যকে সম্মান না দিলে অকল্যাণ হয় ও হানি হয়। নারদ সুরা পান ক'রে ইন্দ্রের সভায় অসম্মানসূচক নৃত্য করায় তার ওপর অভিসম্পাত হয়েছিল। সঙ্গ ব্যতিরেকে এক পাও গতি করবার যো নেই। সঙ্গের এমনই প্রভাব যে যত বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন সমস্ত কাটিয়ে নিয়ে যায়, মান অভিমান নষ্ট ক'রে দেয়। অভিমান সংসারীর লক্ষণ, অভিমান থাকলে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আবার, সাধুকে স্পর্শ করলে জ্ঞানের উদয় হয়। স্পর্শ বড় সোজা জিনিষ নয়। স্পর্শে মনের শক্তি বাড়ে, কর্ম্ম ক্ষয় করে, আত্মজ্ঞান হয় এবং সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল হয়। তবে সাধারণ সংসারী এত বাসনা কামনা নিয়ে আসে যে তারা সকলে স্পর্শ করলে সাধুকে চঞ্চল ক'রে দেয়, তাই জায়গা বিশেষে সাধুকে স্পর্শ না করা ভাল, তাতে অনেক অশান্তি ক'মে যায়।

মাণিক গাহিল ঃ

তোমাবে কবি নমস্কাব, আমাব এই যাত্রা হ ল সুরু, ওগো কর্ণধাব,
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক ফিবব না ক' আব, তোমাবে কবি নমস্কাব।
দিযে তোমাব জযধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি, ওগো কর্ণধাব,
এখন মাভৈ বলি ভাসাই তবি, দাও গো কবি পাব, তোমাবে কবি নমস্কাব।
এখন বইল যাবা আপন ঘবে চাব না পথ তাদেব তবে, ওগো কর্ণধাব,
যখন তোমাব সময এলো কাছে তখন কেবা কাব, তোমাবে কবি নমস্কাব।
আমাব কেবা আপন, কেবা অপব, কোথায বাহিব, কোথায বা ঘব, ওগো কর্ণধাব
চেযে তোমাব মুখে মনেব সুখে নেব সকল ভাব, তোমাবে কবি নমস্কাব
আমি নিযেছি দাঁড, তুলেছি পাল তুমি এখন ধব গো হাল, ওগো কর্ণধার,
আমাব মবণ বাচন যেমন ঢেউযেব নাচন ভাবনা কিবা আব, তোমাবে কবি ননস্কাব।
আমি সহায খুঁজে পাবেব দ্বাবে ফিবব না আব বাবে বাব, ওগো কর্ণধাব,
এখন তুমি আছ আব আমি আছি এই জেনেছি সাব, তোমাবে কবি নমস্কাব॥

— ——

চতুর্থ ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়

* —

কলিকাতা, ববিবাব ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০ সাল ;
ই° ৩০শে জুলাই ১৯৩৩

সন্ধ্যাব পব শ্রীশ্রীঠাকুবেব ঘবে তাবাপদ, প্রফুল্ল, কালু, অপূর্ব্ব, জিতেন, কেষ্ট, শ্যাম, বিভূতি, গোপেন, পুত্তু, তপেন, দ্বিজেন, কৃষ্ণকিশোব, হবপ্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি ডাক্তাব, কালীমোহন, মৃত্যুন, শিবু, ভোলা, অভয প্রভৃতি আছে।

জিতেন। কতকগুলি লোক একজন সাধুকে একটা ভাব নিযে ভাল বাসছে কিন্তু হয ত সাধুব সত্যি সে ভাব নেই।

ঠাকুব। যে বকম লোকই হোক তাব ওপব কাকব ভক্তি থাকলে সেটা ভাঙ্গতে নেই। একটা ভাব গডা বড শক্ত কিন্তু ভাঘ ভাঙ্গা অতি সোজা। যদি তাব উপকাব কবতে পাব অর্থাৎ তাব সেই ভাব বাডাতে পাব ত ভাল, নয ত যে টুকু আছে সেটুক নষ্ট কবতে যেও না। তবে যদি দেখ কাকব নিজেব ভাবেব দ্বাবা অপবেব ক্ষতি হচ্ছে তা'হলে অপবাকে সাবধান ক'বে দেওযা এবং তাব ভাব বদলে ঠিক ক'বে দিতে চেষ্টা কবা ভাল। অনেক সময সাম্প্রদাযিক বিপবীত ভাবকে বোধ কববাব জন্যে ভিন্ন ভাবেব ধাবা চালাতে হয। চৈতন্যদেব দেখলেন মুসলমানবা ভোগেব প্রলোভন দেখিযে হিন্দুদেব মুসলমান ক'বে নিচ্ছে, তাই তিনিও ভাব ছডালেন "ভব যুবতীব কোল, মাগুব মাছেব ঝোল, বোল হবিবোল।" অর্থাৎ যা খুসী তাই কব শুধু হবিবোল বল। কাবণ তিনি দেখলেন কোন বকমে হিন্দু ধর্ম্মে বাখিযে হবিবোল বলাতে পাবলেই হ'ল। কেন না তাঁ'ব মুখেব হবিবোলেব এমন শক্তি যে তাইতেই তাদেব ভাব ঘুবে আসবে। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত উদাবতা দেখানব জন্যে ঐ বিপবীত স্রোত অনেকটা ঘুবে গেল। আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজেব উৎপত্তিবও ঐ কারণ। কালেব প্রভাবে হিন্দুদের আচাব, পদ্ধতি, সংস্কার ঢিলে হয়ে

যাওয়ায় হিন্দু সমাজ তাদের গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না ব'লে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবককে বাধ্য হয়ে খৃষ্ট ধর্ম্মে যেতে হয়েছিল। তাদের হিন্দু ধর্ম্মে রাখার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের গঠন। কোন বিষয়ে গোঁড়ামি ভাল নয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে, কালের প্রভাবে সমাজ সংস্কার ও আচার পদ্ধতি কিছু আলগা দিতেই হবে তবে মূলটা যাতে ঠিক থাকে সে বিষয় লক্ষ্য থাকা বিশেষ দরকার।

জিতেন। অনেকে ত পৌত্তলিকতার দোষ দেয়।

ঠাকুর। মনের স্বভাব বহু নিয়ে গতি করে এবং সর্ব্বদাই প্রায় রূপের পূজা করে। তাই পৌত্তলকিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে সামনে নানা রকমের মূর্ত্তি দেওয়া হ'ল যেটাতে তোমার ভাল লাগে সেইটায় মন লাগাতে পার। যেন তেন প্রকারে একটাতে মন লাগাতে পারলেই বহু থেকে মনকে সহজে ঘুরিয়ে আনতে পারবে। তা ছাড়া, তুমি যখন কোন মূর্ত্তিকে পূজা কর তখন ত আর তাকে পুতুল ধারণা ক'রে পূজা কর না, এটা তাঁরই একটা স্থূল রূপ এই ভাব নিয়ে গতি কর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ত কত স্থূল রূপ ধ'রে কাজ করছ তার সঙ্গে আর একটা না হয় স্থূল বাড়িয়ে দিলে। তাতে এই দিকে মন লাগবার জন্যে বেশী জোর ক'রে চেষ্টা করতে হয় না। সাধারণ ভাবে অপর জিনিষের মত এটাতে মন লাগাতে পারা যায় কিন্তু সৎএর সঙ্গে মন লাগায় আপনিই মনের উন্নতি হতে থাকে। তার পর মন তৈরী হয়ে গেলে মূর্ত্তি ছাড়া ধ্যান করার কথা ভাবতে পারবে। তিনি ত সর্ব্বময়, সকলের ভেতরই তিনি আছেন তবে যার যেটা ভাল লাগে, যার যেটায় সহজে মন বসে সেইটে নিয়ে চলা তার পক্ষে সোজা। এতে শীঘ্র কাজ হয়। ধর্ম্ম জিনিষটা যখন পাতলা হয়ে আসে তখন ধর্ম্ম বিশ্বাস খুব ক'মে যায়, তখন সকলেই বিক্ষিপ্ত মতি হয় এবং টক ক'রে প্রলোভনে ভুলে ধর্ম্ম একেবারে ভেঙ্গে ফেলে। তাই চৈতন্যদেব প্রভৃতি যাঁরা লোকশিক্ষার জন্য এসেছিলেন তাঁরা সাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের বিক্ষিপ্ত মতি ও বিচলিত বুদ্ধির সঙ্গে সহজে খাপ খায় এমন

ভাব ছড়িয়ে তাদেব আবাব তুলে দিলেন। তাই দেখবে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ত ছিলই না বললে হয় এবং সমাজেব শিক্ষিত লোকও খুব কম ছিল।

গোপেন। মহাপুরুষেব কাছে গেলে আব ব্যাধি থাকে কেন? বাইবেলে লেখা আছে যে যীশুব কাছে যাবা যাবা গিয়েছিল তাবা সকলেই বোগমুক্ত হয়েছিল।

ঠাকুব দেখ, মহাপুরুষেব কাছে এলেই যে সকলেব আব কোন বকম ব্যাধি থাকবে না, এ হতে পাবে না। কাকব হয়ত কোন একটা ব্যাধি সাবল, সে আলাদা কথা কিন্তু তাঁব কাছে এলেই যে ব্যাধিমুক্ত হবে এই সাধাবণ নিয়ম হতে পাবে না। মহাপুরুষেব কাছে এলে যদি তিনি সব বাসনা কামনা নষ্ট ক'বে, তাব মন স্থিব ক'বে, তাকে মুক্ত ক'বে দেন ত তাব ব্যাধি আব বইল না। এ জিনিষটা সম্ভব হলেও হতে পাবে, কিন্তু তাব অবস্থাব উন্নতি হল না, সে মুক্ত হল না, অথচ ব্যাধি আব কখনও হবে না এ অসম্ভব, এ কখনও হতে পাবে না। গু ঘাটবে অথচ গুয়েব গন্ধ পাবে না এ কি কখনও হতে পাবে? এ পর্য্যন্ত এ কখনও হয় নি, হতে পাবে না। কোন শাস্ত্রে এ কথাও কখন পাওযা যায নি। তোমবা ভুল কবছ, বাইবেলে কখনও এ কথা লিখতে পাবে না। যে ধর্ম্মই হোক, মন নিযেই কাজ কবতে হবে। মনেব স্বভাব সর্ব্বত্রই এক বকম হবে, এব আব আলাদা হতে পাবে না। ভেতবে যত ক্ষণ লাভ লোকসান খতাচ্ছ তত ক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগ হবেই। তবে, হিন্দু ধর্ম্মে আবও সূক্ষ্ম ভাবে গিয়ে হয ত একটা কথায সব বুঝিয়েছে, অপব ধর্ম্মে হয ত স্থূলেব ওপব গিয়ে তাব ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আলাদা আলাদা দেখিয়েছে। পাপ পুণ্য মনেব জিনিষ। মাযা মানে অজ্ঞানতা জনিত বদ্ধতা। হিন্দুবা বলছে মাযামুক্ত না হলে শান্তি কিছুতেই আসতে পাবে না, আব, যীশাস বলেছেন একটা ছুঁচেব ভেতব দিযে একটা হাতি গ'লে যাওয়াও যদি সম্ভব হয ত ধনী কিছুতেই ভগবান পেতে পাবে না: এব মানে হচ্ছে ধনীবা অর্থে বদ্ধ আছে অর্থাৎ মায়ায় বদ্ধ। তা হ'লেই দেখলে

মূলে জিনিষ সেই একই দাঁড়াল; এক ছাড়া দুই হবার যো নেই। তবে কি জান, শাস্ত্রে অনেক সময় দুটো একটা ঘটনা যাতে জীবের বেশী উপকার হয়, বেশী কল্যাণ হয় একটু বাড়িয়ে লেখে কারণ সেইটা থেকে তোমরা উপদেশ নেবে ও সেই মত চলতে চেষ্টা কববে। কেউ হয় ত মহাপুরুষের কাছে এসে তাঁর ওপর জোর ভালবাসা পড়ায় সব ছেড়ে দিলে, তখন তার মনে সেই এক চিন্তা ছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা স্থান পেলে না। এই রূপ একাগ্র ভগবচ্চিন্তায় থাকায় হয় ত তার কোন অসাধ্য ব্যাধি সেরে গেছল। শাস্ত্রে এইটে লিখলে যে এই থেকে তোমরাও শেখ যাতে সব ছেড়ে মহাপুরুষকে এক মনে ভাল বাসতে পার। তোমরা বদ্ধ, তোমরা সেটা ঠিক ধরতে না পেরে ঐ অসুখ সারাটার ওপরই জোর দিলে। ব্যাধি কর্ম্মজনিত। আগে দেখ, কি কি কারণে ব্যাধি হয় আর কি কি কাবণেই বা ব্যাধি সারে না। কেউ বা ব্যাধিতে বেশ আনন্দ রক্ষা করছে আবার কেউ বা ব্যাধির নাম শুনেই বা অপরের দেখে অশান্তি ভোগ করছে। এ গুলো না দেখে শুনেই স্থূলের ওপর একটা ধাবণা ক'রে বসলে। দেহ ধারণ করলেই কত রকম কর্ম্ম এসে লাগছে তা ব্যাধি হবে না? বড় বড় মহাপুরুষ, অবতার প্রভৃতি কেহই কি রোগের হাত থেকে কখন নিস্তার পেয়েছেন? তাঁদের ত নিজেদের কোন কর্ম্ম নেই, তত্রাচ অপরের কর্ম্মে তাঁরা ভুগেছেন। আর, তোমরা নিজে কর্ম্মের বোঝা নিয়ে এসেছ অথচ চাচ্ছ যে এক বার মহাপুরুষ দর্শন করলেই সব কর্ম্ম অমনি তখনই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আর ধব, যদি কারুর এমনই সুকৃতি থাকে যে সাধু দর্শন মাত্রই তার সব কর্ম্ম চ'লে গেল তা হলেও তার যে শুধু ব্যাধি ছেড়ে যাবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, অর্থ, যশ, মান সব মায়ার জিনিষ ছেড়ে গেছে এবং সে সংসার থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। মনের ধর্ম্ম এ নয় যে তোমার সব বজায় থাকবে আর তুমি দুঃখ পাবে না। যদি দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও, যদি শান্তি চাও ত এমন কাজ কর যাতে সে জিনিষ ঠিক পেতে পার, তা ভগবানকে গালাগাল দিয়েই হোক বা হরি হরি ব'লেই হোক। আসল জিনিষ দরকার শান্তি। তা ভিন্ন সৎ সঙ্গে কিছু সৎ নীতি হল, কিছু সৎ সংস্কার ধরল, কিছু সৎ ভাবে

থাকতে শিখলে এই কি কম লাভ হল ? সংসারের ত কিছুই লোকসান করনি সবটা পুরো মাত্রায় বজায় রেখে ফুরসুত মত কিছু সাধু সঙ্গ করায় কিছু লোকসান ত হয়ই নি ববং কিছু লাভই হ'ল যখন, তখন এটা ছাড়বার ত কোন কারণ দেখা যায় না। হ্যাঁ, যদি বুঝতুম যে তোমার এ দিকে কিছু সময় দেওয়ায় তোমার বাস্তবিক কোন ক্ষতি হচ্ছে, তা হ'লে না হয় বলাটা শোভা পেত, কিন্তু তা যখন নয় তখন ছাড় কেন ? সাধুর কাছে এলেই কিছু উপকার হবেই। দেব স্থানে ও সাধু স্থানে তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সাধুর ত কিছু কৃতিত্ব থাকবার দরকার নেই। সাধু কে ? এ যে তিনিই, সেই সাধুর ভেতব দিয়ে তাঁর নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছেন, নইলে সাধুর কি ক্ষমতা যে এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে পারে ? ***যেখানেই এত লোক মিলে আনন্দ কচ্ছে সেখানেই জানবে তাঁর শক্তি আছে।*** তোমরা সব বড় বড় জ্ঞানের কথা বল বটে কিন্তু জ্ঞানের কিছুই বোঝ না, কোন উপলব্ধি নেই, তাই ঠিক ধরতে পার না। স্থূলটা ধ'রে বিচার করতে গিয়ে প্রায় সকল জায়গায় ভুল ধারণা ক'রে সাধুর ওপর অবিশ্বাস এনে ফেল। যদি জল পরিষ্কার করতে চাও ত যে যে নালা দিয়ে ময়লা জল ঢুকছে সে গুলো সব বন্ধ কর, নইলে গঙ্গার সঙ্গে যোগ রেখে গঙ্গা জলই আন আর যাই কর, গুয়ের নালা বন্ধ না করলে গঙ্গাজলেও গু ভাসবে। এই নালা বন্ধ করলে প্রথমে ময়লার জন্যে গঙ্গাজলকেও হয়ত কিছু ময়লা ক'রে দিলে কিন্তু শেষে গঙ্গার প্রভাবে সে ময়লা কেটে যাবে। তেমনি সাধুসঙ্গ করতে করতে মনের ময়লা কেটে যাবে, তখন ঠিক জিনিষ গুলো বুঝতে পারবে ও ধরতে পারবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান, যেমন ভাব নিয়ে সঙ্গ করবে তেমনি সব ভাব আসবে। তিন প্রকারে লোক সাধু সঙ্গ করে। সাধারণ জীব সংসারটা প্রধান করে। তারা সংসারে কিছু মঙ্গলের জন্যে বা সংসারে কিছু শান্তি পাবার জন্যে সাধুর কাছে আসে। কেউ বা সংসার

অনিত্য এটা কিছু বুঝেছে এবং সংসার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভগবানকে ডাকে এবং সাধুর কাছে আসে কিন্তু সংসারে কিছু লোকসান করতে পারে না। তারা সব বজায় রাখতে চায় এবং দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভগবানকে ডাকে। আর আছে, প্রেমে ভালবেসে সাধুর কাছে আসে। তাদের কোন সংসারীয় স্বার্থ থাকে না, তারা সাধুকে ভালবাসে, না এলে থাকতে পারে না। তাদের সংসার আপনিই ছেড়ে যায়। যত ক্ষণ সংসার সুখের জন্য সাধু সঙ্গ কর তত ক্ষণ দুঃখের নিবৃত্তি হবে না। এ পর্যান্ত এমন কোন মহাপুরুষ আসেন নি যিনি সংসারীর সকল দুঃখের নিবৃত্তি করতে পেরেছেন। সংসার বজায় রেখে কেউ দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি, এ কখনও হয় নি এবং কখনও হতে পারে না। সাধু সঙ্গে জ্ঞান বাড়লে সংসারটা অনিত্য বোধ করতে শিখবে, মনের শক্তি বাড়বে এবং অভাব কম করতে পারবে। সংসার বাসনা থেকেই যত দুঃখ, তাই আছে,

'বাসনা জনিত সুকর্ম কুকর্ম প্রতি ক্ষণে ফোটে কুসুম কুসুম
সুখ দুঃখ ফল যাদের তার ডালে সে ফল তুলিতে যেও না।

মরুভূমিতে যতই জল ঢাল যেমন কোন ফল হয় না, তেমনি সংসারের পেছনে যতই খাট দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি কিছুতেই পাবে না। সংসার থাকতে দুঃখ যাবে না তবে সাধু সঙ্গ করলে মনের শক্তি বাড়বে তখন সংসারের দুঃখ গুলো আর তোমাকে অত কষ্ট দিতে পারবে না, সহজে সে গুলো সহ্য করে যেতে পারবে। স্বয় কৃষ্ণ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের পাঁচটা ছেলে গুপ্ত হত্যায় ম'ল, তাদের বিরাট গৃহে দাস দাসী হতে হ'ল, স্বয়ং রামচন্দ্রেরই সীতা হরণ হয়ে গেল। এ সংসারের ধর্ম্ম, সংসার বস্তুতে মন থাকলেই দুঃখ অনিবার্য্য। এ নিয়ম তোমার বেলা বদলাবে কেন? তবে সৎ সঙ্গে সৎ নীতি, সৎ সংস্কার নিয়ে চললে দুঃখ অনেক ক'মে আসে। সাধারণতঃ, মানুষ যেটার প্রয়োজন নেই সেইটে ছাড়ে, আর যেটার দরকার বোধ করে সেটা ধরে। এদের সাধু সঙ্গ ঠিক মত হয় না যাতে তারা বেশী মুনফা পেতে পারে। যারা সমস্ত ছেড়ে কেবল সেই ভগবানের জন্যে সাধুর

কাছে ছোটে তাদেরই ঠিক সাধুসঙ্গ হয এবং সাধুতে প্রেম ভালবাসা পড়েছে বুঝতে হবে। সাধুতে ঠিক ভালবাসা পড়লে এক দিন না আসতে পারলে মনটা ছট ফট করে ও মনে অশান্তি আসে। ভালবাসার লক্ষণই এই, না দেখে থাকতে পারে না। তখন সংসার আর ভাল লাগে না। যে সংসারে লোক লৌকিকতা, আত্মাযতা, কুটুম্বিতা নিযে এত দিন ব্যস্ত ছিলে, যেখানে আত্মীযের অসুখে ঠিক সময়ে দেখতে যেতে না পারলে লোক লজ্জার ভযে যেমন অশান্তি ভোগ করতে, আজ সেই সংসার, আত্মীয কুটুম্বিতা, সব বিষ বোধ হয এবং সংসারীর মতে সকল কর্তব্য পালন করতে সেই রকম অশান্তি আসে। সাধুরা ত কারুর দোষ গ্রহণ করেন না শুধু গুণ দেখেন কারণ সাধুদের কোন স্বার্থ থাকে না। তাঁদের সর্বদাই চেষ্টা কিসে তোমরা শান্তি পাবে। তাই তাঁরা যার যেমন ভাব তার সঙ্গে সেই ভাবে মিশে গিযে তার কাজ করান। সাধুতে কিছু ভালবাসা লাগলেও তার অনেক কর্ম্মক্ষয হবে। তা ভিন্ন, তার বৈরাগ্য নিযে বিচার ক'রে সব ত্যাগ করতে হবে। সাধারণ, সাধুর কাছে সংসার, দেহসুখ, ভোগ প্রভৃতি বাসনা কামনা নিযে আসে, কাজেই তার একটু এদিক ওদিক হলেই সাধুর কোন ক্ষমতা নেই ব'লে সাধুর ওপর অবিশ্বাস আনে। কিন্তু তারা ভাবে না যে মানুষ সংসারে যে যার কর্ম্ম ফল জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করতে আসে ও যে যার পরমাযু নিযে আসে। সাধু সঙ্গে এই জ্ঞান আসে এবং তখন ক্রমশঃ মন সংসার থেকে উঠিযে নিতে পারে।

সংসারে থেকে মন না তুলে নিলে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এ পর্য্যন্ত কোন মহাপুরুষ বা কোন সাধু সংসার থেকে মন না তুলিযে সংসার মাযা ও সংসার দুঃখের হাত থেকে কাউকে উদ্ধার করতে পারেন নি। তবে, যে ভালবেসে সাধুর কাছে যায তার হযত কিছু দুঃখের লাঘব হতে পারে। তাই বলেছে, যেখান থেকে দুঃখের উৎপত্তি সেখানে আগে নিবৃত্তির চেষ্টা কর। সাধু সঙ্গে এইটা ক'রে দেবে। হয় সাধুতে বা সদগুরুতে ঠিক শ্রদ্ধা রাখ, কোন বিচার রেখো না,

এবং স্থির বিশ্বাস রেখে গতি কর, না হয় নিজে পুরুষকার নিয়ে চল। স্বভাব যে বিকৃত করতে চাচ্ছ ত সেই মত কাজ কর। সংসারের স্বভাব সুখ দুঃখ আসবে। তুমি সংসারও করতে চাও অথচ দুঃখ চাও না এই অস্বাভাবিক চাও ত সেই রকম অস্বাভাবিক কাজ কর, নইলে সাধারণের মত মনকে সংসার থেকে না উঠিয়ে, সাধারণের মত সকল জিনিষে ব্যবহার বাখলে কি ক'রে হবে? সে অসাধারণ জিনিষ যখন পারবে না তখন গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে সৎ নীতি পালন ক'রে কিছু সৎ সংস্কার, সৎ ভাব নিয়ে চল তাহ'লে রোগটাও অন্তঃত ধবতে পারবে। রোগ ধরতে পারলেও ঢের লাভ কারণ ঠিক রোগ ধরতে পারলে রোগ সারাবার চেষ্টা হবে। কিছু ভালবাসা নিয়ে, কিছু সদ্‌ভাব নিয়ে ভগবানকে ডাকলে তিনি অনেক দুঃখ কমিয়ে দেন। (ঠাকুর এইখানে চৌষট্টি ঘাটের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গল্প বলিলেন; অমৃতবাণী ৩য় ভাগ ২৫৬ পৃঃ)।

পরোপকার ও জ্ঞানলাভ মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কারুর ক্ষতি হয় এমন কাজ পারদ পক্ষে ক'রো না, সকলকে আপন ভেবে নিজের ছেলে মেয়ে আত্মীয়ের ওপব যেমন ভালবাসা রাখ সেই ভাব সকলের প্রতি রাখবার চেষ্টা করবে। এই সব সৎ নীতি পালন করলে ও সৎ ভাবে তাঁকে কিছু মন দিয়ে সংসার করলে দেখবে অনেক মঙ্গল হবে। সংসার করতে দোষ নাই কিন্তু সংসারে ডুবে যেও না। নিজে ভেসে থাক তবে অপর যাদের সঙ্গে ব্যবহার রেখেছ তাদের ভাসতে শিক্ষা দিতে পারবে এবং দরকার হলে ভাসবার কিছু সাহায্যও করতে পারবে, কিন্তু নিজেই যদি ডুবে থাক তাহলে নিজেও ভাসতে পারলে না আর অপর কাউকেও ভাসাতে পারলে না। সংসার থেকে মন না উঠলে, কিছু ভালবাসা না পড়লে, কিছু ত্যাগ না এলে কাজ হওয়া বড় শক্ত। কারুর হয়ত পূর্ব্ব সংস্কার বশে দেখা মাত্র সাধুর সঙ্গে এমন ভালবাসা লেগে গেল যে সে সব ছেড়ে তার পেছনে ছুটতে থাকল। এ ত সাধারণ নয়, সব নোড়াই ত আর শালগ্রাম নয়। সাধারণ সৎ নীতি, সৎ সংস্কার নিয়ে নিয়মিত সাধু সঙ্গ করলে ক্রমান্বয়ে ভালবাসা প'ড়ে আপনত্ব আসে। এই আপনত্ব

না এলে কিছু হবার যো নেই। যখনই কারুর বিরুদ্ধে সাধারণ সংসারীরা দোষ দেয় যে ও বুঝি সংসারটা মাটি করলে, ও বুঝি সংসারটা ছাড়লে তখনই বোঝা যাবে যে তার মন কিছু সংসার থেকে উঠেছে। তা ভিন্ন লোকলজ্জা, ঘৃণা, অভিমান সব বজায় রাখতে গেলে ঠিক ভগবান লাভের জন্য গতি করতে পারবে না। তবে, সৎ ভাবে সৎ সংস্কার নিয়ে চলতে চলতে এক দিন এই ভাব আসতে পারে। তাই, যাই কর ***কিছু সময় অন্ততঃ প্রত্যহ নিয়মিত সাধু সঙ্গ করবে বিশেষ বাধা না পড়লে সামান্য দেহ সুখ আদির দোহাই দিয়ে এ নীতিটা ভঙ্গ ক'রো না।***

দ্বিজেন গাহিল

তুমি না জানালে পরে, কে তোমারে জানতে পারে ?
যত বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে।
যাগ, যজ্ঞ, তপ, যোগ সকলি যে কর্ম্ম ভোগ,
সে যে ধর্ম্ম, তোবার মর্ম্ম কি পায়, তুমি সব কর্ম্ম পারে।
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, কায়া নয় সকলি ছায়া,
সে যে মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে।
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
ওগো অসাধ্য সুসাধ্য যে তার, তুমি কৃপা কর যারে।
তব কৃপা আশা করি বয়েছি জীবন ধরি
ওহে কৃপাময়! কৃপা ক'রে এসে ব'স হে হৃদ মাঝারে।

—•—

চতুর্থ ভাগ—তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা, মঙ্গলবাব ১৬ই শ্রাবণ ১৩৪০ সাল,
ইং ১লা আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যাব পব শ্রীশ্রীঠাকুবেব ঘবে ডাঃ সাহেব, দ্বিজেন, কৃষ্ণকিশোব, পুত্তু, জ্ঞান, প্রফুল্ল, তাবাপদ, ললিত ভট্টাচায্য, হবপ্রসন্ন, গোষ্ঠ, মনোবঞ্জন ধনকৃষ্ণ, ইঞ্জিনিযাব (ডাঃ সাহেবেব ভাই) জয, শ্যাম, দ্বিজেন সবকাব, ভোলা, অভয প্রভৃতি আছে।

কাশী হইতে নগেন চিঠি লিখেছে যে যোগবাশিষ্টে আছে 'চিত্তবোধ হলেই যে দর্শন হবে তা নয', এটা ভুল. চিত্তবোধ মানেই চিত্তবৃত্তি নিবোধ. তখনই জ্ঞান হয ও দর্শন হয। এত কথায ঠাকুব বলিতেছেন।

ঠাকুব। যোগবাশিষ্ঠে যে চিত্তবোধেব কথা বলেছে ওটা কৌশল দ্বাবা চিত্তবোধ। ওকে ত ঠিক চিত্তবোধ বলে না যেমন হাত দিযে চোখ চেপে ধবলেই অন্ধ হয না, চোখ ছেড়ে দিলেই আবাব দেখতে পায, তেমনি কৌশল দ্বাবা জোব ক'বে চিত্তবোধ কবা হ'লে বৃত্তিগুলো চাপা বইল মাত্র, কৌশল ছেড়ে দিলেই আবাব আগেব মত বৃত্তি গুলো খেলতে থাকে। ভেতবেব সব বৃত্তি গুলো না ম'বে গেলে ঠিক চিত্তবোধ হয না। যাব ঠিক চিত্তবৃত্তি নিবোধ হযেছে তাব ত ভগবান দর্শন হযে বযেছে।

কৃষ্ণকিশোব। কোন বকম চিন্তা কবিনি, কিছু না, বেশ মন প্রফুল্ল থাকতে থাকতে হঠাৎ মন খাবাপ হযে গেল এব কাবণ কি?

ঠাকুব। কোন চিন্তা না কবলেও মন খাবাপ হওযার প্রধান কাবণ বাযু অসবল। বাযু অসবল থাকলে মন খাবাপ হয, ভয আসে, দুঃখ আসে। তা ছাডা দুঃখ ত সর্ব্বদাই ভেতবে পোবা বযেছে, ক্ষণিক

হয়ত মন অন্য মনস্ক হওয়ায় দুঃখ বোধ হ'ল না কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই পুরান চিন্তা ভাবনা এসে মন খারাপ ক'রে দিলে এবং দুঃখ এল। আর এক হয়, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি জোর চিন্তা করলে আপনা আপনি মনে তাদের সেই চিন্তার ছায়া আসে, তবে সাধারণের মনের অবস্থায় এগুলো বড় ঘটে না।

জ্ঞান। আমাদের মন যে রকম নীচগামী ও কলুষিত তাতে ব্রজলীলা বা রাসলীলা পড়া উচিত নয়। শাস্ত্রগ্রন্থ সাধারণের জন্য; তাতে ওসব মানসিক নোংরা ভাব অমন ক'রে ফুটিয়ে লেখবার দরকার কি? যাদের মন উঁচুতে উঠেছে তারা না হয় প'ড়ে ঠিক ভাব নেবে।

নন্দ। রাসলীলা জিনিষটা ঠিক বোঝা যায় না; স্বামী, পুত্র ছেড়ে রাত্রে পর পুরুষের সঙ্গে এই ব্যবহারটা ভাল লাগে না।

ঠাকুর। গোপীরা ত পর পুরুষ ব'লে যায়নি, তাদের পর জ্ঞান ছিল না, কৃষ্ণ যে তাদের আপন। তবু কৃষ্ণ তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে বলছেন এত রাত্রে স্বামী ছেড়ে এখানে আসা কি তোমাদের ভাল হল? তা ছাড়া আমি এক জন পরপুরুষ, তাতেও তারা ঠিক রইল। আর এই খারাপ ভাবটা তোমার মনের ওপর, তুমি মনে কু পুরে রেখেছ ব'লেই কুভাবে দেখছ; তোমার মেয়ে বা তোমার মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে বা গায়ে হাত দিতে কোন কু ভাব ধর কি? আর পরস্ত্রীলোক হলেই ধর কেন? তোমার মন সেই রকম ক'রে রেখেছ ব'লেই ঐ ভাব মনে আসে। গোপীদের প্রেম সামর্থা, অর্থাৎ নিজের যা খুসি হোক যাকে ভালবাসে তার সুখেই সুখী, তারা মান অভিমান, সুখ, দুঃখ, লাভ, লোকসান, সব তুচ্ছ ক'রে ছুটছে। তাছাড়া, ভাগবত পড়েছেন স্বয়ং শুকদেব যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রেছেন আর শুনেছেন রাজা পরীক্ষিত যিনি সংসার ত্যাগ ক'রে মরতে চ'লেছেন; আর এখন প'ড়ছে সাধারণ বদ্ধ সংসারী এক পণ্ডিত আর শুনছেও সেই রকম আর এক বদ্ধ সংসারী। পণ্ডিত ১০৲ দশ টাকা পাবে ব'লে

পড়ছে, এই টাকার ওপরই তার ভাগবত ব্যাখ্যা নির্ভর করছে, টাকা না পেলে আর ভাগবত বেরুবে না। আর তোমরা ১০৲ টাকা দিয়ে শুনছ, তোমাদের শোনাব দাম ঐ ১০৲ টাকার ওপর, বোঝ আর নাই বোঝ টাকা দিয়েছ ব'লে ব'সে শোন নইলে তাও শুনতে না হয়ত, কাজেই তোমরা গোপীদের অমন সমস্ত কামনা, বাসনা, দেহসুখ প্রভৃতি তুচ্ছ ক'রে নিঃস্বার্থ ভালবাসায় অন্ধ হয়ে কৃষ্ণতে আত্মসমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণেরও এই ভক্তদের অকপট ভালবাসা গ্রহণ আগ্রহ এই উচ্চ ভাব গুলো ছেড়ে সাধারণ বদ্ধ সংসারীর স্বভাবটা এতে আরোপ ক'রে কোথায় কৃষ্ণ গোপীদের গায়ে হাত দিলেন এইটেই খারাপ ভাবে ধ'রে নেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমাদের ভাব অনুযায়ী তোমরা গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি কুভাব আরোপ ক'রে দেখবে আর কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ ওগুলো বিশ্বাসই করবে না কারণ মেয়েছেলে বেটাছেলে যে কুভাব ছাড়া থাকতে পারে এটা তোমাদের ধারণারই বহির্ভূত, আবার তুমি অসাধারণ কিছু পার না বলেই কৃষ্ণ যে অসাধারণ কিছু করতে পারেন না এই সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছ। তারপর দেখ, কৃষ্ণকে কি ভাবে ধরছ? যদি ভগবান কি অবতার এই রকম একটা বড় ভাব ধর ত আবার তাতে দোষ দেখ কেন? তর্কের খাতিরেও যদি ধ'রে নাও যে গোপীরা সব সাধারণ গয়লার মেয়ে, ওদের ত আর উচ্চ ভাব হতে পারে না, ওদের সব নোংরা ভাব; কিন্তু এটা ত সবাই স্বীকার ক'রে গেছেন যে কৃষ্ণ ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তারা মেশেনি। অপর পুরুষ থাকলে এই লীলার মধ্যে নোংরা ভাব থাকলেও থাকতে পারত। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং তিনি ভগবান বা অবতার ব'লে তাঁর মধ্যে মন্দ ভাব থাকতে পারে না। কাজেই গোপীদের মন্দ ভাব আসছে কোথায়? একটা দেওয়ালের সামনে কতক গুলো মেয়েছেলে রং তামাসা করলে কি তাকে নোংরা ভাব বলবে? পুরীতে স্নান যাত্রার দিন স্ত্রীলোকেরা জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করে এটায় কি মন্দ ভাব লাগছে? ভাবটা তোমার মনের ওপর। স্ত্রীলোক

সম্বন্ধে তোমার মনে সর্ব্বদাই নোংরা ভাব রয়েছে, তাই তুমি স্ত্রীলোকের সঙ্গ করলে তোমার যেমন দুর্দ্দশা হয় তুমি সেই ভাব নিয়ে বিচার ক'রে দোষ দেখছ। গীত গোবিন্দে এই মধুর ভাব বর্ণনা ক'রে দেখাচ্ছে যে প্রেমে বা অনুরাগে গোপীরা কি রকম সমস্ত ছেড়ে এক কৃষ্ণতে আত্ম-সমর্পণ করেছে। তাদের মনে কৃষ্ণ ছাড়া অপর চিন্তা ছিল না। রাসলীলায় কান্তাভাবে সরলে এসে আলিঙ্গন করছে। কান্তাভাবে লজ্জা বা ভয় ব'লে জিনিষ থাকে না এবং সাধারণ কাম ভাব সেখানে স্পর্শ করতে পারে না। ভক্তি ছাড়া আর কোথাও ত এ রকম কোন চিন্তা বা বিচার না রেখে একেবারে আপনাকে ভুলে মন প্রাণ সমর্পণ করা পাওয়া যাবে না। তাই ভাগবতে রাসলীলার এই মধুর ভাবটি এত ক'রে ফুটিয়েছে। তার কারণ কি? তোমরা স্বতঃই রূপ রস গন্ধে অন্ধ হয়ে রয়েছ, সর্ব্বদাই এদের সাধনা নিয়ে রয়েছ তাই তোমাদের স্বাভাবিক ভাবটা ধ'রে দেখাচ্ছে যে ঐ রূপ রসের আকর্ষণটা একটু হেরফের করে এই অনিত্য রূপ রস ছেড়ে বড় জিনিষে দাও। স্ত্রীতে বা স্বামীতে যে সাধারণ ভালবাসা নিয়ে সর্ব্বদা সংসারে রয়েছ সেই ভালবাসাটা ভগবানে দিতে পারলেই ত কাজ হ'ল। যাতে এই ভাব আসে সেইটে আনবার জন্যই ত এই সব শাস্ত্র পড়া বা শোনা। ব্রজলীলায় গোপীদের ভক্তি রস ফুটিয়ে দেখাচ্ছে; ভালবাসায় যে কি রকম উন্মাদনা আসে এবং তাইতে যে কেমন ক'রে সব ভুলে একলক্ষ্য হয়ে গতি করে এইটে দেখাচ্ছে। যেন না এই পড়তে পড়তে শুনতে শুনতে যদি কখন মনে এর ছায়া প'ড়ে এই ভাবে চলবার কিছু ইচ্ছা আসে। আর, এ পর্য্যন্ত যারা খারাপ হয়েছে তারা কি এই রাসলীলা প'ড়ে খারাপ হয়েছে? অনেক সময় ভাগবত পাঠক পণ্ডিতও যে খারাপ দেখা যায় তারাও ভাগবত পড়ার আগেই খারাপ হয়েছে এখন কিছু রোজকারের জন্যে ভাগবত পড়া বৃত্তি নিয়েছে। তোমরা সাধারণ ভাব নিয়ে বিয়ে ক'রে একটা স্ত্রীর ঠেলাই সামলাতে পারছ না, পালাই পালাই ডাক ছাড়ছ আর এই দশ হাজার গোপীকে ঐ ভাবে রাখা

কি কম শক্তির কথা! মুখেত বলছ, এক দিন সে শক্তি রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে কি? কোথায় বেরিয়ে চ'লে যাবে তার ঠিকানা নেই। তাই নিজের ভাব নিয়ে ভগবানের কাজের বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, গোপীদের সঙ্গে ব্যবহারটাকে তোমার ভাবে রং দিয়ে ত বেশ বিশ্বাস করছ কিন্তু কই গোবর্দ্ধন ধারণ করার বেলা বিশ্বাস কর না কেন? নিজের ভেতরের বৃত্তি গুলো আগে ঠিক কর, কামনা বাসনা জয় করতে শেখ তবে চোখ খুলবে, কিছু জ্ঞান হবে, তখন ভাগবত প'ড়ে বা শুনে কিছু ভাব ধবতে পারবে, নইলে শুধু নাটক নভেল বা গল্পের বই হিসাবে পড়লে কি হবে? ভাগবত আদি ভাবের বিষয়, ভেতরে ভাবের উদয় না হ'লে ত বুঝতে পারবে না। তাই বলেছে, ত্যাগী ছাড়া অপবের কাছে শাস্ত্র শুনতে নেই কারণ ত্যাগী ছাড়া কেউ ঠিক শাস্ত্র বোঝে না। তবে ত্যাগী ত আর সব সময় মেলে না তাই পণ্ডিতের কাছে শুনলে এটাও হতে পারে ত যে এক দিন ত্যাগ আসতে পাবে। অন্ততঃ এই শুনে শুনে এটাও যদি বোধ আসে যে সংসাব, স্ত্রী, পুত্র সব অনিত্য তা হলেও ঢের লাভ কারণ এই অনিত্য জ্ঞান এলে তবে ত নিত্য জানবার ইচ্ছা আসবে এবং তখন ত সেই বস্তু লাভের চেষ্টা করবে। অনিত্য এই জ্ঞান টুকু হলেই তখন মানুষ, নইলে ত পশু। যে যে বস্তুতে যে যে ভাবে অনুরাগ আসে কবিকে ত সেই সব ভাব স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে দিয়ে বর্ণনা করতে হবে নইলে যে খেঁদো হয়ে যাবে। মানুষ বর্ণনা করতে গিয়ে সামান্য কিছু বাদ দিলেই অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। তোমার ভাব মন্দ ব'লে তুমি সে গুলো মন্দ ধ'রে নেবে, তার জন্যে কবি বর্ণনা অসম্পূর্ণ রাখবে কেন? তাহ'লে কালিদাস প্রভৃতির কোন বইই ত পড়া উচিত নয়। তাই চিত্রকর ভানুমতীর চিত্র অবিকল সজীবের মত আঁকলেও কালিদাস বললেন ঠিক হয় নি তখন চিত্রকর রাগ ক'রে তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিতেই উরুতে একটু রং ছিটকে তিলের দাগ পড়তেই কালিদাস বললেন যে এইবার ঠিক হয়েছে। কবির ভাব অনুযায়ী নিখুঁত বর্ণনার অপলাপ

করা উচিত নয়, তোমার দোষ মনে হয় তুমি সেখানটা বাদ দিয়ে পড়তে পার।

জ্ঞান। কৃষ্ণকে ভালবাসলেও মৃত্যু হ'লে ত বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ হবে?

ঠাকুর। তুমি সাধারণ ভাবে ভালবাস, তোমার কিছু দুঃখ আসতে পারে কিন্তু কৃষ্ণের ত কোন দুঃখ আসবে না। কিন্তু তা হয় না, কৃষ্ণের ন্যায় বড়কে ভালবাসলে তার সেই শক্তিতে তোমার দুঃখ আসতে দেবে না। তখন তোমারও বোধ আসতে থাকবে যে কৃষ্ণ ত নিত্য বস্তু, আর আত্মাও ত নিত্য তবে এই অনিত্য দেহ গেলেই বা ক্ষতি কি? আত্মার ত কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হচ্ছে না, সে দুঃখ করবে কেন? সংসারে তোমাদের ভালবাসার পরিণাম কান্না। সৎ এ ভালবাসার যে কি পরিণাম তা ত জান না বা বুঝতে পার না তাই সেইটে বোঝাবার জন্যে নানা ভাবের বর্ণনা ক'রে গেছে, যেটায় তোমার মন বসে সেইটা ধ'রে গতি করতে পার। পরমহংসদেব বলতেন সতীর পতির প্রতি টান, মার সন্তানের প্রতি টান ও বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান এই তিন টান একত্র হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায়। এর এক একটায় তাঁর দিকে গতি কবায়, কারণ বিষয়ী কিছুতেই বিষয় ছাড়ে না; মা ছেলে ম'রে যাচ্ছে দেখেও যেটা থাকে তাকে জোর ক'রে ধরে, ছাড়ে না; সতী পতি ছাড়া জানে না। এ বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এ সব ভাবের ভেতরই সবাই আছ, এ ভাব সবাই হাড়ে হাড়ে বুঝেছ, এ ভাব আর কাউকে নতুন ক'রে বোঝাতে হবে না কেবল ভাবের বস্তুটা একটু বদলে দিলেই হ'ল অর্থাৎ অর্থাদি অনিত্য বস্তুর প্রতি টান ছেড়ে নিত্য ভগবানের প্রতি মন দাও। সতীর পতির প্রতি টান মানেই মধুর ভাব, মার সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ভাব আর বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি সখাভাব ও দাস্যভাব দুইই রয়েছে, কারণ সখার প্রতি যেমন বেশী টান হয় তেমনি বিষয়ীর টাকার প্রতি সব

চেয়ে বেশী টান, আর সে টাকার জন্যে যার তার দাস্যতা ও যে কোন হীনতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

দ্বিজেন। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ ও শঙ্করের অদ্বৈত বাদ নিয়ে যে কত ঝগড়া হয় তার ইয়ত্তা নেই। শিবপুরে এক জন পণ্ডিত শঙ্করের মত কাটাবার জন্যে কত বক্তৃতা করেছে।

ঠাকুর। বিশিষ্টাদ্বৈত বাদে জগৎ সত্য আর অদ্বৈত বাদে জগৎ মিথ্যা এই নিয়েই না ঝগড়া। মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জগতকে মিথ্যা বলতে পার না। চোখের সামনে দেখছ কি ক'রে মিথ্যা বলবে? মন রাজ্যে লীলা সত্য। কিন্তু মন না থাকলে, মন চ'লে গেলে অর্থাৎ মনের বাইরে গেলে তখন জগতটা সত্যিই মিথ্যা। এ লীলা অনিত্য, এ ত তোমরা নিজেদের মধ্যেই উপলব্ধি করছ। যখন ঘুমোও তখন মনের কোন কাজ থাকে না, তখন জগতের কোন বোধ থাকে কি? তখন জগত মিথ্যাই বোধ হচ্ছে। কিন্তু যেই ঘুম ভাঙ্গল অমনি চোখের সামনে সমস্ত জগতটা দেখতে পাচ্ছ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে অনুভব করছ, তাদের সঙ্গে কথা কইছ, তাদের নিয়ে ব্যবহার করছ, কাজেই তখন আর জগত মিথ্যা বল কি ক'রে? চোখের সামনে সত্যি জ্বল জ্বল করছে। রামানুজ মনের মধ্যে থাকলে, মায়ার সঙ্গে ব্যবহার রাখলে যে যে অবস্থা হয় তাই ব'লে গেছে আর শঙ্কর মনের বাইরে গেলে, মায়ার গণ্ডি পার হ'লে যে যে অবস্থা হয় তাই লিখেছে। আসল তোমার প্রয়োজন কি? দুঃখের নিবৃত্তি। যে যায় তারই নাম জগত। তা যে ভাবেই হোক যাচ্ছে ত, তোমায় বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ দিচ্ছে ত? স্ত্রী, পুত্র নিয়ে মায়ায় জড়িয়ে রয়েছ, হঠাৎ হয় তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল বা তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। যে রকমেই হোক তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দুঃখের উৎপত্তি করলে। তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে মায়ায় জড়িয়ে থাকতে ভালবাস বটে কিন্তু এই বিচ্ছেদ দুঃখ ত চাচ্ছ না অথচ জগতে এই বিচ্ছেদ অনিবার্য্য, তাই আসল দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টা খোঁজ। জগত সত্য হোক, মিথ্যা হোক তাতে কি আসে

যায়? তোমার দুঃখ গেলেই হ'ল। সত্যে যদি দুঃখের নিবৃত্তি না হয় তা হলে সত্য চাও কি? আর মিথ্যায় অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র নিয়ে যদি দুঃখের নিবৃত্তি হয় ত সেই তোমার ভাল; জগৎ সত্য, এই লীলা সত্য এই ভাল অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত বাদই ভাল কিন্তু তাত হয় না। সত্যে না গেলে, ত্যাগ না এলে আসল দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, কাজেই বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ ছাড়িয়ে অদ্বৈতবাদে নিয়ে গিয়ে ফেলে। তবে বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব খারাপ বা ভুল ত বলা যায় না। সংসার যতক্ষণ ততক্ষণ এই ভাবই প্রবল। এতেও ঢের শেখবার আছে। শঙ্কর কখনও সংসারে ছিলেন না ব'লে তাঁর এ ভাবের রস আস্বাদন হয়নি। সে জন্যে ভাবের পূর্ণতা আনবার জন্যে তাঁকেও কিছু দিনের জন্যে সংসারে ঢুকতে হয়েছিল। মনের সে উচ্চ ভাব না এলে, সম্পূর্ণ ত্যাগ না এলে অদ্বৈতবাদ উপলব্ধি করা যায় না। যিনি তর্ক করেন তিনিও কিছুই বোঝেন না শুধু ভাষা নিয়ে তর্ক করেন।

জ্ঞান। শরীর ত অনিত্য, যাবেই, এ জেনেও ত কই না খেয়ে থাকতে পারা যায় না। দেহ রাখবার জন্যে এত খাওয়ার ব্যবস্থা। সাধু সন্ন্যাসীদেরও খাওয়া বাদ যায় নি। কাজেই এর জন্যেও ত কিছু টাকা চাই। একেবারে ত্যাগ এলে চলবে কি ক'রে?

ঠাকুর। তোমরা সংসারী, বাজারে গিয়ে খাবার জিনিষ আনছ। বাজারে ত অমনি দেয় না, পয়সা চাই, তাই পয়সা আনবার জন্যে দিন ভোর কাজ কচ্ছ। আর সাধুরা বনে জঙ্গলে গিয়ে ফল মূল প্রভৃতি খাবার আনে, তবে গাছ ত আর তাদের কাছ থেকে পয়সা চায় না, তাই তাদের পয়সা রোজগার করতে বেরুতে হয় না। নইলে দুয়েরই ত এক অবস্থা। সাধন অবস্থায় উচ্চ হ'লে অনেক সময় বায়ুভুক হয়ে থাকে বটে কিন্তু সংসারের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলেই আহার দরকার হবে। তখন বায়ুভুক হয়ে শরীর রাখতে পারা যায় না। তবে তফাৎ কি জান? তোমরা টাকার অনুসন্ধান কর আর টাকা সাধুর অনুসন্ধান করে। তোমরা টাকা চাচ্ছ, তার জন্যে ছুটোছুটি করছ অথচ পাচ্ছ না কিন্তু সাধুদের টাকার প্রয়োজন নেই অথচ তার অভাব কিছুই নেই, যে রকম ক'রে হোক ঠিক এসে হাজির হবেই।

জগত শুদ্ধ লোক মিলে বিরুদ্ধতা করলেও কারুর ক্ষমতা নেই আটকায়, যে রকমে হোক ঠিক আসবেই। সাধু টাকার জন্যে ভাববেও না সঞ্চয়ও করবে না, এ বিষয়ে কোন চিন্তাই সে রাখে না। দরকার হ'লেই না চিন্তা আসবে। দরকার কমিয়ে ফেল, বাসনা ত্যাগ কর, তুমিও এই রকম চিন্তাশূন্য হতে পারবে। নইলে অর্থ থাকলেই কি চিন্তা যায়? ধনীদের ত আরও অর্থের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এক জন ধনী বৈদ্যনাথের কাছে প্রার্থনা করলে তের লাখ টাকা পাইয়ে দাও খুব সদ্ব্যয় করব। এও কামনা হ'ল, এতেও দুঃখ দেবে। তুমি কি জগতের দুঃখ নিবৃত্তি করতে এসেছ না তুমি সৎ কাজ না করলে জগত অচল হবে। তাঁর করাবার দরকার হয় তিনি টাকাও পাঠাবেন তোমার ভাববার দরকার কি? এই ভাব না আনতে পারলে ত্যাগ আসবে না শান্তিও পাবে না।

দ্বিজেন গাহিল

বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবন না হেরে,
খুঁজি সব ঠাঁই কোথাও না পাই, কে হ'বে নিল মম মন চোরে।
সুখে ডালে ব'সে ডাকিছ পাখী রে ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে?
কি ব'লে ডাকিছ ব'লে দে আমারে, ডেকে দেখি যদি পাই রে।
গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুণ গুণ, গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ?
শিখাও আমারে আমি রে নির্গুণ, কি গানে তুষি রে তাঁরে।
কেন ফুল, কুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে?
পায়ে ধরি বল কেমনে পাইলে, কি গুণে ভুলালি তাঁরে।
কৈলাশ, সুমেরু, ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল,
হেরিয়া করিছ কি জনম সফল সেই বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভরে?
সুনীল গগন নীল আবরণে আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণ ধনে,
খোল আবরণ বারেক নয়নে হেরে মন প্রাণ জুড়াই রে॥

চতুর্থ ভাগ—চতুর্থ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ১৮ই শ্রাবণ ১৩৪০ ;
ইং ৩রা আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রী ঠাকুরের ঘরে ডাঃ সাহেব, দ্বিজেন, শ্যাম, কৃষ্ণ, জিতেন, পুত্তু, কালু, জ্ঞান, জিতেন (এলাহবাদ) প্রফুল্ল, তারাপদ, কৃষ্ণকিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, হরপ্রসন্ন, কালী, মতি ডাক্তার, দ্বিজেন সরকার, সুধাময়, পঞ্চানন, ইঞ্জিনিয়ার, জয়, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

শিবপুরের চুনীর বাড়ীতে এক জন সাধু আছে। সে না কি, সহস্রারে কি বীজ আছে তার ধ্বনি শোনাতে পারে। অনেককে শুনিয়েছে, কেউ কেউ না কি বিশ্বাস করেনি। তার ইচ্ছা সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনায়। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। এ ধ্বনি ত সে নিজে শুনবে। আর প্রণবের ধ্বনি যদি ঠিক ঠিক শোনাতে পারে ত সেখানে যত লোক থাকবে সকলেই সেই মধুর ধ্বনিতে মুগ্ধ হ'য়ে অঘোর হয়ে থাকবে। তখন আর তার কি ভাল মন্দ বিচার করবার অবস্থা থাকবে যে সে বিশ্বাস করছে, কি, না করছে বলবে।

জিতেন (এ) বাসনা ত্যাগ না করলে শান্তি আসে না বটে কিন্তু যদি কোন বাসনা থাকে ত তাঁকেই জানান উচিত।

ঠাকুর। হ্যাঁ, কিন্তু এও ত ত্যাগ। অপর কাউকে না জানিয়ে যে তাঁকেই জানাচ্ছ এও মনের শক্তি না হলে পারবে কেন? অহং কতটা কমা দরকার যে নিজেরা বাসনা পোরাবার চেষ্টা না ক'রে তার জন্যে তাঁকে জানাচ্ছ। আর এক কথা, তাঁর ওপর তোমার বিশ্বাস আছে তবে ত তুমি তাঁকে জানিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছ। সাধারণতঃ তাঁর কাছে তিন ভাবে মানুষ যায়। বেশীর ভাগ কাঙ্গালী ভাবে যায় অর্থাৎ কাঙ্গালী যেমন বাবুর কাছে টাকা পাবার আশায় যায়, তখন দরোয়ানের গলা ধাক্কা প্রভৃতি গ্রাহ্য করে না

তেমনি কিছু পাবার আশায় ভগবানকে ডাকছ। যেই ভগবান বলছ, বড় বলছ, তখনই মনে আশা রেখেছ। ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি তাতে তোমার মঙ্গল হবে এই ভাবে তাকে ডাকছ। আর আছে, সন্তান ভাব। বাপের ঐশ্বর্য্য ছেলেরই প্রাপ্য এই বিশ্বাসে সে স্থির হয়ে ব'সে আছে ও নিশ্চিন্ত রয়েছে। এখানেও কিছু ভগবান ভাব অর্থাৎ তাঁর ঐশ্বর্য্য ও বড়ত্বের ওপর লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু যে প্রেমে তাঁর কাছে যায় তার ত কোন স্বার্থ থাকে না। তাঁর ঐশ্বর্য্য থাক না থাক তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে ত সে সব খোঁজে না সে তাঁকেই চায়, আর অন্য কোন জিনিষে তার নজর নেই। যে ভাবেই যাও খানিকটা রোক থাকা চাই, মনের শক্তি থাকা চাই, কিছু ত্যাগ থাকা চাই, নইলে গতি করতেই পারবে না। যাদের সাধারণ দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, এ টুকু মনের শক্তি যাদের নেই তারা কিছুই পাবে না। তারা ঠিক সংসারও করতে পারে না বা তাঁর দিকেও যেতে পারে না। বাসনা থাকলে তাঁর কাছে চাওয়াই ভাল কারণ সৎ এ বাসনা করায় বাসনা ক'মে আসবে, তবে মনটা যত সাফ রাখতে পারবে ততই ভাল। বাসনা কামনা ত রাখবেই না, এমন কি মুক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাও রাখবে না। তা'হলে অভাব ব'লে জিনিষ থাকল না কাজেই শান্তি এল। গোপীকাদের এই ভাব ছিল। তারা কৃষ্ণ ছাড়া জানত না, কৃষ্ণকে চাই, আর কিছু দরকার নেই। তাই, উদ্ধব যখন তাদের বললে 'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তোমরা কৃষ্ণকে ভালবেসেছ তোমাদের সব মোক্ষ হয়ে যাবে'। তখন তারা বললে ও কি কথা বলছ? এ কৃষ্ণ আমাদের। ভগবান কৃষ্ণ বা মুক্তি মোক্ষ দেবার কৃষ্ণ থাকেন ত সে আলাদা আছেন। তাঁর কাছে চেয়ে নেওয়ার চেয়ে তিনি যা করেন তাই ভাল। তা ছাড়া তিনি যখন সর্ব্বময় তখন যাচ্ছই বা কোথায়? তোমাদের অনুভূতি নেই যে তোমরা মায়ের কোলেই ত রয়েছ। এ বোধ তোমাদের নেই। ভগবানকে ত তোমরা কেউ বুঝতে পার না, তবে তাঁর ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনে কিছু ভক্তি কর ও মেনে নাও। অবস্থা না এলে ত ঠিক বুঝতেও পারবে না,

তাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে চলতে বলেছে, গুরুই ঠিক বুঝিয়ে দেবেন। আর, যদি নিজে বুঝে চলতে চাও ত সেই ভাবে বিচার ক'রে চল। চাচ্ছ ত দুঃখের নিবৃত্তি। সংসারে দেখছ সবাই দুঃখ পাচ্ছ, এই সংসার অনিত্য এই গুলো দেখে যে যে জিনিষে দুঃখ দিচ্ছে সেই জিনিষ থেকে তফাৎ থাকতে চেষ্টা কর তবে দুঃখ নিবৃত্তি করতে পারবে। এখানে নিজেকে শক্তিমান হতে হবে কিন্তু গুরুতে বিশ্বাস রাখলে, তাঁর কথা অনুযায়ী চললে গুরুশক্তিই তোমাকে রক্ষা করবে ও ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। গীতা মানেই ত্যাগ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিনটি পথ গীতায় দেওয়া, এব যেটা হোক একটা নিয়ে গতি কর। হিন্দু সমাজে তোমাদেব অনেক ভাল কথা জানা আছে এবং এ সংস্কারও আছে যে এই সব সৎ গ্রন্থ পাঠ কবলে বা সৎ কথা আলোচনা করলে কিছু মঙ্গল হবে। সেই সংস্কার বশে তোমরা সৎ গ্রন্থ পড় ও সৎ আলোচনা কর। এই সৎ অনুষ্ঠান গুলোও খব ভাল কারণ এ রকম করতে করতে হয় ত এক দিন ঐ দিকে একটা ভাব লেগে যেতে পাবে। আর, এও যে কর এতে বুঝতে হবে যে ভেতরে একটা সৎ হবার ইচ্ছা হয়েছে এবং তার জন্যে চেষ্টা করছ অথচ সংসারে এখনও মায়া বয়েছে সেটাও বজায় রেখে চলছ। তবে, কারুর কারুব পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ হয় ত এমন স্থির বিশ্বাস এলো, যে সে যাই করুক সে নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে। যার এ রকম স্থির বিশ্বাস আছে সে যাই করুক, ঘোব তমগুণের কাজ করলেও তার কোন ভয় নেই, সে বিশ্বাসের জোরেই বেরিয়ে যাবে। তমগুণে এ বিশ্বাস আসে না, সত্ত্ব, রজঃ মিশ্রিত প্রকৃতি না হলে এ রকম বিশ্বাস আসতে পারে না এবং বাইরে যে ভাবেই কাজ করুক, যে ভাবই দেখাক ভেতরে তার ত্যাগ থাকবেই নইলে এত বিশ্বাস দাঁড়াতে পারে না। রাবণের এই রকম স্থির বিশ্বাস ছিল। সে বাইরে যাই করুক ভেতরে প্রধান ভক্ত। আর হবে নাই বা কেন? বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয় শাপগ্রস্ত হয়ে মিত্র ভাবে সাত জন্মের পরিবর্ত্তে শত্রু ভাবে তিন জন্মে উদ্ধার পাওয়ার বর গ্রহণ করলে কারণ সাত জন্ম বৈকুণ্ঠ ছেড়ে, তাঁকে ছেড়ে

থাকার চেয়ে যে ভাবে হোক তিন জন্মে তাঁর কাছে পৌছুতে পারলে আবার আনন্দ পাবে ব'লে শত্রু ভাব নিলে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, অষ্টাবক্র, শিশুপাল, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু এই তিন জন্ম।

জিতেন (এ)। যোগবাশিষ্টে যে তরঙ্গের কথা বলেছে সেটা বেশ। সমুদ্র থেকেই তরঙ্গ কিন্তু তরঙ্গ নিজেই লাফিযে বেড়াচ্ছে, সে যে সমুদ্রেরই, সেটা তার বোধ নেই। তরঙ্গ ক'মে গেলেই সেই স্থির সমুদ্র। আমার মনে হয মাঝামাঝি ভাবটাই ভাল, অর্থাৎ ঢেউএর মত অত চঞ্চল নয আবার স্থির সমুদ্রের জলও নয। মাঝামাঝি থেকে সমুদ্রও দেখা হচ্ছে আবার ঢেউও ভোগ করা হচ্ছে। কিন্তু এই মাঝামাঝি থাকার আর একটা ভয আছে। হযত সেখানে ভূত প্রেত থাকবে।

ঠাকুর। জীবন্মুক্তদের এই ভাব "এ দিক ও দিক দু দিক রেখে খেযেছিল সে দুধের বাটী"। তারা এই দুটোর মধ্যে মনকে বাচ খেলায। ঢেউএ থাকলে তরঙ্গে নাকানি চোপানি খেতে হবে আবার সমুদ্রে মিশে স্থির হযে গেলে লীলার আস্বাদন পাওযা যাবে না। সবিকল্প সমাধিতে রূপ থাকে, সব ছেড়ে গেছে, কিছুই নেই অথচ একটা রূপের আভাষ রযেছে। এখানে ভূত থাকতে পারে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রূপ ছাড়িযে যায তখন আর কিছুই থাকে না কোন আভাষও থাকে না। এ দুই ছাড়া আর এক আছে অমৃত সমাধি। এতে দেখায যেন বাইরের বস্তুর সঙ্গে মন রযেছে কিন্তু মন কোনটাই ধ'রে নেই।

জিতেন (এ)। কালীর ও মূর্ত্তিটা ভাল লাগে না। ঐ মূর্ত্তিতে এলেই মুস্কিল। ও ভযঙ্কর মূর্ত্তির সাধনা করার দরকার কি? আবার সব ছেড়ে গিযে লীলার বাইরে কেবল একলা থাকা, এ কথা ভাবলে ঘাবড়ে যেতে হয।

ঠাকুর। ও হল বধমূর্ত্তি। তা, তোমার ভেতরের কাম ক্রোধ আদি বড় বড় রিপু নষ্ট করতে গেলে ও রকম ভযঙ্কর মূর্ত্তি ছাড়া তারা ভয পাবে কেন? দমন করবার জন্য মহা শক্তির দরকার। মূর্ত্তির এক হাতে মুণ্ড অর্থাৎ সমস্ত জগতের মস্তিষ্ক শক্তি এক হাতে, এক হাতে শত্রু নাশ করবার খড়্গ,

এক হাতে বর দান ও অপর হাতে অভয় প্রদান। এখন এই মূর্ত্তি অশান্তিকর ও অতৃপ্তিকর দেখছ এবং ভয় খাচ্ছ কিন্তু ভেতরের শত্রু গুলো দমন হয়ে গেলে ঐ মূর্ত্তিই আবার শান্ত ও তৃপ্তিকর বোধ হবে এবং তখন আর ভয় খাবে না। রাস্তায় সঙ্গীন ওলা পুলিশ দেখলে সাধারণতঃ ভয় খাও কিন্তু যখন ডাকাত তাড়া করে তখন আবার সেই পুলিশেরই শরণাপন্ন হও। রূপটা ত কিছু নয় ও মায়া। নানা রূপ রয়েছে যার যেটা ভাল লাগে সে সেইটে ধরেই চলুক। বাইরের জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে ঘাবড়াবে, কেন না, তখন যে গুলোয় অভ্যস্ত সে গুলো ত ছাড়েনি, তাদের ভাব ভেতরে রয়েছে। কিন্তু বাইরের জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে ত অপর কোন জিনিষ মনে রইল না তখন আর ঘাবড়াবে না। লীলা মানে ময়রা ছানা চিনিতে কত রকম গড়ন করতে পারে, দেখান। লীলায় মনের খেলা দেখিয়েছে। স কল্প বিকল্প দ্বারা মন রাজ্য যে কি কি করতে পারে তাই দেখিয়েছে মন যত ক্ষণ আসক্তিতে থাকবে ততক্ষণ নতুন নতুন জিনিষ সৃষ্টি ক'রে ধ'রে নেবে, কারণ মন সাধারণত এক রকমে থাকতে পারে না। মনের স্বভাব জুড়ে নেওয়া, তবে আটা টা নষ্ট হয়ে গেলে আর নিতে পারে না। যত শাস্ত্র দেখ ঐ এক কথা, ত্যাগ। কি ক'রে সব ছাড়তে পারে, কি ক'রে ত্যাগ আনতে হয় এরই নানা উপায় শাস্ত্রে লিখেছে। এই একটা কথাই নানা ভাবে লিখেছে কারণ সংসারীরা ত এক কথায় আসতে পারবে না তাই ঐ একই কথা নানা ভাবে বাড়িয়ে নানা উদাহরণ দিয়ে বলেছে যাতে শুনতে শুনতে তোমার এই ভাবটা লাগে। যার বিবেক বৈরাগ্য এসেছে, যার যথার্থই সংসারে বিরক্তি এসেছে সেই কেবল এক কথায় আসতে পারে, তা ভিন্ন, নানা ভাবে বুঝিয়ে পড়িয়ে আনতে হয়। আর, যার ভালবাসা লেগেছে, যার সে প্রেম এয়েছে সে আপনিই সব ছেড়ে আসে তাকে আর কিছু বোঝাবার দরকার হয় না।

জিতেন। যেখানে সেখানে খাওয়া, যার তার হাতে খাওয়া, নিমন্ত্রণ খাওয়া, দোকানের খাওয়া উচিত নয় ত?

খাবার। আসল কথা, যে সব খাওয়ায় মনের চাঞ্চল্য হয় সেগুলো না খাওয়াই ভাল। সাধারণ সংসারী যত কামনা বাসনা নিয়ে সাধুকে খাওয়াতে চায়। তাতে সাধুর মন ক্ষণিক চঞ্চল ক'রে দিলেও সাধুর ভেতরের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না। আর, সাধু তার নিজের জন্যে ভাবেও না, তবে, যেখানে লোক শিক্ষা প্রভৃতির জন্য সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় সেখানে অপর পাঁচ জনের মঙ্গলের জন্যে অনেক সময় সাধুকে সাবধান হতে হয়, পাছে তার থেকে অপরের গায়ে কিছু আঁচ লাগে। সেই জন্যে পরমহংসদেব মাঝে মাঝে তাঁকে দেওয়া খাবার নিজে না খেয়ে নরেন্দ্রকে (বিবেকানন্দকে) পাঠিয়ে দিতেন কারণ তার দোষ হজম করার শক্তি ছিল। তবে, প্রেমে কোন জিনিষ দিলে খেতে দোষ হয় না কারণ তাতে ত কোন কামনা বাসনা পোরা থাকে না। সাধুরা সাধারণতঃ নিবেদন ক'রে খায় কাজেই সাধুর আহারের আগে কোন রান্না খরচ করতে নেই। গেরস্থ বাড়ীতে যে সাধুকে ভক্তি করে, সে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেও আর যারা থাকে তাদের সে ভক্তি না থাকায় তারা সে গুলো ঠিক মত পালন করে না। কিন্তু সাধুস্থানে, দেবস্থানে বা মঠে যারা থাকে তারা সকলেই সৎ ভাবে থাকে এবং সাধুর আহারের আগে খরচ করতে নেই এ নীতি ঠিক মত পালন করে তাই মঠে বা সাধুস্থানে তাঁর শক্তির প্রভাব ছাড়া সাধারণ দোষও হতে পারে না। তা ছাড়া, সামাজিক কাজ কর্ম্মে বহু লোকের ছোঁয়া হয় ব'লে দোষ হয়, তবে সংসারে থাকতে গেলে মনের খুব শক্তি না থাকলে সব জায়গায় ত এড়াতে পারা যায় না, তাই, যতটা সম্ভব বাদ দেওয়া ভাল। খাওয়ার গোলমালে বায়ু অসবল করে ও মন চঞ্চল করে। দোকানের খাবারে এমনই ত অম্বল হয়, হজমের গোল হয়, তাতে মন খুব চঞ্চল করে। যারা মনের উন্নতি করতে চায় তারা ঠিক বুঝতে পারে যে অম্বল হলেই কোথাও কিছু নেই বিনা কারণে মনে কি যে একটা অশান্তি আসে, কি যে একটা দুঃখ আসে, কেমন একটা ভয়, চিন্তা, ভাবনা এসে পড়ে ও মনের

শান্তি নষ্ট করে। জগত যায় তাতে ক্ষতি নেই মনের শান্তি রক্ষাই তাদের কাছে সব চেয়ে প্রধান। তবে, সাধারণতঃ হিন্দুর দোকানের খাবার খেলে তত দোষ হয় না, কারণ হিন্দু যত খারাপই হোক পয়সার জন্যে গতি করবার সময়ও ঠাকুরদের নাম করে, এমন কি ডাকাতি করতে যাবার সময় কালী ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাবে। রোজ সকালে দোকান খুলবার সময় স্নান ক'রে, কাপড় ছেড়ে, ধুনো, গঙ্গা জল দিয়ে, ঠাকুরকে স্মরণ ক'রে তবে কাজ আরম্ভ করে। সেই জন্যে ধর্ম্মের দিক দিয়ে সে খাবারে তত দোষ হয় না। বাজারের মাংস অনেক সময় রুগ্ন ছাগলের, কিন্তু মার কাছে লোকে ভাল দেখেই পূজা দেয় এবং তার ওপর আবার প্রসাদ। হরিণের মাংসটা এমনই শুদ্ধ, আর হরিণ ত সচরাচর বাজারে ব্যবসা হিসাবে বিক্রী হয় না, কাজেই সাধারণতঃ শিকারের মাংসই পাওয়া যায়, তাই বাজারের হরিণের মাংসে তত দোষ হয় না। পিঁয়াজ জিনিষটা গরম, এতে বায়ু অসরল করে, তাই খাওয়া বারণ। যদি বল, সাহেবরা, মুসলমানরা খায় ত তাদের ক্ষতি হয় কি? তারা ত স্থূল ধ'রে কাজ করে, স্থূলে তত ক্ষতি হয় না কিন্তু তোমরা যে মনের সূক্ষ্ম অবস্থা নিয়ে গতি করতে চাও, সূক্ষ্মে ক্ষতি হয়। আসল কথা, শক্তির ওপর সব। তুমি যেটা হজম করতে পার সেটায় তোমার দোষ না হতে পারে তবে জিনিষের ধর্ম্ম একটা আছে ত, তার ওপর সাধারণ ভাবে বারণ ক'রে গেছে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এই আগুনের ধর্ম্ম, তাই আগুনে হাত দিতে বারণ করা আছে। কিন্তু যার আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না তার বেলা এই বারণ শোনার দরকার হয় না। তবে প্রসাদে কখনও কোনও বিচার করতে নেই তা'হলে প্রসাদকে খাট ক'রে দিলে ও তাঁর শক্তিকে ছোট ক'রে ফেললে।

জিতেন (এ)। অত হাঙ্গামা করার চেয়ে তাঁকে স্মরণ ক'রে তিনি যা পাঠিয়েছেন খেলেই হয়। তিনি ত সকলের অবস্থা জানেন সেই বুঝে খাবার পাঠাচ্ছেন।

ঠাকুর। দেখ, এ খুব ভাল, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি না হলে এ রকম ভাব নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। একে বলে যদৃচ্ছা লাভ, সকল সময় সকল অবস্থায় যা জুটবে তাই খেতে হবে। রসনা তৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখলে চলবে না। আর কি জান, তাকে ধ'রে যা কর কিছুতেই দোষ হয় না। আহার তিন রকম, সাত্ত্বিক, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যা জুটবে তাই, এর জন্যে কোন চিন্তা থাকবে না, রাজসিক, রসনা তৃপ্তির জন্য অর্থাৎ যা খেতে ভাল লাগে, কটু, অম্ল, তিক্ত তামসিক, যা খেতেও তৃপ্তি হয় না অথচ খেলেও অসুখ করে। তা, হবিষ্যান্ন ঘি মেখে যেই মুখরোচক করলে অমনি আর সাত্ত্বিক রইল না, রাজসিক হয়ে দাঁড়াল। এ ছাড়া, মদ্যাদি রসনা তৃপ্তির জন্য না হলেও অপর আনন্দের জন্য গ্রহণ করে। আসল কথা কি জান, তোমরা সংসারী এত বিচার পেরে উঠবে না, তোমরা সর্ব্বদা মনটাকে সৎ ভাবে রাখতে চেষ্টা করবে। নেহাৎ যে টুকু প্রয়োজন, যা নইলে বিশেষ ক্ষতি হবে কেবল সেই টুক ছাড়া সংসার থেকে তফাৎ থাকবার চেষ্টা করবে। মেলা খুঁটি নাটি না দেখে সেই সময় সাধুসঙ্গ করবে, সৎ স্থানে যাবে। সাধুসঙ্গ হচ্ছে বাঁধ, এই বাঁধ দিয়ে বাইরের ঘোলা জল আসা বন্ধ করলে চট ক'রে ভেতরের জল সাফ হয়ে যাবে। সাধুসঙ্গে এই সব সৎ ভাব আনিয়ে দেবে, এমন কি ভাব বিপরীত হয়ে গেলেও সঙ্গ দ্বারা আবার ভাব ঘুরিয়ে দেবে এর সৎ দিকে গতি করাবে। যতটা পারবে, সময় তাঁকে দেবার চেষ্টা করবে, জপ, ধ্যান করবে, তাঁর চিন্তায় থাকবে ও বাকী কিছু সময় সৎ আনন্দ করবে যাতে তোমার বা অপর কারুর কোন ক্ষতি না হয়। বাসনা কামনা কমাতে চেষ্টা করবে, কাম ক্রোধ আদি রিপু অধীন করবার চেষ্টা করবে। সংসারীদের শাস্ত্র বেশী পড়া ভাল নয় কারণ শাস্ত্র মত না চলতে পারলে শুধু পড়ায় লাভ কি? মাঝখান থেকে অনেক সময় বিপরীত ভাব বুঝে উপকারের চেয়ে বেশী অপকার করবে। তাই, ত্যাগী অর্থাৎ যারা শাস্ত্র মতে চলতে জানে তাদের ছাড়া আর কারুর কাছে শাস্ত্র কথা শুনতে নেই, তাদের কাছে শুনলে তবে তাদের দেখে সেই মত চলতে শিখবে। সর্ব্বদা সৎ ভাবে থাকবার চেষ্টা করবে, যাতে যথার্থ অপরের প্রাণে

ব্যথা লাগে এমন কাজ ক'বো না তাতে যদি নিজেব কোন ক্ষতি হয় তাও ভাল। এই গুলোই হচ্ছে সব চেয়ে বড ঘোলা জল।

কীর্ত্তনেব পব ঠাকুব বলছেন

বেশ, কিছু সময তাঁকে দেবে। সঙ্গই তোমাদেব প্রধান, সঙ্গে কর্ম্মক্ষয কববে, সৎ উদ্দীপনা আনিযে দেবে, মনেব শক্তি বাডিযে দেবে এবং তোমাব যথার্থ প্রযোজন কি বুঝিযে দেবে। সৎ কথা, শাস্ত্র কথা, হিন্দুদেব কি কম জানা আছে কিন্তু তাব একটা মেনে চলতে পাব কি? সাধাবণেব মন ভোলাবাব জন্যে অনেক সময শাস্ত্রে ব° চ° দিযে মধুব ক'বে লেখে কিন্তু শাস্ত্র শুনে সাধাবণেব মত ঐ ব° চ° এ মন না দিযে তোমাব কি প্রযোজন সেই টুক জেনে নিযে চলতে থাক। তবে ত ভগবানেব উপব বিশ্বাস আসবে ও তাঁব দিকে গতি কবতে পাববে, নইলে সাধাবণ স স্কাব বশতঃ পাঠ্য পুস্তকেব মত ধর্ম্ম গস্থ পাঠ ক'বে বিশেষ লাভ হয না ববং তাতে সবজান্তা হযেছি, পণ্ডিত হযেছি, জ্ঞান হযেছে, এই ভাব এসে নষ্ট ক'বে দেবে। যেমন, অনেক সময গেরুযা প'বে কোথায পূর্ব্ব সংস্কাব সব ছেডে দেবে, না, কে তাকে সম্মান কবলে না, কে তাব কথা শুনলে না এই সব মান অভিমানেব মাপ আবও বাডিযে দিলে। এই ভাবে সৎ সঙ্গে সৎ নীতি মেনে চলতে চলতে ক্রমশঃ সৎ স°স্কাব ধববে এব° সৎ দিকে নিযে যাবে। যাব বিশ্বাস এসে গেছে তাব কথা অবশ্য আলাদা, সে স্থিব হযে ব'সে আছে। (এখানে ঠাকুব নাবদ ও চাষাব গল্প বলিলেন, অমৃতবাণী তৃতীয ভাগ ১৩৫ পৃঃ)। অনেকে যখন বলে, সময কাটাব কি ক'বে তখন বাস্তবিক প্রাণে কষ্ট হয। কোথায ভাববে যে তাই ত তোমায ডাকবাব সময পেলুম কই? এত দিন ত সংসাবে বাজে কাজে সব সময নষ্ট কবলুম তোমায ত একবাবও ডাকিনি, নিজেব ত কোন পাথেয সঞ্চয কবিনি, এই ভেবে সে সংসাব থেকে যতটা পারে সময় বেব ক'বে তাঁব জপ, ধ্যান, ও চিন্তায কাটাবে, না, এখনও বলে যে সময় কাটাই কি ক'রে? তাব মানে হচ্ছে, এখনও তাঁকে প্রয়োজন হয় নি, তাঁর দিকে যাবাব ঠিক জোব ইচ্ছে হয় নি। তাই, যে রকম ক'বে হোক রোজ

কিছু সময় অন্ততঃ সাধু সঙ্গ করতেই চাও তবে ঠিক সৎ ভাব আসবে ও তাঁর দিকে যাবার আকাঙ্খা হবে। তাঁর ওপর একটু ভালবাসা না পড়া পর্য্যন্ত এটা কড়া নীতি পালনের মত মানা দরকার। ভালবাসা কিছু পড়লেই আপনত্ব ভাব আসতে থাকবে তখন আর অত জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে না, আপনিই গতি করবে। সংসারীদের পক্ষে ভালবাসায় গতি করার চেয়ে আর সহজ উপায় নেই। আবার, এই ভালবাসা আনতে গেলে নিয়মিত সাধু সঙ্গ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সঙ্গের এমনি প্রভাব যে কিছু সময় সাধু সঙ্গ করলে তা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কিছু মঙ্গল হবেই। (এই খানে ঠাকুর ব্যবসাদার ও মুটের গল্প বললেন, অমৃতবাণী দ্বিতীয় ভাগ ১৭৩ পৃঃ)

বিজয় গাহিল

দানব দল দলনী।
নিদানে করুণা দানে রেখো পদে অভাজনে,
নিস্তার তারিণী তারা, হয়েছি মা পথ হারা,
সন্তানেরে বারে বারে পাঠাস্ নি মা শিবরাণী।
আশী লক্ষ বার আনিলি এ ভব কারাগারে,
পেয়েছি যাতনা মাগো ডাকিতেছি সকাতরে
ষড় রিপু শাসনেতে সতত যাই রিপুর বশে,
আমি যাই যেন সুপথেতে এই কর শিবরাণী॥

চতুর্থ ভাগ—পঞ্চম অধ্যায়

কলিকাতা, শুক্রবার ১৯শে শ্রাবণ ১৩৪০ সাল;
ইং ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ডাঃ সাহেব, তারাপদ, প্রফুল্ল, কালী, পুত্তু, জিতেন, শ্যাম, দ্বিজেন, কৃষ্ণকিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট, কানন, গোষ্ট, মতি ডাক্তার, দ্বিজেন সরকার, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

এলাহাবাদের জিতেন সন্ধ্যার ট্রেণে চ'লে গেছে তার কথায় ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। জিতেনের ভাবটা বেশ। সবই তিনি করাচ্ছেন যখন, তখন আর ভাববার দরকার কি? এ ভাব ত সকলের হতে পারে না। দুটো ভাব আছে, রক্ষা হয় ও রক্ষা করায়। যেমন, ডাকাত কাটতে আসছে, ভগবান যা করেন ব'লে দাঁড়িয়ে রইলে, এখানে রক্ষা হ'ল। আর, ডাকাত আসছে শুনে তুমি নিজে লাঠি ধরলে বা দৌড়ে পালালে, এখানে রক্ষা করালে কারণ তিনিই লাঠি ধরা বা পালানর বুদ্ধি তুলে দিলেন। মূলে অবশ্য তিনিই রক্ষা করছেন। সবই তিনি করাচ্ছেন এ ভাবে চলতে গেলে যখন যে ভাবে যেটা আসচে তখন সেই ভাবে সেটা করতে হবে, কারণ মনের অনেক ভাব, মন অনেক রকমে কাজ করে। এ কিন্তু সব আধারে হয় না ত। তিনি ত সকলের ভেতর সমান কাজ করছেন তবে কেউ সেটা বেশী বুঝতে পারে, কেউ আবার ধরতে পারে না। তিনি ঠিকই আছেন, তিনি সব করাচ্ছেন, এ উপলব্ধি সব আধারে হয় না। আধার অনুযায়ী তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ পায় ও উপলব্ধি হয়; যেমন, সূর্য্য সমান ভাবেই তাপ দিচ্ছে অথচ আতসী কাঁচে পড়লে জ্বলিয়ে দেয়। তাঁর কাছে ত কেউ পর নেই, তিনি ত চাচ্ছেন সবাই ভাল হোক, সবাইকেই সমান কৃপা করছেন, তবে যার যেমন আধার সে তেমনি গ্রহণ করতে পারবে।

সমুদ্র থেকে তুমি এক ঘটী জল নিয়ে এলে আবার এক জন এক জালা জল নিয়ে এলো, সমুদ্রের তোমাকে বেশী জল দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার যে পাত্র ছোট। তোমাদের সকলের দুঃখ যখন আমাকেই লাগবে তখন আমি ত ইচ্ছে ক'রে কাউকে বেশী দুঃখ দিতে পারিনি। তোমরা যে যার কর্ম্মফল নিয়ে এসেছ তার ভোগ হবেই। দুঃখের ভেতর দিয়ে সবাইকেই গতি করতে হবে তা তিনি সাধুই হন আর যাই হন। তবে সাধুসঙ্গে সেই দুঃখের পরিমাণ অনেক ক'মে যেতে পারে; জীবন সংশয়টা অল্পের ওপর দিয়ে যেতে পারে। একটা কথা তোমাদের ব'লে রাখি। ***সর্ব্বদা মনে চিন্তা রাখবার চেষ্টা করবে যে তুমি একা, কোন জিনিষই তোমার নয়, এমন কি দেহটা পর্য্যন্ত তোমার নয়। তোমাকে একাই গতি করতে হবে।*** ঠিক এই ভাব রাখতে পারলে মায়া তোমায় বড় স্পর্শ করতে পারবে না। তখন তুমি মায়ায় ডুবে থাকলেও ক্ষতি হয় না কারণ তুমি ইচ্ছে করলেই সেই মায়া কাটিয়ে বেরুতে পারবে। এই চিন্তা করতে করতে ক্রমশঃ এইটে পাকা হ'লে দেখবে তুমি অনেকটা চিন্তা শূন্য। মরার চিন্তা রাখা আসল মৃত্যুর চেয়ে বেশী কষ্টকর। সংসারে এত গুলো ধ'রে রয়েছ, এরা ম'রে গেলে একলা হবে এই চিন্তাই তোমায় কত দুঃখ দিচ্ছে, কিন্তু যদি মনে ঠিক ক'রে রেখে থাক যে তোমার আর কেউ নেই, তুমি একা, তখন এ চিন্তা ত এলোই না এবং ম'রে গেলেও তত দুঃখ আসবে না। যখনই ভাবছ এরা সব আমার তখনই ঘা খাচ্ছ। একা চিন্তা মানেই ত্যাগ। কেবল তোমাকে ধ'রে থাকা মানেই অপর সকলকে ত্যাগ করলে ত, নইলে একটাকে জোর ক'রে ধরবে কেন? যখন মনে সঙ্কল্প উঠছে না তখনই আসল ত্যাগ। তা ভিন্ন, আমরা সাধারণতঃ যে ত্যাগ করি, জুতা ছাড়ি, জামা ছাড়ি, ওটা ঠিক ত্যাগ নয় ওটা অভ্যাস। ঠিক ত্যাগ এলে, ও সবের কোন চিন্তাই থাকবে না, তখন প্রয়োজন ক'মে আসবে। তবে দেহসুখ আদি বাহিরের ত্যাগ গুলোতে অভ্যাস থাকলে গতি করার সাহায্য করে। সোনার গদিতে শোও কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মাটীতে শুতে কষ্ট বোধ

হয় না যেন, সে অভ্যাস থাকা চাই। তোমার যদি প্রয়োজন না থাকে ত তোমার কাছে সোনার এখন কিছু মূল্য নেই। পরমহংসদেব এত মন গুড়িয়ে এনেছিলেন যে তিনি বলতেন "ওরে চিন্তা আবার কিসের? আছে ত একটা পবিবার, তা তিন বিঘে জমি আছে, পুকুর আছে। জমিতে ধান হবে পুকুর পাড়ে শাক হবে তা হলেই হয়ে গেল, একটা লোকের খাওয়া পরা তাতেই যথেষ্ট হবে।'

জিতেন। তা হলে সংসারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই?

ঠাকুর। দায়িত্ব দায়িত্ব যে কর ও ত মনুষ্য বুদ্ধির কথা। দায়িত্ব কি দেখেছ? দায়িত্ব কে কবছে? অসুখ করলে সেবা করছ, টাকা থাকে ত খরচ ক'রে চিকিৎসা করাচ্ছ, না থাকলে তাও কর না। এ গুলো ত সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি। মানুষেব বিবেক আছে তাই কিছু বিচার ক'রে কাজ কব। যে গুলো কব সব মায়াব ঠেলায় ক'রে যাও, আর দায়িত্ব, কত্তব্য, বড় বড় কথা ব্যবহাব কব। আগে দেখ, দায়িত্ব করার তোমাব ক্ষমতা আছে কি না? যার দায়িত্ব সে করবে। তুমি কারুর কিছুই ত কবতে পাব না, শুধু দুটো ডাল, ভাত খাইয়ে দেখাচ্ছ খুব কত্তব্য কবছ। কারুব দুঃখেব কিছু কম কবতে পার কি? যখন সেটা ঠিক বুঝতে পাববে তখন সব ছেড়ে দিয়ে স্বভাবে আসবে। নইলে অস্বাভাবিক গুলোকে আমার ব'লে ধ'বে ব'সে আছ ত। তখন তুমি সংসারে ঠিক অপরের ভাঁড়াবির মত থাকতে পাববে। তখন তুমি করছ এ ভাব আসবে না এবং কিছু করতে পারলে না ব'লে দুঃখ আসবে না, কারণ তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি ক'রে যাচ্ছ। তখন মনের শক্তি আসবে, টুক ক'রে সব ছেড়ে আসতে পারবে। সংসাবে কারুর ওপর কোন আশা রাখবে না এমন কি নিজের দেহটার ওপরও কোন চিন্তা থাকবে না।

কেষ্ট। গুরু শিষ্য সম্বন্ধে শিষ্য কি একা ভাবতে পারে?

ঠাকুর। গোড়ায় তা হয় না। এত দিন সব ধ'রেই এসেছ, তাই গুরুকে ধ'রে অপর গুলো ছাড়তে চেষ্টা কর। শেষে যত জ্ঞান বাড়বে, গুরুকে আর

বাইরের জিনিষ ব'লে দেখবে না। গুরু তখন ভেতরের জিনিষ এবং তুমি গুরুর সঙ্গে মিশে যাবে। স্থূলদেহ আলাদা ব'লে জ্ঞান রয়েছে। এটা ত উপাধি মাত্র, ফেলে দিলেই সাফ হয়ে গেল। এ যেন বাসনের ময়লা এ গেলেই বাসন সাফ হয়ে যাবে। যে গুরুকে ঠিক ধ'রেছে, যার গুরুর ওপর ঠিক বিশ্বাস আছে তার কিছু কর্ম্ম গুরু নিজে নিয়ে তাড়াতাড়ি খণ্ডন করিয়ে দেন। কিন্তু যারা নিজের ওপর নিয়েছে তাদের বেশী মার খেতে হয়। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম সব নিজেদের ঘাড়ে ত নিতে হয়ই তা ছাড়া এ জন্মেরও কিছু কর্ম্ম হবে ত, সেও নিজেদের ঘাড়ে নিতে হবে। যে গুরুর ওপর স্থির বিশ্বাস রেখেছে তার আর বড় কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। বিশ্বাসের ভাব আলাদা এর এই বিশ্বাসের পরিমাণ তার তত যে তার জন্যে যত করছে। হয় ত গুরুকে ভালবাস, নিয়মিত ঠিক দু তিন ঘণ্টা সঙ্গ করছ, এর বিশ্বাসও আছে কিন্তু তবুও এটা নীতি পালনের মধ্যেই পড়ল। পূর্ণ বিশ্বাস এলে তার সময়ের দিকে নজর থাকে না, সর্ব্বদাই তার সঙ্গ করতে ভাল লাগে। বিচ্ছেদ তাকে সব চেয়ে বেশী দুঃখ দেয় কারণ মনটা তখন আর সব জিনিষ ছেড়ে কেবল গুরুর ওপরই পড়েছে। পূর্ণ বিশ্বাসে আর কোন বিষয়ে বিচার থাকে না, সবই গুরুর ওপর। তার ভাব, গুরু প্রয়োজন মত ঠিক করিয়ে নেবেন, দরকার বোধ করেন অর্থ দিয়ে সংসার সুখ ভোগ করিয়ে নেবেন, যেমন প্রহ্লাদকে দিয়ে জোর ক'রে সংসার ও রাজত্ব করিয়েছেন। কিন্তু বৈধী ভক্তিতে অপর জায়গায়, সংসারের অপর কাজে বিচার রেখেছ অথচ নিজের কিসে ঠিক ঠিক মঙ্গল হয় এটা নিজে ঠিক বোঝ না, গুরুই ঠিক ব'লে দেবেন কিসে তোমার মঙ্গল হবে, এই বিশ্বাস রেখেছ বলে তাঁর কথার বিচার কর না। তুমি শুনলে যে এক জন লোক এক সের রসগোল্লা খেতে পারে, শুনে বিশ্বাস করলে, আবার এক জন এসে বল্লে না, না, আমি নিজের চোখে দেখে এলুম সে একটাও রসগোল্লা খেতে পারে না। তখন বিশ্বাস আর অবিশ্বাস দুটোয় মন টলছে, মনে বিচার আসছে, তখন ঠিক বিশ্বাস নেই।

ঠিক বিশ্বাস থাকলে কোন কথাতেই কান দিতে না, মনে বিচার উঠত না। সাধারণ ভালবাসায় কিছু বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু অবিশ্বাসও আছে, ভালবাসা খুব জোর পড়লে অবিশ্বাস থাকে না। যতক্ষণ আমার ব'লে জিনিষ রাখছ ততক্ষণ অবিশ্বাস আসতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে একটা শুনলে অমনি টকাস্ ক'রে মনে ধাক্কা মারলে। বিশ্বাস জোর থাকলে এ গুলো আসতে দেয় না, আর ধাক্কা খেয়েও ঠিক দাঁড়িয়ে যাও যদি, ত বিশ্বাস যেটা কাঁচা ছিল সেটা পাকা হয়ে গেল।

কানন। যাঁরা সাধু তাঁদের স্ত্রী থাকলে স্ত্রীকে কাছে রাখতে দোষ কি?

ঠাকুর। তাঁর দিক দিয়ে ত কোন দোষ হয় না। যদি সামান্য একটা স্ত্রীলোকের শক্তিতে তিনি তার অধীন হয়ে অন্যায় ক'রে ফেলেন তা হলে তাঁর সাধুত্ব কোথায়? তা হলে তাঁর শক্তি কোথায় যে তিনি জগতের বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার রেখে বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে মিশে যার যে ভাব সেই ভাব দিয়ে গতি করাবেন? এ বড় কম শক্তির কথা নয়। মুনি ঋষি বল, সাধু বল, যারা কেবল নিজেদের ও বাছা বাছা জন কয়েকের সঙ্গে ব্যবহার রেখে কাজ করে তাদের তত শক্তি দরকার হয় না কারণ তারা স্বতঃই বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন প্রকৃতি থেকে তফাৎ থাকে কিন্তু লোক শিক্ষার জন্যে সমাজের ভেতরে বিভিন্ন প্রকৃতির ভেতর থেকে কাজ করতে গেলেই ঢের বেশী শক্তি দরকার। তখন স্ত্রীর সঙ্গে সংসারী মায়ার ভাবে প'ড়ে থাকলে কি এই এত বড় কাজ হয়? তিনি লোক শিক্ষার জন্যে এয়েছেন, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেছে, সমস্ত জগতটা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর মন সর্ব্বদাই সেই সচ্চিদানন্দে প'ড়ে রয়েছে, তবে লোক শিক্ষার জন্যে ইচ্ছা মত মনকে নামিয়ে এনে সকলের সঙ্গে তাদেরই মত এক জন অতি সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার

করেন। আর সাধারণ মানুষও মায়ায় অন্ধ হয়ে তাঁকে খুব সাধারণ ভেবে সেই মত ব্যবহার করে ও তাদের মত সংসারীর অতি হীন প্রবৃত্তির ভাবও তাঁতে আরোপ ক'রে বসে। তারা এ টুকু ভাবে না যে নিজেরা একটি স্ত্রী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে আর ইনি যদি তাদেরই মত সাধারণ হবেন ত কি ক'রে এত লোক, স্ত্রী, পুরুষ সকলের সঙ্গে সমানে অবাধে ব্যবহার রেখে অথচ সাধারণের মত কোন দুঃখ বোধ না ক'রে সকলকে সমান ভালবেসে সদা আনন্দ রক্ষা করতে পারেন? আর এত লোকই বা তাঁর কাছে পাগল হয়ে ছোটে কেন? ভালবাসায় লোককে যত আপন করে এত আর কিছুতে করে না। তোমরা সংসারী, সংসারে এ ভাবও তোমরা দেখতে পাও। যে মেয়েকে বাপ মা প্রাণের তুল্য ভালবেসে, খাইয়ে, পরিয়ে মানুষ করলে, যে মেয়ে বাপ মাকে এত দিন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এলো, সেই আবার বড় হয়ে এক জন পর অচেনা পুরুষকে বিয়ে ক'রে তাকে ভালবেসে বাপ মা সব ভুলে যায়। তিনি সকলকে ভালবাসেন ব'লেই সকলে তাঁর কাছে ছোটে, তা হলেই দেখ দেখি তাঁর ভেতর কত অনন্ত ভালবাসা রয়েছে। সমুদ্রের জলের মত তাঁর ভালবাসার মাপ নেই, তাঁর অনন্ত শক্তিরও মাপ নেই কারণ তাঁর যে রাজার সঙ্গে, সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যোগ রয়েছে। তাঁর কি স্ত্রী, পুরুষ বোধ আছে? মনে কু ভাব থাকলে না, স্ত্রী, পুরুষ জ্ঞান থাকবে। সবই তোমার নিজের মনের ভাবের ওপর নির্ভর করছে। একই বিছানায় স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে শুয়ে রয়েছ, দুই স্ত্রীলোক, অথচ দু জনের সঙ্গে দু রকম একেবারে উল্টো ব্যবহার করছ। আর, এই স্ত্রী ভাব মনে রক্ষা করলেও কি এত গুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই ভাব রক্ষা করার কারুর শক্তি আছে? এক মূহুর্ত্তে সে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এরই নাম সাধারণ ভাব, সাধারণ বিচার। ভেতরে প্রবেশ ক'রে দেখবে না, সামনে ভাসা ভাসা দেখেই সিদ্ধান্ত হয়ে

গেল। একটু ভেতরে প্রবেশ ক'রে দেখলেই, অতি সাধারণের মত ব্যবহার করলেও, তাঁর অসাধারণত্ব কোথায়, তখনই নজর পড়বে। সাধারণের মন এই রকম, কাজেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে গেলে ঠিক তাদের ভাব বজায় রেখে যত চলতে পারা যায়, তত তাদের আপন ক'রে টানা সোজা হয়। কারণ তারা ত তাদের ভাবেই রইল অথচ ওরই মধ্যে একটা ভালবাসা প'ড়ে যেন অলক্ষিতে কোন রকম বুঝতে না পেরে তাঁর কাছে এসে পড়ে। মুনি ঋষিদের বা সাধারণ সাধুদের সঙ্গে এঁর তফাত এইখানে। যারা সংসার অনিত্য জেনে বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে এয়েছে তাদের ত ভগবানের দিকে গতি করবার ইচ্ছে হয়েছে, মনে পিপাসা জেগেছে। তারা এই অবস্থায় পিপাসু হয়ে মুনি, ঋষি বা সাধারণ সাধুর কাছে গেলে তারা তাদের পথ দেখিয়ে গতি করবার সাহায্য করে মাত্র। তাদের মুনি ঋষিদের কাছে যেতে হয়, মুনি, ঋষিরা কখনও তাদের কাছে এসে কাজ করে না। তারা নিজ্জনে নিজের ভাবে ব'সে আছে বরং লোকালয়ের কোলাহল তাদের পক্ষে অসহ্য। কিন্তু এই মহাপুরুষ যিনি লোকশিক্ষার জন্যে এয়েছেন, নিজে উপযাচক হয়ে যেন সকলের দোরে দোরে শান্তি দেবার জন্যে বেড়াচ্ছেন। লোকের পিপাসা পায় নি তবু জল খাওয়াবার জন্যে তিনি সমাজের ভেতরে সকলের ভেতরে এসে বসেছেন ও সাধারণের মনের মত গান বাজনা প্রভৃতি সৎ প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে জোর ক'রে সেই অমৃত বারি খাইয়ে দিচ্ছেন। যে ভগবান চাচ্ছে না, তার সে ভাব ঘুরিয়ে, প্রিয় সব ছাড়িয়ে, ভগবানের দিকে গতি করান কি কম শক্ত? শুধু সৎ কথা, ধর্ম্মালোচনা করলে ত শুষ্ক হবে, দু চারটী ছাড়া বড় কেউ জুটবে না, তাই সাধারণ যা ভালবাসে সেই আনন্দ ছড়িয়ে সকলকে ডেকে জড় করেন। এক বার কোন রকম ক'রে টেনে নিয়ে এসে যে রকমে হোক কিছু সৎ ভাব লাগিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি সকল রসের রসিক। সব রসে যেন ঠিক নিজেকে ঢেলে দিয়ে

তাদেব সঙ্গে মিশবেন আবাব ইচ্ছা হলেই তখনই ছেড়ে বেবিযে চ'লে যাবেন, কোন চিন্তা বাখবেন না। কৃষ্ণ গোপীদেব সঙ্গে একেবাবে মিশে লীলা কবছেন, তাদেব সঙ্গে তাদেব জন্যে কাঁদছেন আবাব যখন দ্বাবকা চলে যান তখন কোন চিন্তা নেই, গোপীবা কেদে ভাসিযে দিযে বথেব চাকাব তলায পড়ছে তবু এক বাব ফিবেও দেখলেন না। এই মহাপুরুষেব ভাব কি সাধাবণ, যে তোমবা সাধাবণ ভাব নিযে তাব ভাব মাপবে বা বিচাব কববে? কাজেই ভুল ক'বে তাঁকে ছোট ক'বে ফেলবে ও অবিশ্বাস আনবে। সব চেযে আশ্চয্য এই, যে, এই মহাপুরুষ সকলকে তাব কাছে ডাকছেন, তাকে দেখেই তাঁব ভালবাসায ও তাঁব কথাব ওপব বিশ্বাস বেখে তাঁব কাছে তোমবা আসছ, এখানে এসে পবস্পবেব সঙ্গে পবিচয হ'ল, আগে তাদেব জানতেও না কিন্তু তাদেবই এক জনেব কথায এমনি বিশ্বাস কবলে যে যাঁকে দেখে, যাব কাছে এসে এব সঙ্গে চেনা হ'ল তাঁকেই ছেঁটে ফেলে দিযে তাঁব ওপব যে টুকু ভক্তি বিশ্বাস ছিল সে টুকু জলাঞ্জলি দিযে তাব কথা শিবোধায্য কবলে এবং তাঁব ওপব অবিশ্বাস আনলে। তখন একবাবও চিন্তা কবলে না, যে শুধু এব কথাতেই বিশ্বাস কবব? নিজেই একবাব দেখি না, সত্য কি না, তাব পব নিজে দেখে যা হয কবব। তা হবে না, যেমন শোনা, অমনি বিশ্বাস, অমনি কার্য্য, বিশেষতঃ ধনীদেব এইটে বেশী স্বভাব, কাবণ তাবা ত বড় চোখে দেখে না, কানে দেখে। সবকাব, লোক জন যা বললে বা বন্ধু বান্ধব যা বললে অমনই ধ্রুব মেনে নিযে কাজ কবলে। সাধাবণেব ভাবই হচ্ছে, স্ত্রীলোকেব সঙ্গে স্ত্রীলোক ভাব ছাড়া ব্যবহাব কবা যায না। তাবা নিজেবা পাবে না ব'লে অন্য ভাব বাখা যে সম্ভব, এ কথা বিশ্বাস কবতে পাবে না এবং চাযও না। তাবা জানে স্ত্রীলোকেব সঙ্গে মিশলে তাদেব যে দুর্দ্দশা হয, সকলেবই এমন কি সাধু, ঋষি ও মহাপুরুষদেবও সেই একই অবস্থা হয। কাজেই তাদেব এই ভাব জোব ক'বে নষ্ট কবতে না গিয়ে তাদেব ভাব বক্ষা করবাব জন্যে

সাধু ও মহাপুরুষকে অনেক সাধারণ বেড় দিয়ে চলতে হয়। সেই জন্যই চৈতন্যদেব স্ত্রীকে কাছে পর্য্যন্ত আসতে দিতেন না। পরমহংসদেব শেষে দক্ষিণেশ্বরে আসতে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু তবু আলাদা বাড়ীতে নহবৎ খানায় রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও, কোন ভক্ত রাত্রে ওঁর কাছে এক দিন ছিলেন। রাত্রে ঘুম না হওয়ায় উনি বাইরে বাগানে বেড়াতে গেছেন এমন সময় তার ঘুম ভাঙ্গায় তার মনে সন্দেহ হওয়ায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখে তিনি দূরে মাঠের ওপর দিয়ে ঘরের দিকে আসছেন। এসে, তাকে দেখে বল্লেন 'কি রে কি দেখছিস? ঠিক করেছিস। সাধুকে দিনেও দেখ্‌বি আবার রাতেও দেখবি'। তা দেখ, সাধারণের মন কত কলুষিত। বিশেষতঃ যদি একটু বয়স কম থাকে ও স্ত্রীকে নিয়ে এক বাড়ীতে থাকে ত আর কথাই নেই। লোকে প্রথমেই দেখবে তিনি স্ত্রীকে কি ভাবে রেখেছেন। বিশেষতঃ মেয়ে ছেলেরা এসে প্রথমেই ত খোঁজ করবে উনি কোথায় শোন, ওর স্ত্রী কোথায় থাকেন? এক বিছানায় বা এক ঘরে শোন কি না? স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন? এই টেই সাধারণের কাছে প্রথম পরীক্ষা এর পর সাধু কি না সাব্যস্ত হবে। কাজেই সাধারণের ভাব বজায় রাখবার জন্যে বিশেষতঃ অল্প বয়সে স্ত্রী থাকলে তার ওপর বেশী কড়া ব্যবহার রাখতে হয়। তার ওপর যদি আবার স্ত্রী সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকে তা হলে ত আরও বেশী কড়া হওয়া দরকার। এতে দুটো কাজ হ'ল। সাধারণ দেখলে যে মহাপুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক হিসাবে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই, আবার স্ত্রীও বুঝলে যে তাকে বিয়ে করা হয়েছে ব'লে তার স্বামীর ওপর কেবল তারই অধিকার, আর কেউ তার স্বামীকে ভালবেসে আসতে পারবে না বা তার স্বামীও তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না, এ ভাবটা চলবে না। তার স্বামী যখন লোকশিক্ষায় রয়েছেন তখন যে একটু ভালবেসে তাঁর কাছে আসবে তাকে ত কোল দেবেনই, তা সে পুরুষ হোক, যুবতী হোক, নষ্টা

হোক যেই হোক একটু ভালবাসা নিয়ে এলেই আশ্রয় পাবে। তা ছাড়া, তিনি অযাচিত ভালবাসা ছড়িয়ে, যে চায় না, তাকেও টেনে এনে কোল দেবেন। তবে বয়স হয়ে গেলে তখন আর তত দোষের হয় না ব'লে অত কড়া না হ'লেও ক্ষতি হয় না। তাঁর কাছে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ব'লে নেই, সবাই তাঁর আপন। তিনি বাইরের ব্যবহার ও সম্বন্ধ দেখেন না, তিনি ভেতরের ভাব গ্রহণ করেন। স্ত্রী পুত্রাদির চেয়ে ভক্ত, এমন কি যার কিছু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, সেও তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। কারণ স্ত্রী পুত্র প্রায়ই স্বার্থ ছাড়া ভালবাসতে পারে না আর যদিও ঠিক ভালবাসে তা হলেও তাতে তাদের বাহাদুরী নেই, তারা সাংসারিক সম্বন্ধ হিসাবে ভালবাসার জিনিষকেই ভালবেসেছে কিন্তু ভক্ত তার ভালবাসার জিনিষ ছেড়ে তার জন্যে অন্য কোন চিন্তা না রেখে ছুটে এসে ভালবাসছে। সাধারণ সংসারী তোমরা কি কাহাকেও ভালবেসে বা প্রলোভন দেখিয়ে তার ভালবাসার প্রিয় জিনিষ ছাড়িয়ে তোমার কাছে আনতে পেরেছ, না দেখেছ, না কখনও শুনেছ ? এ কখনও হয় নি, হতে পারে না, হবেও না। আর এত লোক সব ছেড়ে পাগলের মত তাঁর কাছেই বা ছোটে কেন ? বড় ভালবাসা না পেলে কি নিজের ভালবাসার জিনিষ ছেড়ে ছুটতে পারে ? তা হ'লেই দেখ, মহাপুরুষের ভালবাসার কত শক্তি অথচ তোমরা দেখছ তোমাদেরই মত সাধারণ ভালবাসা। তিনি সকলকেই সমান ভাবে আপন ক'রে ভালবেসে ডাকছেন তবে আধার হিসাবে সেই ভালবাসা বেশী খেলছে ও কাজ করছে। যার যেমন পাত্র তার তেমনি ধরবে, আবার একই পাত্রে যার যত ধাক্কা লাগবে তার জল বেশী ধরবার জায়গা থাকলেও, চলকে প'ড়ে তত কম জল তাতে দাঁড়াবে। সংসারের বাসনা, কামনা ও তজ্জনিত সংশয়ই বেশী জোর ধাক্কা মারে ও বেশী জল চলকে ফেলে দেয়। যার যেমন শক্তি সে ধাক্কায় তত স্থির থাকবে, ধাক্কা তার কিছু করতে পারবে না। তবে সৎ গুরুতে বিশ্বাস রাখলে এই

ধাক্কা গুলো আর তত সহজে লাগতে পাবে না। তখন সেই একই পাত্রে বেশী জল দাঁড়াতে পাবে। তিনি সব ধাক্কা কাটিয়ে দেন এবং আধারও বাড়িয়ে দেন। তাই তোমাদের বার বার বলি অন্ততঃ কিছু সময় সাধু সঙ্গ কর। তোমাদের এত আটকাই কেন জান, তোমরা স্বতঃই বড় দুর্ব্বল, আর ত কিছুই পারবে না, তবু যতটা সৎ সঙ্গে সৎ ভাব নিতে পার সেই টুকু লাভ। এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। তোমরা আমায় কেউ ঢেলে দিচ্ছও না আর আমারও কি জান, ওসব চিন্তা আসে না, জোর ক'রে আনতে গেলেও আসে না। নইলে দেখ না, একটা পয়সা নেই, এমন নেই যে কাল কি খাব, এ অবস্থায় স্ত্রী ও মেয়ের খাবার জন্যেও ত কিছু রাখিনি। তার কি ইচ্ছে তিনিই জানেন। ও সব চিন্তা আনতেই দেন না। বাইরে ত দেখছ বেশ বড় বাড়াতে রয়েছি, বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি, বেশ মোটর চ'ড়ে বেড়াচ্ছি, বেশ গান বাজনা আনন্দ চলছে কাজেই, সাধারণ উল্টো ভাববেই, কিছু অন্যায নয়, কিন্তু কিছুই আমার নয়, সব অপরের, তোমরা ভালবেসে সাজিয়ে রেখেছ, আবার যখন কাশী যাই তখন সব প'ড়ে রইল। এত ভোগের মধ্যে রয়েছি, এত লোক আমার জন্যে কেঁদে ছুটে আসছে তবুও ভোগেও জড়াতে পাচ্ছে না বা এদের কান্নাও দুঃখ দিয়ে আমায় আটকাতে পাচ্ছে না যখন, তখন মনে হয় তাঁর নিশ্চয়ই কোন মঙ্গলের ইচ্ছা আছে। কেন না, এ গুলো যদি মন্দই বল, তা তিনি মন্দ করবেন কেন? তিনি ত মঙ্গল ছাড়া কখন মন্দ করেন না। এই সব দেখে শুনে যা জেনেছি, যে তাঁর যা ইচ্ছে তিনি যখন তাই করবেন, তখন আর চিন্তা করি কেন, প্রাণ খুলে তোমাদের নিয়ে আনন্দ ক'রে কাটিয়ে দিই।

দ্বিজেন গাহিল

ওমা, তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা, শিখিয়ে দে তোর আরাধনা,
তুই আমারে যা শিখাবি সহজ হবে সেই সাধনা।
যেমন বনের জবা আপনি ফুটে, তোর চরণেই পড়ে লুটে,
তেমনি ক'রে অঞ্জলি হোক, আমার প্রাণের সব কামনা।
মন্ত্র আমার নাই মা জানা, জানি না মা সাধন রীতি,
আমি শুধু কেঁদে কেঁদে 'মা' ব'লে যে ডাকি নিতি,
ডাকার মত ডাকলে পরে পাষাণেরও অশ্রু ঝরে,
আমার চেয়ে বেশী বাজে মার বুকে মোর বেদনা॥

—০—

চতুর্থ ভাগ—ষষ্ঠ অধ্যায়

—০—

কলিকাতা, রবিবার ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪০ সাল;
ইং ৮ই আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর ডাঃ সাহেব, তারাপদ, প্রফুল্ল, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, মতি ডাক্তার, ভোলা, ললিত, কালু, জ্ঞান, হরপ্রসন্ন, কেষ্ট, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। গুরুতে বিশ্বাস, এই কথার বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়? তাঁর কথায় বিশ্বাস, না, কার্য্যকলাপে বিশ্বাস, না, তাঁর গুণে বিশ্বাস?

ঠাকুর। গুরুতে বিশ্বাস বললেই তাঁর সবেতেই বিশ্বাস। নইলে শুধু কার্য্যকলাপে বিশ্বাস বা শুধু কথায় বিশ্বাস করলে খণ্ড বিশ্বাস হ'ল। ঠিক বিশ্বাস এলে তাঁকেই বিশ্বাস করবে, তাঁর গুণ বা কাজ

প্রভৃতির দিকে নজর থাকবে না, তাঁর সবই ভাল লাগবে। বিশ্বাস বললে ভগবৎ বিশ্বাসই বোঝায়। বিশ্বাস একটা অবস্থা। বিচার দ্বারা যে বিশ্বাস সেটা জ্ঞান, আর অবিচারে বিশ্বাসের নাম ভক্তি। বিশ্বাস বললেই কিছু লাভের ভাব থাকবে। ভগবানে বিশ্বাস বললে, প্রথমে ভগবান আছেন এই বিশ্বাস করায় তাঁর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলে না হয়, কিন্তু ভগবানকে বিশ্বাস কর কেন? তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ এই সব কারণে বিশ্বাস মানেই হচ্ছে, তিনি বড় ব'লে তাঁর কাছ থেকে কিছু মঙ্গল বা শান্তি পাবার ইচ্ছা লুক্কায়িত রয়েছে। তেমনি, গুরুতে বিশ্বাস মানে কেউ তাঁকে ভগবান ব'লে, কেউ বা গুরু সকলের মঙ্গল করেন এই জন্যে, আবার কেউ বা গুরু যেটা বলেন সেইটাই ঠিক এই ভাবে, আবার কেউ বা গুরু সব ভার নেন ব'লে তাঁকে বিশ্বাস করে। এ সবেরই মূলে সেই চাওয়া ভাব, স্বার্থ ভাব আছে, বিশ্বাস এলেই যে ঠিক ভালবাসা আসে তা নয়, তবে কিছু শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু প্রেম এলে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই থাকে না, ভক্তের বাসনাই হচ্ছে ভগবান। ভক্ত নিজেই ভগবান। তবে ভগবান ইচ্ছা করলে ভক্তকে সংসারে রাখতে পারেন তখন সে ঠিক ধনীর বাড়ীর ম্যানেজারের মত থাকে। ধনী বাইরে গেছে, সংসারে ছেলে মেয়ে প্রভৃতির সব ভার তখন ম্যানেজারের ওপর। হঠাৎ ছেলের অসুখ হওয়ায় ম্যানেজার ডাক্তার ডাকলে, ওষুধ দিলে, ঠিক ধনী থাকলে যে যে চেষ্টা হ'ত তা সব করলে কিন্তু ছেলেটি মারা গেলে ধনীর মত ত দুঃখে অধীর হয়ে কাঁদে না, সাধারণ ভাবে কিছু শোক করে মাত্র। তেমনি, ভক্ত সংসারে থাকলেও কোন বিষয়ে জড়িয়ে থাকে না। গুরুর কাছে বা সাধুর কাছে আসবার সময় কিছু বিশ্বাস থাকে। নইলে, সাধারণ ত বড় বেশী দুঃখের মধ্যে প'ড়ে তাঁর কাছে আসে যখন, তখন কিছু ভক্তি বিশ্বাস না থাকলে টেঁকে থাকবে কি ক'রে? সাধন অবস্থায় ভক্তি বিশ্বাস থাকবেই বরং বিশ্বাসই বেশী

থাকা চাই। তা ভিন্ন ত, গতি করতে পারবে না কারণ বিশ্বাসের জোরে গতি করবে ভক্তি থাকে ভাল, না থাকলেও গতি করবার দিক দিয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় না কিন্তু বিশ্বাস না থাকলে গতি করবার উপায় নেই। যতক্ষণ ভোগ বাসনা ভেতরে থাকবে ততক্ষণ ভগবানকে ডাকবার সময় কিছু মঙ্গল হোক বা দুঃখের নিবৃত্তি হোক একটা না একটা কিছু চাচ্ছ। তবে সৎ এ ভালবাসা লাগলে ভেতরে কিছু কামনা থাকলেও সেটা সৎ এর সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অসৎএ ভালবাসা পড়লে এই কামনা বাড়িয়ে দেবে। সৎ এর স্বভাবই হচ্ছে দোষ আসতে দেয় না বরং অসৎও সৎ এর সঙ্গ করলে ক্রমে ক্রমে তার অসৎ ভাব কাটিয়ে দেবে। তাই কৃষ্ণ সৎ ব'লে গোপীদের মনে কামনা থাকলেও তার কাছে আসায় সেটুকু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুরুষ নারীর মধ্যে অন্ততঃ একজন সৎ হ'লে কোন দোষ আসতে পারে না কারণ সৎ এর কাছে অসৎ এর রিপু গুলো ও কিছু প্রশ্রয় পেল না যে তাদের কার্য্য করবে। মন না পেলে ও তারা কার্য্য করতে পারে না, যেমন, ঘুমুলে মনের সঙ্গে সঙ্গে রিপুদেরও কাজ থাকে না। বিশ্বাস প্রধান হয়ে গেলে যে সে বস্তুতে রাগে উত্তেজনা হ'ত এখন আর তাতে তা হয় না। এই করতে করতে পর বিশ্বাস এলে বা জোর ভালবাসা পড়লে সেই এক ছাড়া আর অন্য দিকে মন থাকে না। এ হ'ল প্রেম। প্রেমে দুটো এক হয়ে যায় তখন নিজের ব'লে আর কিছু থাকে না ও কোন বিষয়ে নজর পড়ে না। ক্ষুধা পেয়েছে, পচা, পান্তা যা পায় তাই আনন্দ চিত্তে খেয়ে যায় কারণ তার ভাব, তিনি যা পাঠিয়েছেন তাই তার কাছে অমৃত, তুমি হয়ত তাকে বিদ্রূপ করতে পার। পূর্ব্বরাগ মানে, না দেখে, অনুরাগ, 'না দেখে, নাম শুনে কাণে প্রাণ গিয়ে তায় লিপ্ত হল।

কৃষ্ণ কিশোর। সংসারে থাকলে কি ক্ষয় বন্ধ করা যায় না? তাতে কি ক্ষতি হয়?

ঠাকুর। সংসারে থাকলে অতিরিক্ত চিন্তা, অতি ভোজন, অতি নিদ্রা, অতি রমন, প্রভৃতির একটা না একটা থাকবেই। এতে বেশী ক্ষয় হয়। তবে যতটা পারবে ওরই মধ্যে মাপ রেখে চলবে। ক্ষয়টা যতদূর পারবে কমিয়ে ফেলবে নইলে শরীর ও মন দুর্ব্বল হয়ে যাবে এবং গুরুতে ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকলেও, ভেতরে সৎ হবার বাসনা থাকলেও, শরীর অপটু ও মন দুর্ব্বল হয় ব'লে কোন কাজ করতে পারবে না, বা সব ভাবও ঠিক ধরতে বা বজায় রাখতে পারবে না। মন কখনও নীচু হতে দিও না তা যত অবস্থাই খারাপ হোক। সর্ব্বদা সৎ পথে গতি করবে, সৎ নীতি পালন করবে এবং সৎ হব মনে মনে এই একটা চেষ্টা রাখবে। পারদ পক্ষে, নিজের সামান্য ক্ষতি স্বীকার ক'রেও, কারুর কোন অপকার ক'রো না, কারুর ওপর কোন অন্যায় ক'রো না। সৎ হলেই সবাই তোমার অধীন হবে, এমন কি রাজা রাজড়ারাও তোমার কথা শুনবে, তোমায় মানবে। তোমরা সংসারী তোমরা ত সাধন ভজন ক'রে গতি করতে পারবে না, তোমরা সৎ সঙ্গ ক'রবে পাঁচটা সৎ নীতি পালন করবে ও গুরুতে বিশ্বাস রেখে ধৈর্য্য ধ'রে চলবে, কারণ সৎগুরুকে ধরলেই যে রাতারাতি শুকদেব বা একটা বড় কিছু হয়ে পড়বে তা ত নয়, তবে তিনি ধ'রে থাকলে আর তুমি পা পিছলে পড়বে না, বিপথে যাবে না। যখনই সব ছেড়ে গিয়ে মূল জিনিষটার ওপর মন জোরে পড়ে তখনই ঠিক ধ্যান হয়।

জিতেন। জন্মোৎসব ইত্যাদি উৎসবের দরকার কি?

ঠাকুর। তোমরা সংসারী তোমরা আত্মবৎ সেবা পছন্দ কর। তাই যাকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে উৎসব করলে নির্ম্মল আনন্দও হ'ল আর তাকে মনে করাও হ'ল। তোমরা বিয়ে পৈতে ইত্যাদি নানা ভাবে উৎসব আনন্দ করছ তার সঙ্গে এও একটা হ'ল, অথচ বিয়ে পৈতেটা মায়ায় বদ্ধতা নিয়ে উৎসব, আর ঠাকুরের পূজা, ঠাকুরের জন্মোৎসব প্রভৃতি মায়া মুক্ত নিয়ে আনন্দ।

তা ছাড়া, অবতার ও মহাপুরুষরা যে যে তিথিতে ধরাধামে এসে সকলের কল্যাণ ক'রে গেছেন সেই দিন তাঁকে প্রতি বৎসর মনে করাই এই সব উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। উৎসব বলতেই রাজসিক, তবে ঠাকুরের পূজা আদিতে কিছু সাত্বিক ভাব মেশান আছে কারণ উদ্দেশ্য সেই মহান বড় জিনিষ।

জিতেন। উৎসবটা খারাপ না লাগলেও তৎ সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনা ভাল না লাগলে উৎসবে যোগ না দেওয়াই ভাল ত? এই গণ্ডগোলের সৃষ্টির চেয়ে গরীব দুঃখীদের এ পয়সা দেওয়া ভাল।

ঠাকুর। তোমরা ত সব শুকদেব নও, সাধারণ সংসারী বিভিন্ন ভাবের এত গুলি লোক এক জায়গায় হলেই কিছু এদিক ওদিক হতেই পারে, তবে বড় একটা কিছু না হলেই হ'ল। কিন্তু উৎসবের মূল উদ্দেশ্যটা সৎ। তুমি সামান্য এই খুঁটি নাটির দিকে চেয়ে বড় জিনিষটাও ছেড়ে দিচ্ছ। তবে তোমার কোন উৎসবই যদি ভাল না লাগে, কোথাও যদি না যাও সে আলাদা কথা নইলে ইচ্ছা মত কোথাও গেলে, কোথাও গেলে না এটা ঠিক নয়। গরীব দুঃখীদের কথা যে বলছ, তা কে কত তাদের দিচ্ছে? ধনীরা জীবন ভোর কত কাঙ্গালী খাওয়াচ্ছে? ওটা কি জান, একটা ছুতো মাত্র। মাঝখান থেকে এ গুলো বন্ধ হবে অথচ কাঙ্গালীরা, গরীবরাও পাবে না। রাজসিক হিসাবে আহারই প্রধান ও সবচেয়ে সুখকর। অর্থের প্রধান সদ্ব্যয় হচ্ছে ভুরি ভোজন। সংসারীদের সদ্বুদ্ধি হচ্ছে অর্থ থাকলে দান, সাধুসেবা, পরোপকার, দরিদ্র সেবা। গরীব দুঃখীদের দান করা বললেই জিনিষটা কেমন একটু ছোট ক'রে ফেলা হ'ল তাই পরমহংসদেব কাঙ্গালী ভোজন কথার বদলে দরিদ্র নারায়ণ সেবা বলতেন। অর্থাৎ আপনার মত ভেবে কাজ কর। সংসারের প্রধান জিনিষ হচ্ছে আনন্দ রক্ষা করা। যে সকল অবস্থায় সর্ব্বদা আনন্দ রক্ষা করতে পারে সেত মহান। যে রকমে পার সর্ব্বদা আনন্দ রাখতে পার ত ভাল কিন্তু তা ত হয় না। সংসারে দুঃখের ঠেলায়

আনন্দ ত রাখতে পারবে না তাই এক একটা উপলক্ষ্য নিয়ে আনন্দ করা। তবে তারই মধ্যে সৎ আনন্দে কিছু সৎ ভাব লাগে, আত্মার উন্নতি হয় এ বড় কম লাভ নয়? তা ভিন্ন সংসারীদের বাজে আনন্দে মন আরও ভোগের দিকে যায় এবং আরও বেশী অশান্তি সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যে বা রসনা তৃপ্তির যে আনন্দ ওটা ক্ষণিক, ওর পরেই দুঃখ। পোলাও, খেয়ে আনন্দ পাও ভাল কিন্তু যদি না পেলেও আনন্দ রক্ষা করতে পার তবেই ঠিক আনন্দ হ'ল, নইলে, ও আনন্দে না পাওয়ার জন্যে যে নিরানন্দ তার বায়না করলে। তাঁর দিকে গতি করার সময় যার তার হাতে খাওয়া উচিত নয়। যার হাতে খাবে তার বৃত্তি গুলো আসবে। সাধারণ স্থূল মনে সেটা ধরতে পার না কিন্তু একটু বড় হ'লে সূক্ষ্ম মনে ধরা যায়। বাহিরে বস্তুর সঙ্গে যতক্ষণ আনন্দ রক্ষা করছ ততক্ষণ বরাবর আনন্দ রাখা যায় না। মনোময় কোষে স্থূল দিয়ে আনন্দ নিচ্ছ ব'লে এ আনন্দ নিত্য হতে পারে না কারণ আকাঙ্খা তখনও রয়েছে কি না। তবে আনন্দময় কোষে গিয়ে মনকে মনোময় কোষে নামিয়ে আনলে বাইরের বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে বাইরের বস্তু নিয়ে নিত্য আনন্দ ভোগ হয় কারণ তখন বাসনা তোমার অধীন, কোন অবস্থাতেই তোমার নিরানন্দ আসতে পারে না, কিন্তু তুমি বাসনার অধীন হ'লে অর্থাৎ মনোময় কোষে নিত্য আনন্দ রক্ষা করা যায় না।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান, যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে। আত্মার একটা তেজ ত্রিগুণে প'ড়ে মন হয়। বাসনায় প'ড়ে যা ইচ্ছে ব্যবহার করে, তাই বিবেক নামে অপর শক্তির দ্বারা শাসন রাখতে হয় অনেক কঠোর ক'রে যা না হয় সঙ্গে অতি সহজে সেটা হতে পারে। তাই পরমহংসদেব বলতেন সৎ গুরুর কাছে যতক্ষণ আছিস ততক্ষণ বর বরযাত্রী, খুব আনন্দ করবি।

তিনি দূরে থাকলে তাঁর আদেশ মত নীতি পালন করা দরকার, যদিও তাঁর শক্তি তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করছে। এই স্থূল দেহ থাকতেই এই দেহকে যখন অন্যত্র নিয়ে গিয়ে কাজ করা যায়, তখন দেহ গেলেও যে কাজ করা যায় তার আশ্চর্য্য কি? দেহ ত মনকে চালাচ্ছে না, মনই দেহকে চালাচ্ছে, কাজেই দেহ গেলেও সে শক্তি ত রইল। যে শক্তিতে সূক্ষ্ম শরীরে কাজ করে সে শক্তি ত সর্ব্বদাই আছে, এ যে অনন্ত শক্তিরই অংশ। দেহ স্থূল, দেহ অর্থাৎ শক্তির আধারটা বদলাতে পারে কিন্তু সেই অনন্ত শক্তি বদলায় না যেমন জল পাত্র কলসী বদলাতে পারে জল বদলায় না। এই শক্তিই মূল, এ থেকে সবের উৎপত্তি। মানুষ যে নতুন নতুন কত আবিষ্কার করছে এ সমস্তই সেই শক্তির পরিচয়, দেখাচ্ছে এই শক্তির সাহায্যে মস্তিষ্ক খাটিয়ে কত রকম কি করা যায়। সাধারণ সংসারীরা ভগবান লাভের জন্যে ত তাঁকে ডাকে না তাঁর কৃপা লাভের জন্যে অর্থাৎ কিছু সংসার সুখ পাবার জন্যে, কিছু দুঃখ নিবৃত্তির জন্যেই তাঁকে ডাকে। তবে সংসার সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তি ঠিক তাঁর কৃপা হ'ল না। তাঁর আসল কৃপা হচ্ছে ভেতরের বাসনা কামনা কমিয়ে দিয়ে, রিপু অধীন ক'রে, এক লক্ষ্য ক'রে তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সাধারণ তোমরা ত সেটা চাও না বরং মায়াঘোরে ওগুলোকে ভগবানের অভিসম্পাত ব'লে বিবেচনা কর, কারণ তোমরা ত সংসার ছাড়তে চাও না, সংসারটা বড় ক'রেছ, সংসার সুখই জীবনের বড় উদ্দেশ্য ধ'রে নিয়েছ। দেহ ধারণ করলে সুখ দুঃখ আসবেই, এ সংসারের ধর্ম্ম। তাই, ভগবানকে এই সংসারীয় কিছু সুখের জন্য ডাকলে তাঁকে ঠিক ডাকা হ'ল না যেমন রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে পাখা টানা চাকরি চেয়ে নিলে রাজার কাছ থেকে ঠিক উপযুক্ত জিনিষ চাওয়া হ'ল না। এই সংসার দুঃখময়, অনিত্য, যত এই বোধ আসবে ততই তাঁর আসল কৃপা হচ্ছে বুঝবে। বেশীর ভাগ লোকই তাঁর কৃপা চায় কিন্তু তার মধ্যেও আবার অতি

অল্প লোক এই আসল কৃপা চাইবে। আর এক আছে, প্রেমে ভগবানকে চাওয়া। তখন সর্ব্বদাই ভগবানের নাম করবে, ধ্যান, জপ করবে এবং মন অন্য দিকে না দিয়ে এক লক্ষ্য হয়ে কেবল তাঁকেই দেবে। সংসারে যে যে জিনিষ দুঃখ দেয় সেই সেই জিনিষ আর তাকে দুঃখ দিতে পারে না কারণ তার কোন বাসনা থাকে না। বাসনাই ত দুঃখ দেয়। সঙ্গে এই গুলো অতি সহজে হয়। অন্ততঃ কিছু সময় সৎ সঙ্গ করলে তাঁর কৃপায় সৎ বুদ্ধি আসবে সৎ সংস্কার লাগবে, সৎ দিকে নিয়ে যাবে। তখন তার দ্বারা আর বড় কুকর্ম্ম হয় না এবং অকর্ম্মও ক'মে সুকর্ম্মের ভাগ বেড়ে যায়। (এই খানে ঠাকুর ব্রাহ্মণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা রাজার চাকর ও এক ঘণ্টা ভগবানের চাকরের গল্প বলিলেন, অমৃতবাণী ১ম ভাগ ১২৩ পৃঃ)

দ্বিজেন গাহিল

ভকত মান বাড়াতে হবি বলির দুয়ারে তুমি দুয়ারী,
দুয়ারীর আমি দুয়ারী আজি, কি দিবে আমায় বল মুরারী।
বিনা বেতনে আমি খাটিনে, বুঝে নেব প্রভু আজি মাহিনে,
ভাল যাবে জানা কি দেহ মাহিনা, অর্থ চাহিনা আমি হে।
চাহি মোক্ষ পদ ঐ রাঙ্গা পদ বিপদে ওপদ অতুল সম্পদ,
তুমি মোর রাজা আমি তব প্রজা, তুমি প্রভু আমি দাস তোমারি॥

চতুর্থ ভাগ—সপ্তম অধ্যায়

* ——

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪০ সাল;
ইং ১০ই আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, তারাপদ, ললিত, কালু, প্রফুল্ল, প্রভু, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, হরপ্রসন্ন, কেষ্ট, মতি ডাক্তার, মস্তান, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, দ্বিজেন সরকার, পঞ্চানন, সুধাময়, শ্যাম, শিবু, ভোলা, দ্বিজেন, ইঞ্জিনিয়ার, অজয়, জ্ঞান, অভয় প্রভৃতি আছে

ভক্তরাজকে দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দ করিলেন।

ডাঃ সাহেব। গুরু আগাছা মেরে দেন, আগাছা কোন গুলো?

ঠাকুর। যে যে জিনিষ দ্বারা বা যে যে সঙ্গ দ্বারা সৎ বাসনা, সৎ বৃত্তি নষ্ট করে সেই গুলো আগাছা। ভেতরে হয় ত সৎ ভাব বেশ রয়েছে অথচ অসৎ সঙ্গে সে গুলো ফুটতে পাচ্ছে না। সৎ সঙ্গে সেই গুলো সব ফুটিয়ে দেবে. হিংসা, দ্বেষ, কামনা, বাসনা সব ক'মে আসবে; কপটতা নষ্ট হবে; সকলকে আপন ক'রে ভাল বাসতে পারবে। ভেতর যত পরিষ্কার হবে তত আনন্দ আসবে, তত শান্তি পাবে।

জিতেন। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম জিনিষটা কি?

ঠাকুর। অপরের ও নিজের আত্মা যাতে আনন্দ পায় সেইটা ধর্ম্ম আর যাতে দুঃখ পায় সেটা অধর্ম্ম। সংসারীদের পক্ষে ধর্ম্ম হচ্ছে সংসার সুখ, তার মধ্যে আবার পরিতোষ পূর্ব্বক আহার প্রধান। লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সংসারীরা ধর্ম্ম হিসাবে করে কিন্তু ওর মূলে কি? অর্থ হবে, সংসারে সুখ হবে। যে যেটাকে বড় ক'রেছে তার কাছে সেইটাই ধর্ম্ম অর্থাৎ সেইটার জন্যেই সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। ধর্ম্ম,

অধর্ম্ম নষ্ট করার জন্যে, অধর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে গেলে আর ধর্ম্মেরও দরকার নেই, দুটোই যাবে। ভগবানকে সাধারণ ডাকে কেন? সংসার সুখের জন্যে, বাসনা মেটাবার জন্যে। এরা ভগবানকে প্রয়োজন ব'লে ডাকে। প্রয়োজন কি জন্যে? না, ভগবানকে ডাকলে দুঃখ যাবে, সুখ আসবে। ভগবানকে সচরাচর বাঞ্ছা কল্পতরু বলে, তার মানে যে যে বাসনা ক'রে তাঁকে ডাকে তিনি তাই পোরান অর্থাৎ ভগবান সুখ বাঞ্ছা কল্পতরু। কেবল সুখের সন্ধান করছে ও চেষ্টা করছে যাতে দুঃখ না আসে। কিন্তু সংসারে তা হবার যো নেই। ভগবানকে ডাক আর না ডাক, সুখ, দুঃখ যেমন আসবার আসবেই, কেউ রোধ করতে পারবে না। কাজেই কেবল সুখের জন্যে ভগবানকে ডাক ব'লে দুঃখ পড়লেই অবিশ্বাস এলো। অথচ ভগবান কিছু চাক্ষুস অনিষ্ট করলেন না। কিন্তু যে প্রয়োজন ব'লে ভগবানকে ডাকে না অর্থাৎ যে ভালবেসে আসে, প্রেমে আসে, সে সুখ, দুঃখ, লাভ, লোকসান খতিয়ে দেখে না। সে ভগবানকে চায়, তা তিনি সুখই দিন বা দুঃখই দিন। এরই নাম অহেতুকী ভালবাসা, যেমন প্রহ্লাদের ছিল, তাই, ভগবান বর দিতে চাইলে প্রহ্লাদ বর নিতে চায় নি, সে ত কিছু চায় না সে ভগবানকেই চায়। একান্ত জোর করায় এই বর চাইলে যেন সর্ব্বদা তোমাকেই পাই। ঠিক ভগবানকে পেতে গেলে সব ত্যাগ করতে হবে তখন দুঃখ এলেও আনন্দে বরণ করতে হবে। দুঃখে ঠিক থাকতে পারলে তবে ত যথার্থ ভালবাসা। আর, বিনা দুঃখে কর্ম্মক্ষয় ত হবে না, তাই অনেক সময়, তাঁকে ঠিক ঠিক ভালবেসে ডাকলে তিনি বেশী দুঃখ দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মক্ষয় করিয়ে দেন। বিনা দুঃখে এ পর্য্যন্ত কেউ অবস্থা লাভ করেন নি। যে দুঃখে অভিভূত না হয় সেই তাঁর দিকে গতি করতে পারে। কিন্তু দুঃখে না পড়লে দুঃখে অভিভূত হয় কি না জানা যাবে কি ক'রে?

মতি ডাক্তার। মঠে কারুর প্রতি অত্যাচার করাটাও তা হলে অধর্ম্ম ত, কারণ তাতে তাঁর আত্মা দুঃখ পায়।

ঠাকুর। আগে দেখ, আত্মা ঠিক দুঃখ পায় কি না। যেটাকে অত্যাচার বলছ সেটাতে বাস্তবিক দুঃখ পাও কি না? তোমার মান অভিমান আছে, কোন কোন কথায় মান অভিমানে আঘাত লাগে ব'লেই তারা আনন্দ ক'রে তোমায় সে গুলো বলে। প্রথম, মঠ মান অভিমান ভাঙ্গবার জায়গা, দ্বিতীয়, এতে তোমার মূলে কোন ক্ষতি হ'ল না। তবে হ্যাঁ, তোমার কাজের জায়গায় তোমার অধীনস্থ লোকের সামনে সে গুলো করা ঠিক নয়। তবে হিংসা বা ক্ষতি জনক আনন্দ, যাতে বাস্তবিক প্রাণে দুঃখ পাও ও যথার্থ ক্ষতি হয় সে সব করা উচিত নয়। সর্ব্বদা ভগবানের নামে আনন্দ রাখতে পার না ব'লেই এ রকম নির্ম্মল আনন্দ তত দোষের নয়। অতি আনন্দে সব ভুল হয়ে যায়, তখন কি হবে, না হবে সব কিছুই মনে থাকে না। ভুল হওয়াটাই আনন্দের লক্ষণ।

পুত্র। বাইবেলে যত পড়া যায় সমস্ত অমৃতবাণীর সঙ্গে ও কথামৃতের সঙ্গে পরিষ্কার মেলে, তফাৎ নেই

ঠাকুর। মন ত এক। মন রাজ্যে গেলে, মনে ধরলে একই ত হবে আলাদা ত হতে পারবে না। এ অনুভূতির জিনিষ, যে যে অনুভূতি করতে পেরেছে তারাই ঠিক খবর বলতে পারবে। একই জায়গার অনুভূতিতে একই ভাব, একই খবর বলবে কাজেই তফাৎ হবে কেন? যেমন, যে যে স্বপ্ন দেখেছে তারা স্বপ্নের ধারা সম্বন্ধে যা যা বলবে সবই এক, তবে স্বপ্নের বিষয় আলাদা হতে পারে, কিন্তু যে স্বপ্ন দেখেনি শুনে বা প'ড়ে বলছে তার সঙ্গে তফাৎ হ'বে। আর দেখবে, অনুভূতির জিনিষ সব সরল ভাষায় বলা আছে। ভাষা যত সহজ ও সরল হবে, তত বুঝতে হবে যে প্রাণের ভেতর থেকে অনুভূতির পর বলছে। পরমহংসদেব যে সব কথা ব'লে গেছেন সবই বেদ বেদান্তে আছে, তিনি ত বেদ বেদান্ত ছাড়া কিছু বলেন নি, অথচ তিনি প্রাণের ভেতর থেকে এত সহজ ভাষায় সব ব'লে গেছেন যে যারা শুনেছে তারা মুগ্ধ হয়ে গেছে এবং যারা কথামৃত

পড়েছে তাদের সকলেরই এত ভাল লেগেছে। ভাবের লক্ষণ হচ্ছে নিজে সবল এবং যার ভাব আসে তাকেও সবল ক'রে দেয়। সাধারণ পণ্ডিতরা বেদ বেদান্তের টীকা করতেই ব্যস্ত। কে কোথায় কি ব্যাখ্যা করেছে সেই সব দিয়ে নিজের ব্যাখ্যা দিয়ে পাণ্ডিত্য ফলাতে যায় কিন্তু আসল জিনিষ উপলব্ধি কারুরই হয় নি ত, কাজেই নিজেরা যা বোঝে না অপরকে ঠিক বোঝাতেও পারে না শুধু ভাষার পারিপাট্য ইত্যাদি দেখিয়ে যায়। এমন কিছু টীকা করতে পেরেছ কি? যাতে সাধারণ লোক যে শুনবে সেই পাগল হয়ে যাবে? তবেই ঠিক টীকা হ'ল নইলে মানের বই হিসাবে ত অনেক আছে।

জিতেন। অনবরত এই যে সব বাসনার পর বাসনা আসছে, এত সব আসছে কোথেকে?

ঠাকুর। সংসার বাসনারই রাজত্ব। পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী বাসনা আসছে। মন সেই ভাবেই তৈরী হয়েছে এবং সেই ভাব নিয়েই তুমি এসেছ। এই সৃষ্টিই হচ্ছে বাসনা। তবে দুই আছে, জীব আর শিব, জীবের বাসনা বদ্ধতাময়, জীব সেই বাসনায় বদ্ধ কিন্তু শিবের বাসনা শিবকে বাঁধতে পারে না, নিজে বাসনার ভেতর থাকলেও বাসনা বদ্ধ করতে পারে না। যেমন সাপের মুখে বিষ, অপরকে কামড়ালে ম'রে যায় কিন্তু নিজে যখন খায় মরে না। এই জীবই যখন ঠিক বুঝতে পারবে যে সংসার মায়াময় তখন সে সেই মায়া পাশ কাটাতে চেষ্টা করবে এবং মায়া কাটিয়ে শিব হবে। যেমন, অয়েল ক্লথে জল ধরে না কিন্তু উপরের তেলা কলাইটা চ'টে গেলেই জল ধরবে। শিব যে নিজে নিজেই নিজের মায়ায় প'ড়ে এত গুলো হয়ে সেই মায়ার ঠেলাতেই কাঁদছে এ কথা শুনতে পার, বলতে পার, কিন্তু সে অবস্থা না এলে ত উপলব্ধি করতে পারবে না। তিনিই সৃষ্টির গোড়া, তখন তাঁর শক্তি বেশী, তখন তিনি মায়ায় বশীভূত হন না। কিন্তু যেই শক্তি কম ক'রে জীব ক'রে দিলেন অমনি মায়া এসে তাকে জড়িয়ে ফেল্লে। তিনি এক, বহু হয়ে খেলছেন এ

ভাব বড় কঠিন, এ কি সহজে বুঝতে পার? তাই তোমরা তাঁকে মহান শক্তিশালী বড় ধ'রে নিয়ে নিজেরা ক্ষুদ্র জীব মায়ায় বদ্ধ ভেবে তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করছ। এই ভাবে গতি করতে করতে যেমন যেমন জ্ঞানের উদয় হবে তত মায়া কাটবে এবং শেষে তিনি ও আমি এক, এই বোধ ঠিক আসবে ও স্থির হয়ে যাবে। তা ভিন্ন, চট্ ক'রে কি, এক, এই বোধ আসে, না ভাবতে পার? রাজা স্বর্ণ সিংহাসনে ব'সে আছেন, চতুর্ধারে মন্ত্রী, সভাসদ সব রয়েছে, লোক, জন, দরোয়ান সব রয়েছে, আর আমি ভিখারী কিছু পাবার আশায় রাজার কাছে যেতে চাচ্ছি, দোরে দরোয়ানের কত ধাক্কা খাচ্ছি এ অবস্থায় আমি কি কখনও ভাবতে পারি যে আমি আর সেই রাজা এক? আমার দরকার, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। যতক্ষণ প্রয়োজন বোধ আছে ততক্ষণ কাঙ্গালী ভাবে বা সন্তান ভাবে বা দাস্য ভাবে, যার যে ভাব ভাল লাগে সেই ভাবে তার কাছে যায়। কিন্তু প্রেম এলে আর প্রয়োজন বোধ থাকে না। চিরকালই এই কয় ভাবে মানুষ তাঁর দিকে গতি করে। তবে আধুনিক হিসাবে হয় ত এই সব ভাবের চাল চলন কিছু তফাত হয়ে গেছে। শোক চিরকালই আছে, আগে হয় ত শোক হ'লে চিৎকার ক'রে কাঁদত, আজকাল না হয় মুখে রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদে। শোকের মাত্রা ঠিকই আছে। ভক্তির কাজ, ভাবের কাজ চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকবে তবে ঐ যে বল্লুম, হয়ত রকম ফের হয়ে গেছে। তবে পূর্ব্বে জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তির ভাব অনেকের ছিল এবং প্রেমের ভাবও এখনকার চেয়ে বেশী ছিল। সেই জন্যেই তখনকার শাস্ত্র সব, ঐ সব পথের কথা বড় ক'রে ব'লে গেছে। যখন যে ভাব বেশী প্রচলিত তখনকার শাস্ত্র গ্রন্থে, তখনকার আমোদ প্রমোদে সেই ভাবই বেশী ফোটান থাকে। তবে সংসার সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে গতি করবার সময় কাঙ্গালী ভাবে যাওয়াই ভাল। বিশ্বাস মানেই অন্ধ, আগে বিশ্বাস কিছু আসা চাই তবে ত গতি

করতে পারবে, নইলে ত যাবেই না। প্রত্যক্ষ হ'লে ত জ্ঞান হ'ল। বিচার শূন্য অবস্থা হ'লে বিশ্বাস। যার যে পরিমাণ বিশ্বাস আছে ও যত প্রয়োজন বোধ হবে, সে সেই পরিমাণ দৃঢ়তা নিয়ে তাঁর দিকে গতি করবে। শুনেছে ভগবানকে ডাকলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। দুঃখের নিবৃত্তির প্রয়োজন আছে অথচ ভগবানকে ডাকলে যে দুঃখ যায় এ বিশ্বাস যার নেই, সে তাঁর দিকে যায় না, আবার ভগবান ব'লে একজন আছেন এ বিশ্বাস আছে কিন্তু তাঁকে প্রয়োজন নেই ব'লে তাঁর দিকে যায় না। তবে বিশ্বাস আছে এবং প্রয়োজনও আছে, এমন হ'লে তবে ত তাঁর দিকে যাবে। তোমরা রূপ, রস, গন্ধে, ভালবাসাতে অভ্যস্ত ব'লে কারুর সাধুকে দেখে ভালবাসা পড়ে, কারুর বা তার কথা শুনে ভালবাসা পড়ে, তা যে ভাবেই পড়ুক ভালবাসা পড়লেই কাজ হবে। সেই জন্যে সঙ্গকে এত বড় করেছে কারণ সঙ্গে ভালবাসা যত সহজে পড়ে তত আর কিছুতে পড়ে না। কথায় কথায় ঠাকুর বাহিরে যাবার কথা তুলিয়া বলিলেন এমন একটা কাউকে দেখছিনি যাকে একলা নিয়ে আমি বাইরে যেতে পারি, অর্থাৎ যে সব সময় আমার ভাবে চলতে পারবে। একলা আমার সঙ্গে থাকতে হ'লে কটা জিনিষ তার থাকা চাইই।

১। বাড়ীর বা কারুর ভাবনা চিন্তা থাকবে না। কারুর চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হবে না আবার কাউকে চিঠি দেবার জন্য আগ্রহ থাকবে না।

২। খুব কঠোরী, নীতিবান ও চরিত্রবান হওয়া দরকার। আমার ওপর তার স্থির বিশ্বাস থাকা চাই অর্থাৎ আমার সব ভাব তার ভাল লাগা চাই।

৩। খুব ধৈর্য্য থাকা চাই, মান অভিমান শূন্য হওয়া চাই এবং আমি যেমন বলব সেই মত চলতে পারা চাই অর্থাৎ আমার আদেশ ভিন্ন কোন কাজ করা উচিত নয়, এই ভাব ঠিক থাকা চাই।

জিতেন। বিশ্বাস না থাকলে কি গতি করা যায় না?

ঠাকুর। বিশ্বাস রক্ষা করাই প্রধান জিনিষ। সাধন ভজন করতে গেলেও বিশ্বাস আগে চাই, কারণ গুরু যেটা যেটা ব'লে দেবেন সেই মতে চলতে হবে ত। তা মানুষটার ওপর বিশ্বাস না থাকলে কি তার কথায় বিশ্বাস হতে পারে? তোমরা, সংসারীরা ত কামনা বাসনা ছাড়া বড় তাঁকে ডাক না, তা সেই কামনা বাসনা নিয়ে ঠিক ভাবে তাঁকে ডাকলে অর্থাৎ ব্যবসাদারী না ক'রে ঠিক ভাল বেসে তাঁকে ডাকলেও তিনি মঙ্গল করেন। তাঁর কাছে এসেছি, তাঁকে ডাকছি, নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে অন্ততঃ এই বিশ্বাসটাও ঠিক থাকা চাই। গিরিশ ঘোষ বলেছিল যতক্ষণ ক্ষিদে আছে ততক্ষণ মাকে জানাব না ত কি রাস্তার লোককে জানাব? চৈতন্যদেব বলতেন যারা সংসারের জন্যেও তাঁকে ডাকে তারাও ধন্য। এ ডাকা শুধু স্বার্থের জন্যে ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে হ'লে হবে না, যেমন ছেলের অসুখে মা খুব ডাকছে কিন্তু যেই ছেলে ভাল হয়ে গেল আর ও দিকও মাড়ায় না। এখানে তাঁকে ভাল ত বাসেই না, ঠিক তাঁকেও ডাকে না। তাঁর অসুখ সারাবার শক্তিটাকে ডাকে, তাই অসুখ সেরে গেলে আর ডাকে না কারণ তখন ত আর প্রয়োজন নেই। যদি ঠিক তাঁকে ডাকে তা হ'লে আর কিছুতেই ছাড়ে না, ছেলে ম'রে গেলেও অবিশ্বাস আসে না। ছেলে মাকে ভালবাসে, মা যতই মারুক, বকুক তবু সেই মার কাছেই প'ড়ে আছে ছাড়বে না। বায়না ক'রে মার কাছে পয়সা চাচ্ছে, মার হয়ত পয়সা নেই, পয়সা দিলে না, এমন কি জ্বালাতন করছে ব'লে ঘা কতক মারও হয়ত দিলে কিন্তু ছেলের বিশ্বাস যে মার কাছে পয়সা আছে, মা দিচ্ছে না, তাই কেঁদে কেটে যে রকমে হোক আদায় ক'রে তবে ছাড়ে। ভালবাসায় বিচার থাকে না। যার ওপর যত ভালবাসা পড়বে তার ওপর তত বিচার ক'মে আসবে। বিচার আবার দুই প্রকার, প্রতিপক্ষ বিচারে আমিত্ব বুদ্ধি বড় থাকে না, আমি কি বুঝি, তিনি যা করাচ্ছেন বা বলছেন আমার মঙ্গলের জন্যেই, এতে

অবিশ্বাস আসতে দেয় না, এবং সংশয় নষ্ট করে। বিপক্ষ বিচারে, সংশয় আরও বাড়িয়ে দেয়, তখন এটা হয় ত উনি ঠিক বলছেন না, ওটা ত পুবা মাত্রায় অন্যায় ইত্যাদি ভাব উঠে বিশ্বাস কমিয়ে দেয়। বিশ্বাসই প্রধান জিনিষ। যার বিশ্বাস নেই তার ত কিছুই নেই, সে ত সব শূন্য, মরা ব্যক্তির সামিল। যেমন তরকারিতে যত মশলা ও ভাল ভাল জিনিষ দাও না, কেন, নুন না দিলে সব মাটী, তেমনি যাব বিশ্বাস নেই তাব ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হয় না। সে যাই করুক তার কিছুই দাঁড়ায় না। বিশ্বাস একটা অবস্থা, সে অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত সাধকের এই ভাব থাকা চাই যে যেমন ক'রে হোক অবিশ্বাস এলেই নষ্ট করতে হবে। কারুর কথা শুনে অবিশ্বাস আসতে দিতে নেই। যার সঙ্গে কখনও জানা ছিল না, যাকে কখনও আগে দেখনি, আমার কাছে এসেই চেনা পরিচয় হ'ল, আর তার কথাতেই বিশ্বাস ক'রে নিজে না দেখে আমার ওপর অবিশ্বাস এলে বুঝতে হবে তুমি কত দুর্ব্বল। তোমার সাধাবণ এ বোধ টুকুও নেই যে আচ্ছা, ও যাই বলুক, নিজেব বাস্তবিক কিছু ক্ষতি হচ্ছে কি না? তুমি যদি দেখ যে তুমি ত বেশ আনন্দ পাচ্ছ তা হলে ওর কথায় ছাড় কেন? তুমি যদি নিজে এ টুকু বিচার না ক'রে দেখ, ত তুমি তার চেয়েও অপদার্থ ও দুর্ব্বল, কারণ সে তার নিজেব ভাবে বললে আর তুমি সেই শুনে তোমার নিজেব ভাবকেও নষ্ট ক'বে চলতে চাচ্ছ। সাধারণ সংসারীর ভালবাসা পুরো ব্যবসাদারী, কেবল স্বার্থ খুঁজবে, নিজের একটুও লোকসান করতে পাববে না বা কিছু ছাড়বে না। এ হ'ল ভোগের ভালবাসা। ত্যাগের ভালবাসা এলে ত্যাগ কবতে পারবে, এত লাভ লোকসান খতাবে না। তখনও মায়া আছে তবে সব গুলোর ওপর থেকে ছেড়ে একটায় পড়ে। তা ছাড়া, ঠিক ভালবাসা কখনও দুটোর ওপর পড়তে পারে না। কেউ যদি বলে দু'জনকে জোর ভালবাসি তা হলে হয় সে ভালবাসা কি জিনিষ জানে না, নয় সে মিথ্যা কথা

বলছে। তবে সংসারীদের অপর জিনিষের ওপর ভালবাসা থাকলে, সৎ এ কিছু মায়া ও ভালবাসা পড়লে সৎ এর প্রভাবে ক্রমশঃ এ দিকটা বাড়িয়ে দেবে এবং তখন সংসার বাসনা কামনা আপনা আপনি ক'মে আসবে। তখন নিজেই বুঝবে কোনটার ওপর ভালবাসা বড়। আগে ত, কিছু শ্রদ্ধা নিয়ে সৎগুরুর কাছে আসে, তখন বড়, ভালবাসা থাকে না, সংসারের দায়ে, সৎ সঙ্গ করলে সংসারের মঙ্গল হবে এই ভেবে ক্লাবে যাওয়া, থিয়েটারে যাওয়ার মত খানিকটা সৎ সঙ্গ করে। যখন ভালবাসা পড়বে তখন আর না এলে থাকতে পারবে না। তবে এই ভালবাসা পড়বার আগেই অবিশ্বাস এসে ভাবটা নষ্ট ক'রে দেয়। তাই, অবিশ্বাস এলেও সঙ্গ ছাড়তে নেই, তা হলে যেটুকু সংশয় উঠবে সেটুকু শীঘ্র নষ্ট হয়ে যাবে, নইলে সংশয় বেড়ে একেবারে ছাড়িয়ে দেবে। অবশ্য ছাড়িয়ে আর নিয়ে যাবে কোথায়? একটু বিশ্বাস ও একটু শ্রদ্ধা থাকলেই তাকে আবার ফিরে আসতেই হবে, তবে না হয়, ঘুরে আসার জন্যে কিছু বিলম্ব হবে। তা ভিন্ন ত একেবারে অন্ধ হয়ে আছে। যত ক্ষণ না ভালবাসা পড়ে তত ক্ষণ সকল সময় সঙ্গ করতে নেই তাঁর উপদেশ মত যেমন যেমন ব'লে দেবেন সেই ভাবে সঙ্গ করা উচিত। কারণ তাঁর সব ভাব তখন ভাল লাগবে না। সংশয় সত্ত্বেও যখন আসে, তখন বুঝতে হবে কিছু ভালবাসা আছে। ঠিক ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকলে মঙ্গল হবেই, অপকার হতে পারে না। বিশ্বাস থাকলে যে ভালবাসা আছে, তা সব সময় নয়, বিশ্বাস ভালবাসা আনিয়ে দেয়। ঠিক ভালবাসা এলে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ওঠে না, কারণ তুমি ত তখন লাভ লোকসান খোঁজ না, কেবল তাঁকেই চাও, তাঁর রূপ বা তাঁর ঐশ্বর্য্য কিছুই দেখ না। প্রেমটা হ'ল ফল, প্রেম এলে ত সব ছেড়ে গেল। একজন ছোট ছেলে ঠাকুরের সম্পর্কে ভাইপো হয় সব ছেড়ে এদিকে আসতে চায়। তাকে ঠাকুর বলছেন, "বেশ ক'রে ভেবে দেখে তবে আসবে। এমনি জ্যেঠা মশাই ভেবে এসে থাক ত, ও ভাব ভুলে যাও। আমার আত্মীয় স্বজন বলতে

সাধারণ যা বোঝায়, তা কেউ নেই। তবে এসেছ, দু চার দিন যেমন অনেকেই এসে থাকে, সেই ভাবে থেকে চ'লে যেও, আর যদি মনের উন্নতি করবার জন্যে আমার কাছে এসে থাক ত, আমিত্ব একেবারে নষ্ট করতে হবে। আমি যখন যে অবস্থায় যা বলব তখনই অবিচারে তা শুনতে হবে। তাতে তোমার যাই হোক, এমন কি দুনিয়া বেঁকে বসলেও করতে হবে। যে রকম কষ্ট করতে বলব, সব হাঁসি মুখে সহ্য করতে হবে অর্থাৎ মনে মনেও দুঃখ করতে পারবে না, তাই ত আমায় এত খাটিয়ে নিচ্ছেন বা আমায় দিয়ে এই ছোট অপমানসূচক কাজ করাচ্ছেন। সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করতে হবে। ভাল কথা, যা তোমার যে টুকু দরকার, আমি তোমায় ঠিক সেই ভাবে ব'লে দেবো, সে জন্যে আবার অপর জায়গায় যাবে কেন? আগে যেটুকু পেয়েছ সেইটে ঠিক হজম কর তখন আবার বেশী পাবে। হালুয়া করতে যদি এক পো চিনি দরকার হয় তখন আধ সের চিনি দিলে কি হালুয়া আরও বেশী ভাল হয়? সব জিনিষ মাপ অনুযায়ী করতে হবে। তোমার যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশী দিলে সহ্য করতে পারবে কেন? সে শক্তি কই? আর স্ত্রীলোকের সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করতে হবে, স্ত্রীলোক যত ভাল কথাই বলুক তার কথা শোনবার জন্যেও তার কাছে যাওয়া উচিত নয়, কারণ বাসনা ত জয় করতে পার নি সব ভেতরে পুরে নিয়ে জয় কববার চেষ্টা করতে এসেছ। রিপু এখনও অধীন হয় নি, তাই, যে যে জিনিষে ওসবের উদ্দীপনা হয় তা থেকে তফাৎ থাকতে হবে"।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

সঙ্গই প্রধান। এই সংসার দুঃখময়, দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার পাবার প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ। সদ গুরুর কাজ হচ্ছে সংশয় ভঞ্জন করান। সদগুরুর সঙ্গ ক'রতে ক'রতে সংশয় এলেও সঙ্গের প্রভাবে

সেটা চট্ ক'রে কেটে যায়। ত্যাগ মানেই হচ্ছে বাসনা নিবৃত্তি, কোন জিনিষের আকাঙ্খা থাকে না, এমন কি পেলেও তার জন্যে কোন আকাঙ্খা হয় না। হেতুরেকে ফলাভাব। তোমরা সংসারী অনেক সময় শুনে মেনে ত্যাগ করতে পারবে ভাব কিন্তু ত্যাগ মানে কাপড় ত্যাগ, জামা ত্যাগ নয়, আসল ত্যাগ অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ নেহাত সোজা নয়। তোমাদের পক্ষে ভালবাসাই প্রধান।

দ্বিজেন গাহিল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলা পতি,
ওহে ভক্তি প্রিয় আমার ভক্তি হবে সেই রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী,
এই দেহ হবে নন্দের পুরি, স্নেহ হবে মা যশোমতি।
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, আমার কর্ম্মভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী মন ধেনুকে বশ করি,
(একবার তেমনি ক'রে বাজাও বাঁশী, যেমন ব্রজে বাজিয়েছিলে)।
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে পুরাও, ইষ্ট এই মিনতি।
আমার প্রেম রূপ যমুনা কূলে আশা বংশী বট মূলে,
(একবার তেমনি ক'রে দাঁড়াও দেখি,
একবার যুগল রূপে দাঁড়াও দেখি),
স্বদাস ভেবে সদয় হয়ে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী থাকি ব্রজধামে
এই জ্ঞান হীন রাখাল, তোমার দাস হবে গো দাশরথী॥

চতুর্থভাগ—অষ্টম অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার—২৮শে শ্রাবণ ১৩৪০ সাল
ইং ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৩

সকালে কালীঘাট থেকে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে দ্বিজেন, জিতেন, প্রফুল্ল, শ্যাম, তারাপদ, ভগবান, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, দ্বিজেন সরকার, মৃত্যুন, মতি ডাক্তার, জিতেন (শ্রীরামপুর), ভোলা ও অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। মঠে কেউ বা খেতে আসে, কেউ বা গান শুনতে আসে, কেউ বা আড্ডা মারতে আসে। এদের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে এবং এরা এমন ভাবে চলছে যে নিজের ভাব ঠিক রেখে মন স্থির ক'রে সাধু সঙ্গ করা যায় না। অমৃতবাণীতেও অনেক বাজে কথা লেখা আছে; অনেককে আপনি কত ভাল ব'লে সুখ্যাতি করেছেন কিন্তু তাদের কারুরই কিছুই অবস্থা হয় নি, প্রায় সকলেই ত ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে রয়েছে। কাম ক্রোধই বা কার গেছে? এমন কি ডাক্তার সাহেবকেও এক দিন পরীক্ষা করতে গিয়ে যেই অমৃতবাণীর একটু নিন্দে করেছি অমনি চ'টে আগুন। অথচ কথামৃতে পরমহংসদেব নরেন্দ্র প্রভৃতি যাদের ভাল ব'লে গেছেন তাদের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত হয়েছে।

ঠাকুর। মঠে যারাই আসবে তাদেরই যে সব এক ভাব হবে বা সবাই ঠিক উন্নতি করবার জন্যেই আসছে তা ত নয়। তবে বাজে গল্পে, বাজে কাজে সময় নষ্ট না ক'রে, যে, এই টুকু সৎ স্থানে এসে বসে এও ভাল। এরা ত সব সময় সেই এক চিন্তায় থাকতে পারবে না তাই পরস্পর নির্ম্মল আনন্দ ক'রে সময় কাটায়, তবে এই আনন্দ করতে গিয়ে কারুর প্রাণে বাস্তবিক ব্যথা দেওয়া বা কারুর

যথার্থ ক্ষতি করা বা কারুর ভাব নষ্ট করা ঠিক নয়। সেই জন্যেই আনন্দ করতে গিয়ে, যে যেটা সহ্য করতে পারে না, তার সঙ্গে সেটা করা ঠিক নয়। যে যত টুকু সহ্য করতে পারবে তার সঙ্গে তত টুকুই ব্যবহার রাখা উচিত। তার দিক দিয়েও আবার থাকা দরকার, যে, সে যখন সহ্য করতে পারে না তখন সে সব প্রকৃতির সঙ্গে মেশা উচিত নয়, নিজের ভাব মত কাজ ক'রে যেতে হয়। পরমহংসদেব, যীশাশ সবাই বলেছেন 'আমার কাছে যত ক্ষণ থাকবি বর বরযাত্রি ভাববি, খুব আনন্দ করবি'। তার মানেই হচ্ছে, সংসারী ত এক ভাবে সৎ চিন্তায় বেশী ক্ষণ থাকতে পারবে না, তাই আনন্দ করাই যখন অভ্যাস, তখন বাজে আনন্দ না ক'রে সৎ স্থানে নিজেদের মধ্যে খানিকটা সৎ আনন্দ ক'রে নেয়। অমৃতবাণীতে কি কারুর সম্বন্ধে লেখা আছে, যে, এ বেশ আধ্যাত্মিক উন্নতি করেছে অর্থাৎ এর বাসনা অধীন হয়েছে? আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার লক্ষণই হচ্ছে বাসনা অধীন হওয়া, তা হ'লে তুমি বলতে পারতে বটে। তারা সৎ, আমায় ভালবেসেছে এই সব লেখা আছে, তাদের ভাব আমি বুঝব তুমি ত বুঝতে পারবে না। তারা যেটা বাস্তবিক করেছে সে কথা আমি বলব না? যেটা খেতে ভাল লেগেছে, স্ত্রী, পুত্রকে না দিয়ে আমায় এনে খাইয়েছে, আমার জন্য কত করেছে সে কি ভোলবার জিনিস? আমার ত সেই গুণ গুলোই ধরা কাজ, মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ থাকবে, কেউ ত ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব নয়, যে দোষ থাকবে না। আমার কাজ হচ্ছে, যার যে যে গুণ আছে সেই গুলি সব গ্রহণ করা, আর যার যে যে দোষ আছে সে গুলি নষ্ট ক'রে দেওয়া। যে যতই মন্দ হোক, আমার সঙ্গে যতই খারাপ ব্যবহার করুক, তা সত্ত্বেও সে যদি এক দিনও আমাকে একটুও ভালবেসে থাকে আমি তার সেই টুকুই নোব, আর কিছু দেখব না, কারণ আমি ত জানছি তাদের প্রকৃতি সেই রকম, তাদের দোষ কি? যত ক্ষণ না প্রকৃতি বদলায় তত ক্ষণ প্রকৃতির স্বভাব ছাড়বে কেন? রৌদ্রে

মেঝে গরম হয়ে পা দিলে পুড়ে যায় ব'লে কি মেঝের দোষ দেওয়া উচিত ? এ রৌদ্রের স্বভাব, যেখানে পড়বে গরম হবে। যত ক্ষণ না, কামনা বাসনা অধীন হচ্ছে তত ক্ষণ সংসারীর ভালবাসা পারার মত, কোন্ দিন কখন কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই। আজ খুব বিশ্বাস খুব ভালবাসা, আবার কাল হয় ত, সংশয় এসে ভালবাসা কিছু কমিয়ে দিলে, তারপর আবার অবিশ্বাস এসে ভালবাসা হয় ত একেবারেই কমিয়ে দিলে। তাই ব'লে যে তাদের পূর্ব্বের ভালবাসার কোন দাম নেই, তা ত নয়। তার প্রকৃতিতে এই রকম করাচ্ছে, সে কি করবে, তার দোষ কি ? আবার, কিছু দিন পরেই তার হয় ত বিশ্বাস ফিরে আসবে এবং আবার পূর্ব্বের মত, কি তার চেয়ে বেশী ভালবাসবে, তখন কি মাঝে এই ক'দিনের অবিশ্বাসের জন্যে সে ভালবাসার দাম ক'মে যাবে ? এ ত কথা নয়। তোমরা সংসারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে দোষ দেখা। দোষটীকেই বড় ক'রে ধ'রে নিয়ে একটা ধারণা ক'রে রাখলে, যে, এর যখন এই দোষ রয়েছে তখন এ আর ভাল হতেই পারে না। কিন্তু সাধুদের স্বভাব তা নয়, তারা গুণ টুকু নিয়ে তার আদর করবে এবং তাকে ভালবেসে আপন ক'রে নিয়ে তার দোষ গুলি মেরে দেবে। তা ছাড়া, তোমরা সংসারী, তোমরা যে সব স্বার্থ শূন্য, কিছু আশা রাখ না, তা ত নয়। তোমরা যে আমায় ভালবাস, এটা আমি গ্রহণ করব, এ টুকু অন্ততঃ চাও। তা হলেই, আমি যদি নিন্দে করি তখন তোমাদের প্রাণে বড় লাগবে। তোমরাই তখন ভাববে, এত ক'রে ঠাকুরকে ভালবাসি তবু ঠাকুর ভাল বলেন না, নিন্দে করেন। দূর ছাই, আর এখানে এসে কি হবে ? সংসারীর মন, এ ভাব আসতেই হবে। এখানে জিতেন প্রতিবাদ ক'রে বল্লে 'না, ঠাকুর, আমি মন ঠিক রেখেছি আপনি নিন্দে ক'রে দেখুন আমি পালাব না'। তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে স্নেহ মাখা কথায় ধীরে ধীরে বললেন 'না, হে জিতেন তা নয়; এতটা সোজা নয় হে। মনে ধাক্কা লাগতেই হবে, মন একটু খারাপ হতেই হবে'। কথামৃতে নরেন্দ্র প্রভৃতি যে কয়জনের কথা বললে তারা যে সব ছেড়ে, সংসার ত্যাগ ক'রে,

পরমহংসদেবের কাছে গেছল, তাদের কথা আলাদা। তারা তখন সব ছেড়ে ঐ এক ধ'রে রইল। এ রকম ভাবে কেউ ত আমার কাছে আসে নি, কাজেই সে ভাবে কারুর কথা লেখা নেই। আজ পর্য্যন্তও এ রকম সব ছেড়ে কেউ আমার কাছে আসে নি। অমৃতবাণীর নিন্দা করায় ডাঃ সাহেব যদি না চ'টত তা হলে তার ডাক্তার সাহেবত্ব থাকত না। অমৃতবাণী গুরু বাক্য, অমৃতবাণীর নিন্দা মানেই গুরু বাক্যের নিন্দা অর্থাৎ গুরু নিন্দা। ডাঃ সাহেব ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ব'সে নেই ত, যে তার রাগ থাকবে না। জল পরিষ্কার করতে করতে পুরো পরিষ্কার হবে কিন্তু যতটা পরিষ্কার হয়েছে সেইটা দেখ। তার মত আর একটি নেই। তা ছাড়া, তার দিন দিন চট্ চট্ ক'রে উন্নতি হচ্ছে। তার মত গুরুতে ভক্তি, গুরুতে বিশ্বাস আর দ্বিতীয় নেই। আমার জন্যে ত্যাগ বলতে হয় যদি, ত ঐ একলাই সেটা দেখিয়েছে। আমিত্ব ব'লে জিনিষ তার কিছুমাত্র নেই। আমার জন্যে সে মান, সম্ভ্রম, যশ, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সব ত্যাগ করেছে, এমন কি স্ত্রী পুত্রও যদি আমার সম্বন্ধে একটা কথা ব'লেছে ত তার মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করতে চায় না। তার আনন্দ কেবল গুরুভাইদের নিয়ে, স্ত্রী, পুত্র কোথায় রইল, কি খেলে সে সব খোঁজই নেই। গুরু ভাইদের নিয়ে খাওয়ান, গুরু নিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করাই তার জীবনের এক মাত্র আনন্দ। এ ছাড়া, আর তার কোন দিকে নজর নেই। নেহাৎ কতক গুলি কাচ্ছা বাচ্ছা রয়েছে তাই যেটুকু না হ'লে নয়, চাকরি বজায় ক'রে বাকী সকল সময় সে আমারই চিন্তা করে, তাও অফিসে কাজের ভেতর যেটুকু সময় পায় অমৃতবাণী পড়ে। আমার পাছে কোন অসুবিধা হয়, আমার কোন কষ্ট হয় কেবল এই এক কথাই তার মাথায় ঘুরছে। একবার তিন মাস ছুটী নিয়ে আমার কাছে ছিল, তা বাড়ীতে একখানা চিঠি দেয় নি, বাড়ীর চিঠি গেলেও উত্তর ত দেয়ই নি, সব চিঠি ভাল ক'রে পড়ে নি। ছেলের খুব অসুখ, বিন্ধ্যাচলে টেলিগ্রাম গেল, তাও ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আমার সঙ্গেই কাশী ফিরে এলো ও র'য়ে গেল। নিজের স্বার্থ একেবারে নষ্ট ক'রে তার মত অবিচারে গুরু বাক্য

পালন, গুরুতে স্থির বিশ্বাস ও গুরু নিষ্ঠা, আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমি এ কথা জোর ক'রে ব'লবই যে, যে তার সঙ্গ করবে তার গুরু ভক্তি বাড়বেই। অনেকে আমায় বলেছে ওটা আপনি বোঝেন না, ওটা ওর খোসামোদ। খোসামোদ কাকে বলে আগে তা বোঝ। যে খোসামোদ করে সে আগে স্বার্থ ভেবে রাখে। স্বার্থ একেবারে নষ্ট ক'রে, পুত্র, পরিবার তুচ্ছ ক'রে কি খোসামোদ ক'রতে পারে? গোটা কতক কথা ব'লে দিলেই ত হল না। আসল মানে দেখ, ভাব বোঝ, তবে না হবে। সকলেই আমায় ভালবাসে, অনেকেই আমার জন্যে খরচ করতে পারে, তবে লক্ষ টাকার মধ্যে হয়ত দু'শ টাকা খরচ করলে, কিন্তু তার মত একনিষ্ঠ ভালবাসা এবং দু'শ টাকার মধ্যে দু'শ টাকাই আমার জন্যে খরচ করবে অথচ কোন চিন্তা রাখবে না, এর আর দ্বিতীয় এ পর্য্যন্ত পেলুম না।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, তারাপদ, প্রফুল্ল, কালু, জিতেন, কেষ্ট, শ্যাম, হরপ্রসন্ন, কৃষ্ণকিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, দাশরথি, ললিত, পুতু, দ্বিজেন, মতি ডাক্তার, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। গুরু শক্তি কি এক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, গুরু শক্তি এক। যেখানে যেখানে কাজ হয় সেই একই শক্তি।

জিতেন। ধ্যান বলতে ঠিক কি বোঝায়?

ঠাকুর। ধ্যান মানে মন স্থির করা। ঠিক ধ্যান জমলে আর কোন দিকে মন যাবে না। সে বস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দিকে চাইবে না, এক লক্ষ্য হয়ে গতি করবে। ধ্যান ত এক রকম নয়, আধার বিশেষে আলাদা আলাদা হয়, মন স্থির না হলে ঠিক ধ্যান হয় না। সাধারণ যে ধ্যান করতে বসে সেটা ঠিক ধ্যান করবার চেষ্টা, জোর ক'রে মনে টেনে আনছে আবার চ'লে যাচ্ছে, এই রকম অনবরত যাচ্ছে আসছে। এক ঘণ্টা ব'সে ধ্যান করছে অর্থাৎ ধ্যান করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ধ্যান হয় ত এক সেকেণ্ডের জন্যও ঠিক হয় না।

যার ধ্যান না আসে তার গুরু চিন্তা বা গুরুর নাম নিয়ে ***গান করায় ধ্যানের কাজ হয়। স্মরণ মনন হলেই আপনি ধ্যান হয়ে যায়।*** ভালবাসা কিছু না লাগলে স্মরণ মনন করতে পারবে না, আর প্রেম এলে ত সর্ব্বদাই স্মরণ মনন হয়ে যাচ্ছে, কারণ তখন মনে ত আর কোন চিন্তা স্থান পায় না। প্রেম মানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, এই ভালবাসায় সব ত্যাগ হয়ে যায়। আসল কথা ***ভক্তি থাকা চাই। ভক্তি ভাবে যাই করবে মিষ্টি লাগবে। তবে স্মরণ মনন হোক আর নাই হোক, নীতি রক্ষা ক'রে নিয়ম মত ধ্যানে বসা দরকার,*** নইলে অভ্যাসটাও চ'লে যাবে। ধ্যান যত ঠিক জ'মে আসবে তত বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'মে আসবে। সাধারণতঃ একটা মূর্ত্তি ধ'রে ধ্যান করে, মূর্ত্তি ছেড়ে ভগবানকে জপ করতে গেলেও মূর্ত্তি রইল কারণ ভগবান বললেই একটা মূর্ত্তি এসে পড়ল, যেমন জল বললেই একটা পাত্রের ধারণা করলে। ধ্যান ঠিক না জমলেও ধ্যান করবার চেষ্টা করাকেও ধ্যান বলা চলে, যেমন বেদ পড়বার সময় অর্থাৎ শুধু ভাষা পড়া নয়, সেই মত চলবার চেষ্টা করতে থাকলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান না এলেও তাকে বৈদান্তিক বলা চলে, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য থাকলে বা ভাষা মুখস্থ থাকলে সেই মত না চললে বৈদান্তিক বলা চলে না, অথচ না প'ড়ে, শুনে সেই মত চলতে চেষ্টা করলেও বৈদান্তিক বলা যায়। ধ্যানের নিম্ন স্তর হচ্ছে ধারণা।

জিতেন। ধ্যান করতে করতে ঘরে সুগন্ধ বেরোয় এটা কি ঠিক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, অনেক সময় সৎ আত্মা আসে, তাতে ধূপ, ধূনা, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়।

জিতেন। কৃপা যদি আধার বিশেষে অর্থাৎ পূর্ব্ব সাধনা অনুযায়ী হয়, ত কৃপা কোন খানে?

ঠাকুর। তিনি আধার বিশেষে কৃপা করেন এটা ত তাঁর দিক দিয়ে মাপ হল। তিনি না হয় অবস্থা দেখে সেই মত দিলেন কিন্তু তোমার সে বোধ কই? তুমি কি জান তোমার পূর্ব্ব জন্মে কতটা

করা আছে ? জগাই মাধাই কি জানত, যে তাদের পূর্ব্ব সুকৃতি ছিল ? এক কথায় তাদের যে বৃত্তি গুলো একেবারে ঘুরে গেল, এ কি কম কৃপা ? সামান্য বৃত্তি নিয়ে মানুষ মাথা খোঁড়া খুঁড়ি করছে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না, সংসারে দেখছে দুঃখের ইতি নেই, জেনেও বাঁধি মার খাচ্ছে অথচ কিছুই করতে পারছে না, এক চুল ছাড়তে পারছে না। সামান্য মদ খাওয়া বৃত্তি, যা মানুষ কত চেষ্টা ক'রে, দেবস্থানে মাথা খুঁড়ে, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের গালা গাল, নিজের দেহ ক্ষত বিক্ষত হওয়া, পুলিশের শাসন ও মনের অশান্তি সত্ত্বেও ছাড়তে পারে না ; আর, এই জগাই মাধাই এক কথায় মদ খাওয়া ছাড়লে, তাদের সব বৃত্তি গুলো একেবারে বিপরীত হয়ে গেল, যেন সমস্ত জগতটা তাদের কাছে উল্টে গেল। তবু, তুমি একে কৃপা বলবে না। কি ভয়ানক ! এর চেয়ে আবার কি কৃপা হবে ? একেও যে কৃপা বলবে না তার দ্বারা শুধু তার নিজের কেন, জগতের অনেকেরই অকল্যাণ হবে। কৃপা আধার বিশেষে হবে, তার বেশী দিতে গেলেও নিতে পারবে কেন ? বেশী কৃপা সহ্য করবার শক্তি কই ? দাঁড়াতে পারবে কেন ? মনে সন্দেহ হবে এবং হয়ত অন্য কোন মতলব আছে, মনে এই ভেবে সেখান থেকে দৌড় মারবে। আবার, যে সব ছেড়ে তন্ময় হয়ে আমার জন্যে ছুটছে তাকে সেই পরিমাণ ভালবাসা না দিলে তার প্রাণটা ছট্ ফট্ করবে। কৃপা কথার মানে কি ? কৃপা মানে ভিক্ষা। যে, যে জিনিষ পাবার আশা করে না, বা পাবার অধিকারী নয় জানে, সেই জিনিষ পাওয়াই তার পক্ষে কৃপা। তা ছাড়া তুমি যদি জান এ তোমার প্রাপ্য, তা'হলে তুমি কি তার জন্যে চেষ্টা কর ? তুমি ত নিশ্চিন্ত মনে গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকবে কারণ তুমি যে জান, সে জিনিষ ঠিক আসবেই। অপরের কাছ থেকেই কৃপা চায় আপনার লোকের কাছ থেকে আবার কৃপা কি ? সে অবস্থা আসুক, ভগবান আপনার লোক জ্ঞান হোক, তখন না হয় বলতে পার তাঁর আবার কৃপা কি ? সংসারে সমান খেটে কেউ বা ১০৲ টাকা পাচ্ছে আবার

কেউ বা ১০ ৲ টাকা পাচ্ছে। তাঁর জগত তিনি যেমন রাখছেন যেমন বুঝছেন তাই করছেন। তিনি না হয় জানেন এর প্রাপ্য ১০৲ টাকা কিন্তু সে কি তা জানে? সে যদি জানত যে ১০৲ টাকাই তার প্রাপ্য তা হলে সে আরও বেশী বড় আশা নিয়ে তার জন্যে ছুটত না।

জিতেন। দেখা যায়, অবতাররাও সাধারণ মানুষের মত সাধন ভজন ক'রে গতি করেন, সাধারণের মতই মায়ায় অভিভূত হন, তখন তাঁদের আর বিশেষত্ব কোথায়?

ঠাকুর। গুণের মধ্যে এলেই তার নিয়মে চলতেই হবে। তবে কি জান, যে অসাধারণ হবে তার গোড়া থেকেই অসাধারণত্ব থাকবেই, কিন্তু চিনছে কে? বসুদেব কৃষ্ণ কোলে ক'রে যমুনার ধারে কাঁদছে, যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধছে, পুতনা বিষ খাইয়ে মারতে যাচ্ছে। শুধু দর্শন হলেই ত হ'ল না, অবস্থা বিশেষে দর্শনের তারতম্য আছে। সুরথ ও বৈশ্য একই জায়গায় তিন বৎসর ধ'রে তপস্যা ক'রে দর্শন পেয়েও সুরথ রাজত্ব চেয়ে নিলে আর বৈশ্য মুক্তি চাইলে। যতক্ষণ কোন রকম বাসনা নিয়ে ডাক ততক্ষণ দর্শন হলেও একটা যেন ঢাকা মত থাকে। তখন চোখের পুরো বিকাশ হয় না, যতটুকু খোলে সেই অনুযায়ী দর্শন হয়। ***ঠিক দর্শন হ'লে অর্থাৎ কোন বাসনা না নিয়ে কেবল তাঁকে পাবার জন্য তপস্যা ক'রে দর্শন হ'লে পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন পুরো চোখ খোলে।*** সে আলাদা জিনিষ। তখন ত আর কোন স্পৃহা থাকে না, তথাপি তাঁর আদেশে অনেক সময় ভোগের মধ্যে থাকতে হয়। যেমন প্রহ্লাদ কিছু না চাইলেও তাকে জোর ক'রে রাজত্ব করিয়েছিলেন। ধ্রুব রাজত্ব করবার জন্যেই তাঁকে ডেকেছিল এবং দর্শন পেয়েছিল। ধ্রুবের দর্শন ও প্রহ্লাদের দর্শনে অনেক প্রভেদ। ধ্রুব রাজত্ব ক'রেছিল এবং পরে, না কি, আবার সাধন ভজন ক'রে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিল কিন্তু প্রহ্লাদের যে সবই হয়ে গিয়েছিল, সে ত তাঁর আদেশে রাজত্ব ক'রে গেছে। সে ইচ্ছা করলেই সব ছেড়ে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে পারত তার আর সে জন্যে আলাদা সাধন ভজন

করতে হয় না। ধ্রুব স্বার্থ নিয়ে আর্ত্ত হয়ে ডেকেছিল, প্রহ্লাদ একেবারে প্রেমে ডেকেছিল। সাধারণ জীবে আর অবতারে তফাত কি জান, সাধারণ জীব সাধন ক'রে নিজে গেল, কি বড় জোর তার ভাবের আর দু একটাকে পথ দেখিয়ে গতি করবার সাহায্য করতে পারে কিন্তু অবতার জাহাজ, বহু লোককে নিয়ে যাচ্ছে। আবার যেই এদের নামিয়ে দিলে আর তার চিন্তা রাখবে না, কিন্তু সাধারণ সংসারীদের চিন্তা থাকবে। অবতাররা ক্ষণিক অভিভূত হয় মনে হয়, তাও কি জন্যে ? তাদের এত জোর একলক্ষ্য ভালবাসার জন্যে, নইলে তারা যে দাঁড়াতে পারবে না। অভিভূত হ'লে ছেড়ে যাবার সময় দুঃখ বোধ করে কিন্তু অবতারদের তা কখনও হয় না। রাম সীতার জন্যে কেঁদেছে আবার সেই সীতাকে বনে দিয়েছে। কৃষ্ণ গোপীদের জন্যে কেঁদে পাগল আবার দ্বারকা যাবার সময় ভ্রূক্ষেপ করলে না। এর নাম কি অভিভূত হওয়া ? এরা ভোগের মধ্যে ডুবে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই কেননা ভোগ তাদের জড়াতে পারে না, ইচ্ছা করলেই ছেড়ে চলে যাবে ; তা ছাড়া, এরা ভোগে এলেও অসাধারণ ভাবে ভোগ করে। শঙ্করাচার্য্য রাজার দেহে প্রবেশ ক'রে রাজত্ব করবার সময় রাণী, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই তার কাজে আশ্চর্য্য হয়ে ভেবে ছিল রাজা ম'রে কি আবার বেশী শক্তি নিয়ে এলো না কি ? তা দেখ, লোক চেনা বড় কঠিন বিশেষতঃ তোমাদের মত সংসারীদের কি ক্ষমতা যে তোমরা লোক চিনবে তাই বলছি লোক চিনতে গিয়ে সময় নষ্ট ক'রো না, চিনতে ত পারবেই না বরং বেশী ঠ'কে যাবে। নিজকে আগে চিনতে চেষ্টা কর, গুরুতে ঠিক নিষ্ঠা রেখে, গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে, একটা নীতি নিয়ে ধৈর্য্য সহকারে চল তাতেই সব হবে। মেলা উপদেশ শুনতে যেও না, কেন না, সে অনুযায়ী যখন চলতে পারবে না তখন শুনে লাভ কি ? মিছে দশটা ভাব নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে নিজের ভাব টুকু নষ্ট ক'রে ফেলবে ও যে টুকু বিশ্বাস আছে তাও হারিয়ে ফেলবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। **সঙ্গই প্রধান,** যেমন **সঙ্গ** করবে তেমনি সব বৃত্তি আসবে। ত্যাগ দুই প্রকার, সংসারীর ত্যাগ আর খাঁটী ত্যাগ। সংসারে থেকে স্বার্থ ও বাসনা যতটা পার কমিয়ে, সৎ নীতি নিয়ে চলতে পারলে দুঃখের অনেকটা নিবৃত্তি হয়। বেশী আশা রাখতে নেই, যার যত বেশী আশা তার তত বেশী দুঃখ। আর সংসার ছাড়তে হ'লে সংসার বস্তুতে অশ্রদ্ধা আনা চাই, সংসারের ভোগের জিনিষ গুলো ছাড়তে হবে, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, দেহ সুখ প্রভৃতি সব নষ্ট করতে হবে। ভিক্ষা মানে অভিমান নষ্ট করা। বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করতে গেলে কেউ বা তাড়িয়ে দিলে, কেউ বা দুটো গালাগাল দিলে সব সহ্য করতে হবে, উপেক্ষা করতে হবে তবে সংসার ত্যাগ ক'রে এসে গতি করতে পারবে। লালা বাবু সমস্ত ছেড়ে এসে ভিক্ষা করবার সময় যার সঙ্গে পূর্ব্বে ঝগড়া ছিল তার বাড়ী ভিক্ষা করতে যায় নি। দেখ, তখনও সব ছেড়ে এলে কি হবে, পূর্ব্ব সংস্কার কাজ করছে। ভেতর থেকে মান, অভিমান ঠেল মেরে সেখানে ভিক্ষা করতে যেতে দিলে না। পরে গুরুর আদেশে সেই বাড়ী ভিক্ষা ক'রে এলে এ পথে গতি করবার অনুমতি পেলে। ***মানুষের কথায় কাণ দিলে এ পথে যেতেই পারবে না।*** পরমহংসদেব বলতেন লোক না পোক। তার মানে নয় যে লোকদের পোকার মত অশ্রদ্ধা করবে বা ঘৃণা করবে, যেমন পোকাকে নগণ্য ব'লে ধ'রে রেখেছ সেই রকম লোকের কথায় কোন কাণ দিও না, তাদের কথার কোন দাম নেই, লোকের যার যেমন ভাব সে বলতে ছাড়বে না। এ পর্য্যন্ত কোন সাধু বা মহাপুরুষ কেউ এ রকম লোকের নিন্দার হাত থেকে এড়াতে পারে নি। মহাপুরুষের কাজই হচ্ছে ভালবেসে আপন ক'রে টেনে আনা এবং যে তাকে একটু ভালবেসে আসবে তার সে ভাব গ্রহণ ক'রে তাকে আশ্রয় দোয়া তা সে মেয়েছেলেই হোক আর বেটাছেলেই হোক। এখানেও লোকে মহাপুরুষের নামে কত কুৎসিৎ নিন্দা রটাতে ছাড়ে না, তারা এটা

বোঝে না, যে যদি দু পাঁচটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে নিজেকে সামলাতে নাই পারলে ত তার মহাপুরুষত্ব কোথায়? তার দ্বারা কি হবে? যদি এই টুকু রক্ষা করতে না পারে ত সে কি কখনও লোকের উপকার করতে পারে, না জগতের মঙ্গল করতে পারে? মনের ভাব চোখ দিয়ে বাইরে প্রকাশ পায়, কার ভেতর কত পরিষ্কার, কার ভেতর কত শক্তি দুদিন তার সঙ্গে ব্যবহার করলেই বোঝা যায়। নিজে শুধু হয় ত ত্যাগী হতে পারে কিন্তু অপরকে ত্যাগ শেখান আলাদা শক্তির কাজ। ত্যাগী নিজে চ'লে যেতে পারে হয় ত, কিন্তু সংসারীদের মন সংসার থেকে ঘুরিয়ে এনে সৎ দিকে লাগিয়ে তাদের গতি করান ঢের বেশী শক্ত, এ একটা আলাদা শক্তি। তাই, সংসারীদের এত জোর ক'রে সাধু সঙ্গ করতে বলেছে, সাধু সঙ্গ করলে সাধুর ভাব অর্থাৎ ত্যাগ আপনি আসবে এবং সঙ্গ জোর ক'রে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী ক'রে সব ছাড়িয়ে দেবে। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাইরের জিনিষের সঙ্গে ব্যবহার থাকবে অথচ মন যখন তাদের আকর্ষণে পড়ে না, তখনই মন অন্তর্মুখী হয়. আর বাইরের আকর্ষণে পড়লেই সাধারণ বহির্মুখী মন হ'ল। আসল কথা ***যত ধৈর্য্য রক্ষা করতে ও উপেক্ষা করতে শিখবে তত মন স্থির হবে আর তত শান্তি পাবে।*** সংসারে যদি বোঝ কারুর সঙ্গ করলে তোমার ভাব নষ্ট হয়ে যাবে সেই সঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করবে, এ গুলো হচ্ছে বেড়, প্রথমে এ গুলো খুব দরকার। পুরাকালে গুরু গৃহে কঠোর নীতি পালন ক'রে খানিকটা তৈরী হয়ে এসে সংসারে ঢুকত ব'লে এ সব সামান্য ব্যাপারে স্থির থাকতে পারত। নিজের ভেতরটা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করবে, সর্ব্বদা মনে চেষ্টা রাখবে কি সে সৎ ভাব রক্ষা ক'রে সৎ হতে পারবে, কি সে সকলকে ভালবাসতে পারবে, তবেই ঠিক মানুষ হতে পারবে। ***কাউকে কখনও মাপতে যেও না, তাতে তোমার ত কোন লাভ নেই, তুমি কেবল নিজের মাপ ক'রে যাও, যে দিন দিন তোমার কি উন্নতি হচ্ছে, কত বাসনা কমছে, মন***

কত স্থির হচ্ছে। তোমাদের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা কি যে তোমরা ঠিক মাপতে পারবে? অন্ধকার ঘরে ভাল ছবি মন্দ ছবি কি বাছতে পার? ***লোকের যত দোষ দেখবে নিজের মন তত নীচু হয়ে যাবে,*** যে নিজে ভাল সে সকলকেই ভাল দেখে অর্থাৎ সকলের গুণ গুলোই আগে তার চোখের সামনে আসে। আর যে নিজে অসৎ সে সকলকেই খারাপ দেখে। সঙ্গে এই গুলো ঠিক ক'রে দেবে, রিপু অধীন ক'রে আনবে, এবং ভেতরে সৎ ভাব এনে দেবে। ***সাধু সঙ্গ কখনও বৃথা হয় নি*** তবে যেমন মন দেবে তেমনি মুনাফা পাবে। ***যার গুরুতে বিশ্বাস নেই তার কিছুই হবে না।*** ঠিক ভালবাসা বা প্রেম আলাদা, অন্ততঃ কিছু বিশ্বাস ঠিক থাকা চাই নইলে গতি করবে কি ক'রে? গুরুতে বিশ্বাস রেখে অন্ততঃ কিছু সময় গুরু সঙ্গ করবে; তাতে নিজের আমিত্বটা অনেক কমিয়ে দেবে এবং সংশয় এলেও এই সঙ্গে আবার ঘুরিয়ে ঠিক পথে এনে দেবে। অবিচারে গুরুবাক্য পালন করার নামই গুরু সেবা, তা আমিত্ব থাকতে অবিচারে গুরুবাক্য পালন করতে দেবে না, তবে যার ঠিক স্থির বিশ্বাস এসেছে যে আমি সদগুরুর কাছে আছি, আমার আর ভাবনা কি? তার কথা আলাদা তার ত সব হয়েই গেল। এই রকম জোর ভালবাসা রক্ষা করা যায় না। যার মন ওঠে নামে তার ঠিক প্রেম আসেনি, যারা বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে গুরুসঙ্গ করে তাদের মন ঠিক থাকে না, ওঠে, নামে; আর যারা বেশীর ভাগ ছেড়ে এসে সঙ্গ করে তাদের মন প্রায় ঠিক থাকে।

দ্বিজেন গাহিল

> দিন যাবে মা কথাই রবে তোমার নামের কি এমনি ধারা,
> তুমি কারে দাও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে দাও মা দুঃখের ভরা।
> গুরু দত্ত বীজ করেছি রোপণ, ভক্তি বারি তাহে মা ক'রেছি সেচন,
> দিয়াছ যে মনের জমি, তাহে আসলে ফসল কমি,
> তাহে হয় না ছ'জনার উদর পূরণ,
> আমি তাই ভেবে ভেবে হই মা সারা॥

চতুর্থ ভাগ—নবম অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১লা ভাদ্র ১৩৪০ সাল:
ইং ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, প্রফুল্ল, কালু, পুত্তু, জিতেন, তারাপদ, কেষ্ট, হর প্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকিশোর, গোষ্ঠ, মতিডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভোলা, সুধাময়, পঞ্চানন, সুরেন, অমল ও অভয় প্রভৃতি অনেকে আছে।

জিতেন। ভাগ্য কি যে যার নিজের সঙ্গে কেবল জড়িত, না স্ত্রী পুত্রাদি অপর সকলের সঙ্গেও জড়িত?

ঠাকুর। ভাগ্য বললেই সকলের সঙ্গেই যোজনা রয়েছে। মন যত জিনিষ ধ'রে আছে অর্থাৎ যাদের দুঃখ হলে নিজেরও লাগে সেই সকলের সঙ্গেই ভাগ্য জড়ান রয়েছে। তাই শাস্ত্রে আছে, পিতার পাপে, মাতার পাপে, রাজার পাপে ও ছেলের পাপে শিশুর অকাল মৃত্যু হয়, তা হলেই দেখ রাজার সঙ্গে প্রজার ভাগ্য জড়িত রয়েছে, আবার জাতীয় ভাবেও ভাগ্য যোজনা রয়েছে, কোন জাতি পরাধীন হলে তারা অমনি রাজার আচার, পদ্ধতি, নীতি গ্রহণ করে। তখন সেই রূপ ভাগ্য যাদের, তারাই পরাধীন জাতিতে জন্মায়, আর যাদের ভাগ্য সেই রকম, তারা স্বাধীন দেশেই জন্মায়। যতক্ষণ বাসনা আছে ততক্ষণ বিশ্বাস টলবেই, মন স্থির থাকতে পারে না। যত ত্যাগ আসবে তত বিশ্বাস স্থায়ী হবে, ত্যাগ মানে সংসারীয় ত্যাগ, উপেক্ষা করা. আসে ভাল, যায় ভাল। বাসনার ত ইতি নেই, বাসনা হওয়া মানেই সেটা পুরবে এ ইচ্ছা রয়েছে, অথচ এও ঠিক, যে এই অনন্ত বাসনা যে সবই পুরবে তা নয়, যেটা যখন বলবতী সেই টা পুরলেই মনে হয় শান্তি আসবে কিন্তু সেটা যেই পুরল অমনি

অপর একটা বাসনা সেই রকম জোর দিয়ে ঠেলে উঠল, এই রকম বাসনার পর বাসনা উঠতে থাকবে আর যেটা না পুরবে অমনি অশান্তির সৃষ্টি করবে।

পুত্র। এই যে ভাগ্যের কথা বললেন বা আধারের কথা যে বলেন ও সব ত সাধারণ। আমরা যখন আপনার কাছে রয়েছি তখন ত বিশেষ কিছু হওয়া দরকার।

ঠাকুর। বিশেষ, সব তাঁর কাছে, ***তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ কচ্ছেন,*** ইচ্ছা করলে বিশেষ করতে পারেন। কত হিন্দু তাদের আচার পদ্ধতির মধ্যে থেকেও যা তা করছে, সৎ ভাব বা সৎ নীতির ধারও ধারে না, আর তুমি বিলাতে বিপরীত আচার ব্যবহার নিয়ে কাটিয়ে এসেও কিছু সদভাব নিয়ে যে রোজ এখানে আসছ, এই কি কম বিশেষত্ব? আবার আধার অনুযায়ী সব হবে ত নইলে সহ্য করতে পারবে কেন? ঘাড় শক্ত না হলে বোঝা নিতে পারবে কেন। যার যে পরিমান পারা ঠিক থাকে তার তত পরিমান মন স্থির থাকে।

মানুষ সাধারণতঃ দুটো জিনিষ নিয়ে গতি করে, হয় গুরু যেটা ব'লে দেবেন প্রান পণ ক'রে পালন ক'রে যাওয়া, আর নয়, নিজের আমিত্ব ব'লে কিছু না রেখে সব তাঁকে দিয়ে দেওয়া এই দুটোর যেটা হ'ক ঠিক পূর্ণ ভাবে মেনে চললেই শান্তি নইলে অশান্তি। বাসনা থাকলেই ওঠা নামা থাকবে, তবে আমিত্ব নষ্ট ক'রে এলে অনেকটা স্থির থাকবে। সাধারণ স্ত্রী পুত্রের ওপর যে ভালবাসা সেটা স্বার্থ নিহিত, এই স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদ, দেহ সুখ প্রভৃতির অধীন হওয়া মানেই দাস। আর এই গুলো লোকসান ক'রে অপরের দাস হ'লে মহাদাস। দুই কারণে আমিত্ব নষ্ট হয়; এক, স্বার্থের জন্যে অনেক সময় আমিত্ব নষ্ট করে, তাকে খোসামোদ বলে, যেমন টাকার জন্যে অফিসের সাহেবের কাছে আমিত্ব নষ্ট ক'রে তার মতে মত দিয়ে দাসত্ব স্বীকার ক'রে চলতে হয়। আর, প্রেমে আমিত্ব নষ্ট হয় তখন

ত আর কোন স্বার্থ থাকে না। সব ছেড়ে, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদ সব ছেড়ে সাধুর সেবা করাকে আর দাসত্ব বলে না, সেটা ত রাজত্ব। সংসারে দাসত্ব মানে বদ্ধতা তখন ভয় ভাবনা চিন্তা সব রয়েছে, আর, সাধুতে দাসত্ব মানে সাহস, নির্ভীকতা, তখন চিন্তা ভাবনা থাকে না কারণ যে যে জিনিষে চিন্তা ভাবনা করায় সে সে জিনিষ গুলো তখন ত ছেড়ে গেছে। সংসারে অনেক সময় আবার কর্তব্যের দোহাই দিয়ে বসে, অথচ কর্তব্য যে কি তা ঠিক বোঝে না; মায়া থাকতে নিজের স্বার্থকে বড় করবে, তখন কর্তব্য যে কি তা ধরতে পারবে না। সংসারে কর্তব্য মানে নেহাৎ যেটুকু তুমি না হ'লে হবে না কেবল মাত্র সেই টুকু সংসারে মন দিয়ে, বাকী সময় নিজে ঠিক থাকবে। এই কর্তব্য স্তর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন মানুষের কর্তব্য, দেবতার কর্তব্য প্রভৃতি। যত জ্ঞান বাড়বে তত কর্তব্য বুঝবে, আর, অজ্ঞানে কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়। যত বেশী কর্ম্ম সৃষ্টি করবে তত বেশীতে কর্তব্য লাগাবে, তবে সংসারে থাকতে হ'লে তোমার সামনে কারুর কিছু বিপদ এলে, সে সময় ত তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে, তাও যদি দেখ, যে, তার দেখবার লোক আছে, তুমি না লাগলে বিশেষ ক্ষতি হবে না, তা হলে তফাৎ থাকবে। সাধারণ ভাবে দেখ, তুমি সংসারের কর্ত্তা হয়েছ সুতরাং যারা তোমার সংসারে রয়েছে তারা সকলেই তোমার কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে, নইলে কর্তৃত্ব রইল কোথায়? কিন্তু তা কি হয়? তখন সম্ভব হয় ত জোর ক'রে কর্তৃত্বে রাখতে হবে নয় ত কর্তৃত্ব ছাড়তে হবে। এ কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে, 'লালয়েত পঞ্চবর্ষানি দশবর্ষানি তাড়য়েত, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ', অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আবদার শুনবে তারপর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শাসন ক'রে নিজের কর্তৃত্ব ঠিক রাখবে কিন্তু ১৬ বৎসরের পরও যদি দেখ ইচ্ছা ক'রে তোমার অবাধ্য হয়, কোন কর্তৃত্বে থাকতে চায় না, তখন তার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে কারণ তুমি জোর ক'রে মায়ায় কর্ত্তা সাজলে কি হবে? তোমায় ত কর্ত্তা ব'লে

স্বীকার করছে না। তখন তার দোষ, সে জন্যে সে দুঃখ পেলে তোমাকে স্থির থাকতে হবে। তাই, এই কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়াও বড় সোজা নয়; মায়া থাকতে কর্ত্তৃত্ব ছাড়তে পারবে না, মনের শক্তি চাই তবে ঠিক এই ভাব বজায় রাখতে পারবে আর তখনই ঠিক কর্ত্তৃত্ব করতে পারবে। ***নিঃস্বার্থ ভাবে পরের উপকারের জন্য কাজ করার নাম কর্ত্তব্য,*** সংসারে যত পি, পু, ফি, সু হয়ে থাকবে তত কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ***সংসারের প্রধান ধর্ম্ম হচ্ছে আত্ম জ্ঞান লাভ করা।*** ঠিক সহধর্ম্মিনী তার সহায়তা করবে, তা ভিন্ন ত আছে স্ত্রীর ভাবে না চললে স্ত্রী ভাবলে স্বামী ভালবাসে না, এখানে ভাল-বাসা মানে স্বার্থ পূরণ, তাতে স্বামীর মন্দ হবে বা ক্ষতি হবে তা দেখবে না। তুমি যদি ধর্ম্মের দিকে যেতে চাও তখন তুমি খুঁজবে যে তোমার স্ত্রী পুত্র সব ধর্ম্মের দিকে গতি করুক, তখন স্ত্রী যদি ধর্ম্মের দিকে কিছুতেই যেতে না চায় ত দুজনেরই উল্টো ভাব হ'ল, এতে বেশী অশান্তি উৎপন্ন হয়, তখন তোমার ভাব ঠিক বজায় রেখে স্ত্রীর ভাব ও ব্যবহার উপেক্ষা ক'রে চলতে পারলে খানিকটা শান্তি পাবে, আর তুমি ত মন্দ করছ না, তুমি ভালই বলছ কিন্তু তার বাসনা গুলো না গেলে ত এ ভাব ভাল লাগবে না কাজেই তাকে অশান্তি ভোগ করতেই হবে, পরে যখন আবার মন ফিরবে তখন বুঝবে যে তার আগের ভাবটা অন্যায় ছিল। তাঁর দিকে ভালবাসা নিয়ে গতি করতে হলে সকলকেই ভালবাসতে হবে তখন স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যারা তোমার আপনার লোক, তাদেরও যেমন ভালবাসবে অপরকেও সেই রকম, বরং কিছু বেশী ভালবাসতে হবে, তা ব'লে স্ত্রী পুত্রকে ত্যাগ করলে চলবে না কারণ যখন জগতের সকলকেই ভাল-বাসছ, তখন তারা কি অপরাধ করলে, তারা স্ত্রী পুত্র না হলে ভালবাসা পেত, আর স্ত্রী পুত্র হয়েছে ব'লেই যত অপরাধ হ'ল, এটা ঠিক নয় তবে স্ত্রী পুত্রেরও জানা উচিত যে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে বলে যে তাদের ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই, এও নয়।

সকলকেই সমান ভালবাসতে না পারলে এদিকে আসতে নেই, সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে হবে অথচ সকলকেই আপন ক'রে নিতে হবে তবে লোক শিক্ষার পথে আসা চলে। যারা লোক শিক্ষায় থাকবে তাদের লৌকিক আচার হিসাবে স্ত্রী পুত্রের ওপর একটু বেশী কড়া হতে হয় পাছে অপরে মনে করে নিজের স্ত্রী পুত্রের ওপর ত কড়া নয়, আমরা পর কিনা, তাই আমাদের ওপর বেশী কড়া কিন্তু স্ত্রী পুত্রের ওপর বেশী কড়া দেখলে বলবে, যে না, এ সকলকেই সমান ব্যবহার করে।

তারাপদ। পরমহংসদেব মার জন্যে বৃন্দাবন থেকে চ'লে এলেন, এটা কি মায়ের প্রতি ভক্তির জন্যে ?

ঠাকুর। পরমহংসদেব প্রভৃতি অবতারদের কথা আলাদা, তাঁরা কখন কোন উদ্দেশ্যে কোথায় কি করেন তার বিচারে আমাদের প্রয়োজন কি ? হয় ত ঐ মায়ের প্রতি ভক্তি উপলক্ষ্য ক'রে এই এত বড় লোকশিক্ষা কাজের জন্যে নিয়ে এল। পিতা মাতার ওপর ভক্তি ভালবাসাটা শুধু মায়া বললে হবে না, এখানে কর্ত্তব্য আছে কারণ এদের দ্বারা তুমি জগত দেখলে, এত বড় হ'লে। এতদিন যে তাদের সেবা খেলে তার বদলে সেবা করা, ভক্তি করা ত কর্ত্তব্যের মধ্যে, কথায় বলে পিতৃ মাতৃ ঋণ শোধ দেওয়া যায় না, তার মানে হচ্ছে এত উপকার পেয়েছ যে সেই পরিমানে শোধ দেওয়া হয় ত সব সময় হয়ে উঠবে না, তা ছাড়া, তোমার অসময়ে তারা তোমার করেছে কিন্তু তুমি বড় হয়ে তোমার সুসময়ে শোধ দিচ্ছ। পিতা মাতা কর্ত্তব্য হিসাবে হোক, মায়ায় প'ড়ে হোক, যে ভাব নিয়েই সেবা করুক না কেন, তুমি ত সেবা পেয়েছ, তার কর্ত্তব্য তুমি কর ত, তাদের ভাবের কাজ তারা বুঝবে। পিতামাতার প্রতি ভয়ও একটা জিনিষ কারণ ভয় দ্বারা তুমি ঠিক হয়ে চলেছ।

কেষ্ট। মন প্রাণ দিয়ে সঙ্গ করলে গুরু সেবা ঠিক হয়, তা আমরা যে সঙ্গ করি তাতে কিছু কাজ হয় কি ?

ঠাকুর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যার যেটুকু ভাব আছে তার সেই টুকুই কাজ হচ্ছে, যার একটা পাই আছে সে তাই দিয়েই করবে ত, তা সে টুকুও ফেলবার জিনিষ নয়, তারও দাম আছে। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু যে বল, ও ত কেবল ভাষা, ব্রহ্মা বিষ্ণু কি তা ত জান না, দেখনি, কাজেই কি কি হ'লে গুরু ব্রহ্মা হয় গুরু বিষ্ণু হয় তা সে অবস্থা না হ'লে বুঝবে কি ক'রে ? গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু ঠিক ঠিক বোধ এলে, তোমার অস্তিত্বই থাকবে না, কিছু নিষ্ঠা ঠিক এলেই কত হয়ে যায়, তার আর সাধন ভজন দরকার হয় না। অবস্থা না এলে ব্রহ্মজ্ঞানী লোক চিনতে পারবে না, তবে সাধারণ ভাবে জানবে, যে, যে পরিমাণ সংসার মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, যার, যে পরিমাণ সংসার চিন্তা ক'মে এসেছে, তার মন তত তাঁর দিকে এগিয়েছে, তখন সে দেহ মন প্রাণ দিয়ে গুরু সেবা করতে পারে, তখন তার গুরু ছাড়া অপর কোন দিকে নজর থাকে না, সেই তখন "গুরু গত প্রাণ, গুরু ধ্যান জ্ঞান, গুরু পদে মতি, আত্মসমর্পণ" এই ভাবে গুরু সেবা করে।

কালু। গুরু সেবা মানে এই স্থূল দেহেরই সেবা ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যতক্ষণ রূপ রস গন্ধে মন, তত ক্ষণ গুরুর রূপই ধ'রে চলতে হবে। চিমনী টা স্থূল, ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ভেতরের আলোটা এক, সূক্ষ্ম। স্থূল ধ'রেই সূক্ষ্মে যেতে হবে। আন্তরিকতাই প্রধান জিনিষ, এই আন্তরিকতার সহিত ভালবেসে সেবা করাই আসল কাজ, তখন আপনা আপনি তোমার মনকে এই স্থূল রূপ ছাড়িয়ে সূক্ষ্মে নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণকিশোর। প্রথম অবস্থায় নীতি পালন ক'রে চলতে হয় কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে চলতে হয় ?

ঠাকুর। সকল অবস্থাতেই নীতি পালন ক'রে চলতে হবে তবে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির কিছু পরিবর্ত্তন হয়, যেমন, সংসারে থেকে তাঁর দিকে যাবার এক প্রকার নীতি, আবার, সংসার ছেড়ে তাঁর দিকে যাবার আর এক প্রকার নীতি, শেষ পর্য্যন্ত নীতি নিয়েই চলতে হবে। জ্ঞান বা প্রেম এলে তখন আপনি নীতি ছেড়ে যায়।

কৃষ্ণকিশোর। যারা ধর্ম্মের দিকে গতি করে সাধারণ লোক তাদের আহাম্মক বিবেচনা করে এবং অনেক সময় আহাম্মকের মত যা তা খাটিয়ে নেয় ত?

ঠাকুর। সাধারণ লোক তাদের আহাম্মক বলুক তারা কিন্তু যথার্থ আহাম্মক নয়, তারা কখনও সাধারণের মত ঠকে না, তারা যখন ঠকে তখন বুঝতে পারে যে তাদের ঠকাচ্ছে কিন্তু তাদের ত কোন বিষয়ে প্রয়োজন নেই, কাজেই কি আর তাদের ঠকাবে? তারা ইচ্ছা ক'রে অনেক সময় আহাম্মক সেজে সাধারণের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করে। পরমহংসদেবকেই এক জন তামাক সেজে দিতে বলায় তিনি নিজেই সেজে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় অপর লোক এসে তাঁকে বসতে ব'লে নিজে তামাক সেজে দিলে।

কৃষ্ণ কিশোর। সাধু সঙ্গ করছে, কিছু লাভ বুঝতে পারছে, সঙ্গ করতে ভালও লাগে, অথচ দিন কতক পরে হঠাৎ ছেড়ে যায়, আবার অনেক সময় ফের ঘুরেও আসে এ রকম হয় কেন?

ঠাকুর। সংসারীরা সাধারণতঃ নানা বাসনা নিয়ে এখানে আসে, হয়ত কারুর একটা বাসনা পুরল তখন তার খুব বিশ্বাস হ'ল, যেমন ছেলের অসুখের জন্যে এলে ছেলে সেরে গেলে বলবে সাক্ষাৎ ভগবান কিন্তু যেই আর একটা বাসনা পুরল না, অমনি বললে দূর ছাই এঁর কাছে কিছু হয় না তখন দুদিন আগে সে যে নিজেই সাক্ষাৎ ভববান বলেছিল তা আর বোধ থাকে না, এই ভাবে অনেকে অবিশ্বাস নিয়ে সরে যায়। যতক্ষণ বুঝবে, এখানে এলে লাভ আছে ততক্ষণ ছাড়বে না কিন্তু বাসনার ঠেলায় কোন একটা বাসনা না

পুরলেই এই লাভের কথা ভুলিয়ে দেয়। এখানে এসে সৎ কথা, সৎ ভাব ছাড়া ত কিছু পাও না কাজেই কিছু লাভ ত হওয়া উচিতই না হ'লে বুঝতে হবে তোমার অতি দুর্ভাগ্য। যারাই বাসনা নিয়ে কিছু লাভের জন্যে এখানে এসেছে তারাই সব সময় ঠিক ধৈর্য্য রেখে চলতে পারে না অনেক সময় ছিটকে চ'লেও যায়, কিন্তু যখন দেখে চ'লে এসেও ত কোন লাভ নেই, যেমন দুঃখ তেমনই আসছে, তখন আবার হয়ত ফিরে যায়। সংসারীর বাসনা থাকলেই ভালবাসা পারার মত উঠবে নামবে, সংসারের চেয়ে আমার ওপর জোর ভালবাসা পড়লে চট্ ক'রে ছাড়বে না কিন্তু আমার চেয়ে সংসারে জোর ভালবাসা থাকলে ছেড়ে যাবে। আমার চেয়ে সংসারে বেশী ভালবাসার প্রমাণ হচ্ছে একটুতেই আমার ওপর মান অভিমান হবে ও আমায় ছেড়ে দেবে, অথচ সংসারে এর চেয়ে ঢের বেশী ধাক্কা অনবরত খাচ্ছ তবু ছাড় না। আবার যে আমার জন্যে যতটা ক্ষতি স্বীকার করতে পারে, যতটা ত্যাগ করতে পারে তার আমার ওপর তত ভালবাসা পড়েছে। যারা ত্যাগ ক'রে আসে তারা সহজে ছাড়ে না, জোর ক'রে ধ'রে থাকে, কারণ যে সব জিনিষে আমার কাছ ছাড়া করাবে সে গুলো ত সব তার আগেই ছেড়ে গেছে। এক দল লোক আছে তারা না পারে সংসার করতে, না পারে ধর্ম্ম করতে, তারা চট ক'রে রাতারাতি কিছু লাভ দেখতে চায়। তারা যখন এখানে আসে, তখন যে ঠিক আধ্যাত্মিক উন্নতি করবার জন্যে আসে তা নয়, তারা বড় জোর কোন একটা বিভুতি লাভের জন্যে, লোককে দেখাবার মত কোন শক্তি সঞ্চয় করতে আসে, কাজেই তাড়া তাড়ি কিছু না পেলেই ধৈর্য্য রাখতে না পারায় পালায়। রাতারাতি কিছু হবার যো নেই, এ পর্য্যন্ত কি শুনেছ, কোন সাধুর কাছে গিয়েছ আর সাধু একটা বাটীতে গুলে খাইয়ে দিতেই অমনি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে গেল বা ব্রহ্মদর্শন হয়ে গেল,' রীতিমত ধৈর্য্য ধ'রে এক লক্ষ্য হয়ে গতি করতে পারলে তবে আশা করতে পার এক দিন কিছু

হতে পারে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ত তুমি করবে, তা হয় নিজের ওপর নিয়ে গুরু উপদেশ মত খেটে কর, আর নয়, গুরুতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর। তা নয়, বিশ্বাসের বেলায় করবে বিচার অর্থাৎ গুরু যেটা বলছেন সেটা বিশ্বাস না ক'রে বিচার করবে তিনি কি ঠিক বলছেন, এটা কি ঠিক হবে, আর, খাটবার বেলা করবে অবিচার অর্থাৎ তখন তুমি না খেটে শুধু মুখে বলবে তিনি যা করেন। অনেক সময় কেউ কেউ ধর্ম্মপিপাসু হয়ে এখানে ওখানে ঘোরে বটে কিন্তু তারা ধরতে পারে না বা বুঝতে পারে না যে তারা ঠিক ধর্ম্মপিপাসু নয়, তারা ঠিক ত্যাগী নয়, অন্তরীক্ষে তাদের কিছু বাসনা রয়েছেই সুবিধে পেলেই ঠেল মারে। এদের বেশীর ভাগই একটা বিভূতি লাভের আশায় ছোটে, কিন্তু ধৈর্য্য রাখতে না পারায় নানা সাধুর কাছে এমন কি নানা ভিন্ন ধর্ম্মেও যায়, এ সব বিক্ষিপ্ত মনের লক্ষণ, শেষে কারুর কারুর হয় ত চৈতন্য হয়, তাই ত এ কি করছি, বিভূতির জন্যে এদিক ওদিক ক'রে মিছে সময় নষ্ট করছি কেন? তখন এক জায়গায় স্থির হয়ে ব'সে গতি করতে থাকে ও শান্তি পায়। যার কিছু ভালবাসা ঠিক পড়েছে সেই ঠিক থাকতে পারে, তখন বাসনা জনিত পালাবার চেষ্টা করলেও অনেক সময় ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে, তখন বুঝবে তাঁর কি দয়া, তিনি তোমাকে ধ'রে আছেন, ছট ফট করলে কি হবে, ছাড়বেন না, চাবুক মেরে জোর ক'রে নিয়ে যাবেন। যার এটাও হয়েছে সেও মহাভাগ্যবান। তিনি ত সকলকেই সব সময় ধ'রে আছেন, সকল সময়েই যেন ভুল পথে যেতে চাইলেও জোর ক'রে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সে বোধ কারুর আছে কি? তিনি যাকে কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দেন সেই কিছু বুঝতে পারে। এই বুঝতে পারা সাধারণ অনুভূতি হলেও প্রথমে গতি করার পক্ষে এ একটা মস্ত অনুভূতি, তখন মনে কিছু আনন্দ আসে এবং গতি করবার ইচ্ছা জোর হয়, তখন হয় ত ভগবানের জন্যে কিছু প্রয়োজন বোধ করে, এই প্রয়োজন যত বাড়তে থাকবে

তত বস্তু লাভের জন্যে গতি করতে ভাল লাগবে এবং খুব বেশী প্রয়োজন হলে তার জন্যে যত কঠোরই হোক আনন্দের সহিত হাসতে হাসতে সে কঠোর করতে পারবে। সদ গুরুর কাজ হচ্ছে এই প্রয়োজন লাগিয়ে দেওয়া। এখানে খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির এত সুবিধা রেখেছি কেন ? তোমাদের ত প্রয়োজন নেই কাজেই একটু কঠোর বল্লেই ছেড়ে দৌড় মারবে এ মুখোও আর হবে না, তাই গায়ে হাত বুলিয়ে দেহ সুখ, রসনা তৃপ্তি প্রকৃতি যে গুলো তোমাদের প্রিয় ও প্রকৃতিগত সেই সব ভাব বজায় রেখে ভাল কথায় বা গান বাজনা প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদের প্রলোভন দেখিয়ে টেনে এনে এখানে বসিয়ে প্রয়োজন ধরিয়ে দেবার জন্যেই এত ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। যদি তোমাদের কারুর ঠিক সেই রকম প্রয়োজন বোধ থাকত, ঠিক সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসত, ত তাকে সেই ভাবে কঠোর নীতি দিতুম। তোমরা কিছু সৎ নীতিতে আছ ব'লে মনে ক'রো না যে একটা মস্ত কিছু করছ, তোমরা ভদ্রঘরের সন্তান তোমাদের ত সৎ নীতি থাকাই দরকার, তা, সে রকম সৎ নীতি কেউ রাখনা ব'লে আজকালকার দিনে সৎ নীতি নিলে বলব যে ঠিক ভদ্র ব'লে পরিচয় দেবার মত হয়েছে, যেটা নেবে যাচ্ছিলে এখন ঠিক হ'লে ; যতক্ষণ না সৎ নীতির ওপর কিছু করতে পারছ ততক্ষণ বলব না যে কিছু লাভ করেছ বা লাভের দিকে যাচ্ছ। যারা অভদ্র তারা অজ্ঞান, তারা কাম ক্রোধ লোভের এত অধীন যে কোন মাপ রাখতে চায় না, আচার তেঁতুল সামনে দেখলেই খেয়ে নিলে, কিছু ভাবলে না, এই হ'ল এদের অনার্য্য ভাব, তাই তাদের সঙ্গ করতে এত বারণ ক'রেছে। ভদ্র যারা, তাদের কিছু জ্ঞান থাকে, তারা কাম, ক্রোধ লোভের মাপ রেখে চলতে পারে, আচার, তেঁতুল দেখলেই তারা খেয়ে ফেলে না, ভাল মন্দ ভেবে মনকে অনেক শক্ত ক'রে এ সব থেকে তারা যতটা পারে তফাৎ থাকে, এই হল আর্য্য ভাব। সৎ নীতি নিয়ে

চললে, গুরুতে বিশ্বাস রেখে গুরু সঙ্গ ক'রে চললে, অনেকটা আপনি রক্ষা হয় তবে বাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মনে ঠেলে উঠবেই এবং কার্য্যও হয়ত হয়েও গেল কিন্তু সৎ নীতিতে থাকায় পরক্ষণেই মনে একটা অশান্তি আসবে এবং ভবিষ্যতে আর এত সহজে ও কাজ হতে দেবে না, এতে গতি করার পক্ষে একটু দেরী হওয়া ছাড়া আসলে ক্ষতি হয় না, কারণ গীতাতেই আছে অতি দুরাচারীও আমায় ভজনা করলে শান্তি পায়। যে সদগুরুতে ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারে, তার কথা আলাদা, তাকে হয়ত আচার তেঁতুল খাইয়ে জ্বর না করিয়ে গতি করান, সে তাঁর ইচ্ছা তিনি যাকে যে ভাবে ইচ্ছে নিয়ে যান, যারা তাঁর ঠিক সঙ্গ করে তাদের ত কিছুরই দরকার নেই, কঠোরতারও দরকার নেই, সাধন ভজনেরও দরকার নেই, তবে তিনি লৌকিক হিসাবে পরীক্ষা করবার জন্য অনেক সময় কঠোরতা দিয়ে দেখেন কি পরিমাণ মন তৈরী হয়েছে, কি পরিমাণ বাসনা ত্যাগ ক'রেছে, কি পরিমাণ রিপু অধীন ক'রেছে, কি পরিমান লাভ লোকসান ত্যাগ ক'রে তাঁর দিকে আসছে। কঠোরতায় যে দাঁড়াতে পারে তারই কিছু অবস্থা লাভ হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে, সে সৎ গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রক্ষা ক'রে তাঁকে ঠিক ধ'রে আছে, তা ছাড়া, সদগুরুর কাছে যেটুকু দেহ সুখ বা রসনা তৃপ্তির জিনিষ পাচ্ছে, তাতেই না অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সেটা ছাড়াবার জন্যেও তিনি অনেক সময় কঠোরতা দিয়ে ঠিক ক'রে নেন, মাছ খেলে না এটা ঠিক ত্যাগ হ'ল না, আসল ত্যাগ হবে যখন মাছ এলে খেলে, না এলে খেলে না, অথচ তার জন্যে কোন চিন্তা রাখলে না, তা ভিন্ন, বাঙ্গলা ছাড়লেই ত বড় আর মাছ খায় না, তা, ঘি দুধ খেয়েও তাদেব সমানই অবস্থা, কাজেই ও সব বাহ্যিক ত্যাগ কিছু নয়, তবে ও গুলো হয়ত অনেক সময় গতি করবার কিছু সহায়তা করতে পারে মাত্র। যখন নিজে গতি কর তখন জোর ক'রে বাসনা ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু সদগুরু যখন ধ'রে নেন তখন বাসনা দিয়েই নিয়ে যান, তিনি অনেক

সময় সংসারীদের সংসার রেখে গতি করান। গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রাখলে অপর সব কাজ ছোট হয়ে যায়, গুরুর উপদেশ শুনে চলাটাই তখন বড়, চাকরী থাক আর যাক, তখন গুরু যে কঠোরতাই দিন না কেন, আনন্দ চিত্তে সব করবে। কিছু বিশ্বাস থাকলে হয় ত কঠোরতা করবে কিন্তু মনে মনে ঠিক ভাল লাগছে না তবু গুরু ব'লেছেন ব'লে যে রকম ক'রে হোক করবে, এও ভাল; আর বিশ্বাস না থাকলে ত কঠোরতা শুনলেই পালাবে। যার যেমন মনের অবস্থা সে সেই ভাবে নিচ্ছে, যত সংসারে মন রাখবে তত মুখাপেক্ষী হতে হবে, তাই যেন তেন প্রকারে মনকে ওঠান দরকার, তখন মায়ার বস্তু সব ছোট হয়ে যাবে, একেবারে মায়া না গেলে সব ঠিক ভোলা যায় না। অনেক সময় কেউ কেউ, সংসারে সব যখন ওরই মধ্যে ভাল, তখন মনটা অনেকটা স্থির থাকায়, মনে করে যে, সে-সব বাসনা ছাড়তে পেরেছে, মায়া কাটাতে পেরেছে এবং অন্তরীক্ষে যে বাসনা, মায়া সব ঠিক আছে এটা ধরতে না পেরে হয় ত সংসার ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকে, কিন্তু যেই ছেলের অসুখ চিঠি পেলে অমনি সেই চাপা মায়া ঠেল মেরে তাকে আবার সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। একে সংসার ত্যাগ বলে না, এ সাধারণ সংসারীর হাওয়া বদলাতে যাওয়ার মত। যখন ঠিক সংসার ত্যাগ করতে চাইবে তখন মনের শক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখানে বাড়ীর আর কেউ সন্ধান না পায় বা চিঠি না যেতে পারে। সৎ সঙ্গে থাকলে এই মায়ার ভাবটা অনেক সময় কমিয়ে দেয় তখন খবর পেলেও মন তত উতলা হয় না, আর ঠিক ত্যাগ হয়ে গেলে পাড়ায় অপরের ছেলের অসুখ খবর পেলে যেমন চিন্তা না ক'রে সেইখানেই থেকে যাও তেমনি নিজের ছেলের অসুখেও কোন চিন্তা না ক'রে, তুমি মরে গেলে কে দেখত, এই ভেবে বাড়ীতে লিখবে আমার এখন সময় নেই আর আমি গিয়েই বা কি করব। নিশ্চিন্ত মানে ভগবান ছাড়া অপর কোন চিন্তা থাকবে না। সংসার সব গুছিয়ে, সবায়ের ওপর কর্ত্তব্য

শেষ ক'রে সংসার ছেড়ে বেরুব, এ ভাবলে কখন এ রকম হিসেব ক'রে সংসার গোছানও হবে না আর বেরুনোও হবে না। নেহাৎ কর্ত্তব্য টুকু বজায় ক'রে, যে যার প্রালব্ধ ভোগ করবেই, এই ভেবে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে, তাতে যেটুকু সহজে গোছান গেল ভাল, বাকীটার জন্যে কোন বাসনা বা চিন্তা না রাখা উচিত।

ভক্তরাজ। অনুভূতির দরকার কি ?

ঠাকুর। অনুভূতি জ্ঞান রাজ্যের জিনিষ। যেটা আকাঙ্খিত বস্তু সেটা দেখলেই আনন্দ হ'ল। দুই প্রকারে গতি করে, এক নিয়ে যাওয়ায়. আর নিয়ে যায়; নিয়ে যাওয়ায় মানেই নীতি বল এল, এই রকম ক'রে যাও, এর পর এই অনুভূতি হবে, এর পর এই দেখবে, এই সব ব'লে বুঝিয়ে অনেক সময় ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে গুরু জোর ক'রে নিয়ে যায়। সাধন মানে বল, জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে, মন যেতে চাচ্ছে না তবু জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে, এ হ'ল জ্ঞান মার্গের সাধনা। আর, নিয়ে যায় বললে নীতি ভেঙ্গে দেয়, তখন সে গুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে গা ঢেলে দেয়, তখন আর যাও বলতে হয় না,. যেমন স্রোতের মুখে আপনি টেনে নিয়ে যায়, তার সাধন, ভজন, নীতি বল কিছুরই দরকার হয় না; তখন থাক বললেও থাকতে পারে না, গতি করতে করতে অনুভূতি এলেও সে সেদিকে লক্ষ্যই রাখে না। কারণ সে ত ও সব কিছু দেখছে না। নীতি নিয়ে যেতে গেলেই সব বাসনা ত্যাগ করতে হবে, এখন তাঁর হাত তিনি যা করেন এ দোহাই দোয়া চলবে না। আসলে মূল হাত বাস্তবিকই তাঁর, কিন্তু যখন আমিত্ব দিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা কর তখন বাসনা ছাডবার জন্যে নিজে চেষ্টা করবে না কেন ? এর বেলা তাঁর ওপর ফেলছ কেন ? যদি ঠিক জান, যদি ঠিক বোধ থাকে যে সবই তাঁর হাত তবে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, তাঁকে পাবার আবার চেষ্টা কর কেন ? কিন্তু প্রেমে বাসনা ত্যাগ করতে হয় না, সৎ বাসনা দিয়ে

অন্য বাসনা তাড়াতে হয় শেষে সেটাও চ'লে যায়, মোক্ষ মানেই বাসনা নিবৃত্তি।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে, সঙ্গই প্রধান। সদগুরু অনেক সময় তাঁর ওপর কি পরিমাণ ভালবাসা আছে, কি পরিমাণ ত্যাগ করতে পেরেছে, কি পরিমাণ দেহসুখ প্রভৃতি অধীন করেছে এই দেখবার জন্যে নানা ভাবে নানা কঠোরতা দিয়েও পরীক্ষা করেন। কার কি পরিমাণ হ'ল মাপবার তোমার দরকার কি? তুমি নিজের মাপ ঠিক রাখ, তুমি নিজে কতটা আমিত্ব নষ্ট করতে পেরেছ, কতটা স্বার্থ ত্যাগ করতে শিখেছ, কতটা আপন করতে শিখেছ এই দেখ এবং কিসে এই গুলো বাড়িয়ে নিজেকে ঠিক করতে পার কেবল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে গুরু সঙ্গ ক'রে যাও। তিনি কাকে কি বলছেন, কাকে কি ভাবে চালাচ্ছেন সে বোঝবার শক্তি আছে কি? কোন্ অবস্থায় পড়লে কার কি রকম শক্তি থাকে সে তিনি বোঝেন তাই তিনি তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে দেখেন তার বাস্তবিক কতটা এগুলো। গুরু সঙ্গ আর গুরুতে বিশ্বাস প্রধান জিনিষ, তাতে যত কাজ হয় তত আর কিছুতেই হয় না। গুরুতে ঠিক নিষ্ঠা এলে নিজের আমিত্ব নষ্ট হয়ে যায়; আমিত্ব নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুতে ঠিক বিশ্বাস থাকে না। এক রাজপুত্র সব ছেড়ে গুরু গৃহে আছে, সে রাজপুত্র ব'লে গুরু তাকে কাঠ কাটা, জল তোলা প্রভৃতি কাজ দেন না, তাতে অপর শিষ্যরা গুরুর কাছে কত বলত, আপনি ওকে কিছু কাজ বলেন না শুধু আমাদের কাজ দেন। গুরু এই কথা শুনে বললেন আমি যাই করি না, তোমাদের দেখবার দরকার কি? তোমাদের যা বলি তোমরা তাই ঠিক অবিচারে পালন ক'রে যাও, ওকে কাজ দেওয়া না দেওয়া আমি বুঝব। এই ভাবে কিছু দিন গেলে গুরু একদিন রাজপুত্রকে বললে আজ কিছু কাঠ কেটে নিয়ে

এসো। রাজপুত্র কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটতে গিয়ে হাতের একটা আঙ্গুল কেটে ফেল্লে। তখন সে গুরুর কাছে এসে বল্লে দেখুন আপনার জন্যে কাঠ কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কেটে ফেল্লুম, আপনি আমার আঙ্গুল ঠিক ক'রে দিন নইলে আমি এখানে থাকব না চ'লে যাব। গুরু বল্লেন, দেখ গুরুতে অবিশ্বাস এনো না, গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রাখ সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজপুত্র শুনবে না, সে তবু বল্লে না ওসব শুনতে চাইনা, আপনি আমার আঙ্গুল ক'রে দেন ত দিন, নইলে আমি চল্লুম। গুরু তখনও বলছেন গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রাখ মঙ্গল হবে। রাজপুত্র কিছুতেই শুনলে না, আরও দু তিন বার গুরুর কাছে আঙ্গুল চাইলে গুরু সেই একই জবাব দিলেন, গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রক্ষা কর সব মঙ্গল হবে। তখন রাজপুত্র সেখান থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল, পথে যেতে যেতে এক দল ডাকাত তাদের কালীপূজায় নরবলির জন্যে মানুষ খুঁজতে বেরিয়ে তাকে দেখে ধ'রে নিয়ে গেল এবং আজ ভাল বলি পেয়েছি ব'লে রাজপুত্রকে ৺কালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে হাড়িকাটে ফেললে। এমন সময় দেখলে তার একটা আঙ্গুল নেই, কাজেই ক্ষত জিনিষ ত বলি হবে না ব'লে ছেড়ে দিয়ে বললে, যা পালা বড্ড বেঁচে গেলি। তখন রাজপুত্র গুরুর কাছে ফিরে এসে বললে আমি আপনার কথায় বিশ্বাস না ক'রে বড় অন্যায় করেছি, আঙ্গুলটা কাটা ছিল ব'লে আমার আজ প্রাণ রক্ষা হ'ল, আমায় ক্ষমা করুন আর কখনও আপনার কথার ওপর বিচার করব না। তা দেখ, গুরুর কাছে থাকায় আঙ্গুলের ওপর দিয়ে জীবন সংশয় টা কেটে গেল, ছোট বিপদ দিয়ে বড় বিপদ কেটে গেল। গুরুতে ঠিক বিশ্বাস এলে, ঠিক ভালবাসা এলে গুরু যেটা বলেন সব ভাল লাগে; তখন কড়া কথাও মিঠে লাগে, তখন 'গুরু দুরজন কহে কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া'। যার গুরুতে ঠিক নিষ্ঠা আছে সে কঠোরতাকে কঠোরতা ব'লেই গ্রাহ্য করে না, সে আনন্দ চিত্তে সব সহ্য ক'রে যায়। গুরু অনেক সময় বেশী কঠোরতা দিয়ে

ভাবটা পাকা করিয়ে নেন, কারণ ভালবাসার স্বভাবই হচ্ছে যাকে ভালবাসি সে আরও ভাল হোক, কেবল তারই মঙ্গলের জন্যে যা কিছু করেন, তাঁর নিজের ত কিছু স্বার্থ নেই। এটা অনেক সময় ধরতে পারে না, আর পারবেই বা কি ক'রে। অবস্থা না এলে কি সব কাজের ভাব ধরতে পারে? তাই বলছে অবিচারে গুরু বাক্য পালন ক'রে গুরুতে একনিষ্ঠ হ'য়ে গতি করলে মঙ্গল হতেই হবে।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী মাত্র ছেলে ছিল, ছেলেটী অতি সৎ, শিক্ষিত, বিনয়ী তথাপি ব্রাহ্মণ প্রায়ই তাকে তিরস্কার করত; এতে ব্রাহ্মণীর মনে একটু দুঃখ হত, সে ভাবত ছেলেটী এত ভাল তবু উনি এত বকেন কিন্তু সাহস ক'রে ব্রাহ্মণকে বলতে পারত না। ছেলেটীও ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে একদিন ভাবলে আমি এত চেষ্টা করি, পিতা মাতার কথা কখনও অমান্য করিনি, তাঁদের এত ভক্তি শ্রদ্ধা করি তবুও ত পিতা বকতে ছাড়েন না, তা দূর হক, এই পিতাকে এক দিন শেষ করব। এই ঠিক ক'রে একদিন রাত্রে একটী ধারাল কাটারী নিয়ে পিতাকে কাটবার উদ্দেশ্যে ঘরের মটকায় উঠেছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের মটকা ত ভাল নয়, ফাঁক হয়ে গিয়ে সেখান থেকে চাঁদের আলো এসে ব্রাহ্মণের গায়ে পড়েছে, তাই দেখে ব্রাহ্মণী বললে দেখ কেমন সুন্দর চাঁদের আলো। তখন ব্রাহ্মণ বললে সে কি, এই চাঁদের আলো দেখে তুমি এত সুন্দর বলছ? তোমার ছেলে যে এই চাঁদের চেয়েও কত সুন্দর। ব্রাহ্মণী বললে কই তা ত বুঝতে পারি নি, তুমি ত ছেলেকে এক দিনও ভাল বলনি বরং প্রায়ই বক। ব্রাহ্মণ বললে দেখ তোমার ছেলে খুবই ভাল কিন্তু আমি পিতা, আমি তাকে ভালবাসি, আমি চাই সে আরও ভাল হ'ক, তাই তার মঙ্গলের জন্যই তাকে প্রায়ই বকি। ছেলে মটকার ওপর থেকে দুজনের এই কথা শুনে অবাক হয়ে সেখান থেকে নেমে এসে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল, আজ না বুঝে কি অন্যায় কাজই করতে গিয়েছিলুম, আমি এই পিতাকে কাটতে

গিছলুম! ভগবান নেহাৎ রক্ষে করেছেন নইলে আমি ত আর একটু হলেই এই গর্হিত কার্য্য ক'রে ফেলেছিলুম। এই চিন্তায় মন খুব বেশী উদ্বিগ্ন হওয়ায় সে সমস্ত রাত্রি আর ঘুমুতে পারলে না, ছটফট করতে লাগল। সকালে উঠে আগে পিতা মাতার কাছে গিয়ে পিতার চরণে প'ড়ে সমস্ত ঘটনা ব'লে মাপ চাইলে 'আমি না বুঝে আপনাকে কাটতে গিছলুম আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন'। পিতা শুনে বললেন আচ্ছা নিজেই যখন অনুতপ্ত হয়েছ ভাল, তবুও কিছু সাজা নেওয়া দরকার এই ব'লে তিনি ছেলেকে এক বৎসর তাঁর কাছ ছেড়ে শ্বশুরালয়ে বাস করতে আদেশ দিলেন।

সঙ্গে যেমন আপন ক'রে নেয় এমন আর কিছুতে হয় না; তাই পরমহংসদেব সব আপন ক'রে নিয়ে ডাকতেন, আর এই আপনত্বে সবাই মায়ার বস্তু ছেড়ে তাঁকে ভালবেসে ছুটত। তিনি সকলকে এই আপন ক'রে ভালবেসে দেখিয়ে দিতেন কি ক'রে ভালবেসে পরকে আপন করতে হয়। আপনি আচরি কর্ম্ম অপরে শেখায়, নিজে না জানলে, না পারলে অপরকে সহজে শেখান যায় না। তাই তিনি এত আপন ক'রে নিতেন, না এলে কেঁদে ফেলতেন, কত ভালবাসা দেখ দিকি!

দ্বিজেন গাহিল

প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে,
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে তরল হ'লে।
অবিরাম হয়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
তর তর অবিরত, জয় জগদীশ ব'লে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, ঐ মোহ উপাড়ি ভাঙ্গ সমূলে,
চেও না কোন কূলে, নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
জলে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে।
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে, তাদের টেনে নে যায় একেবারে
ভেসে যায়, ভাসিয়ে নে যায়, সেই পরিনাম সিন্ধু জলে।

চতুর্থ ভাগ—দশম অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার, ৪ঠা ভাদ্র ১৩৪০ সাল
ইং ২০শে আগষ্ট ১৯৩৩।

সকালে কালীঘাট থেকে ফেরবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, তপেন, পুন্তু, কালু, ললিত, হরপ্রসন্ন, দ্বিজেন, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন সরকার, তারাপদ. মৃত্যুন, মতি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অমল, নন্দ, বিভূতি, প্রফুল্ল, ভোলা ও অভয় প্রভৃতি অনেকে আছে।

জিতেন। কালুর ভাব হচ্ছে, আপনাকে যে ঠিক ভগবান ব'লে ভাবে তা নয়, তবে আপনি ভালবাসেন ব'লে আসে।

ঠাকুর। এ ত ঠিকই সরল কথা বলেছে। কা'রই বা ঠিক ভগবান ব'লে বোধ আছে? মুখে হয়ত অনেক বড় বড় কথা বলবে কিন্তু ভগবান বললে কি বোঝায়, কি কি শক্তি থাকলে ভগবান হয় এ সব কিছুই জানে না, ভগবান উপলব্ধিও হয় নি, কাজেই তার ভগবান কথা বলার মূল্য কি? না বুঝে শুধু ভাষা বলা ত কপটতা; আমিও এই সরল ভাব ভালবাসি, কপটভাবে বড় বড় কথা বললেও ভাল লাগে না। তা ছাড়া, আমি সাধারণ অতি সাধারণ ভাবেই তোমাদের সঙ্গে মিশছি কারণ আমি তোমাদের এই সরল প্রাণের ভালবাসা টুকুই চাচ্ছি, আমি ত তোমাদের কাছে ভগবান হতে চাচ্ছি নি, তা চাইলে দুটো একটা শক্তি নিয়ে, বিভূতি নিয়ে, তোমাদের কাছে ভগবান সেজে বসতুম। তোমরা সরল ভাবে ভালবেসে এস এইটেই খুব ভাল, আমারও এই ভাবটা ভাল লাগে, এই ভালবাসা যত জোর পড়বে তত বাসনা কামনা সব ছেড়ে আসবে, শেষে পূর্ণ ভালবাসা এলে মন স্থির হয়ে যায়। যারা এই ভালবাসা দিয়ে গতি করবে তাদের গুরুকে সরল ভাবে ভালবাসতে পারলেই আপনা

আপনি কাজ হয়ে যাবে কিন্তু যারা সাধন ভজন করবে, তাদের গুরুকে খুব বড় ধারণা ক'রে নিয়ে সাধনা করা দরকার, 'গুরুতে হইলে মানুষ জ্ঞান কি হইবে তার সাধন ভজন'? এর কারণ হচ্ছে সাধন ভজন করবার সময় একটা লক্ষ্য ধ'রে যেতে হবে ত, তা এই লক্ষ্য যত উচ্চ হবে তুমি সেই উচ্চের সাধনা ক'রে মনকে তত উচ্চে তুলতে পারবে। তোমার লক্ষ্য যদি নীচু হয় তা হ'লে সেই অবধি উঠেই তুমি ক্ষান্ত হয়ে গেলে, আর বেশী উঠবার আকাঙ্খা না থাকায় চেষ্টাও করবে না, কাজেই উঠতেও পারবে না, তাই গুরুকে ভগবান ভেবে অর্থাৎ ধারণার সর্ব্বোচ্চ স্থানে তাঁকে বসিয়ে সাধনা করার নিয়ম: এই সাধনা আবার দুই প্রকারের, কেউ বা গুরুকে ভগবান ধ'রে নিয়ে গতি করে আবার কেউ তাকে দালাল বিবেচনা করে। দালাল বিবেচনা করলেই সাধারণ মানুষ ভাব আনলে, তবে, সে পথ জানে, চলবার নিয়ম জানে, তাকে ধরলে আমার ঠিক পথে যাওয়া হবে এই ভেবে গুরুর উপদেশ মেনে চলে। তবে, ঠিক এভাবে চললেও আস্তে আস্তে জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পথ বুঝতে পারবে ও সেই মত গতি ক'রে শেষে পৌঁছুতে পারবে; এ ভাবে গুরুর ওপর বিশ্বাসটা প্রথমে তত জোর থাকে না ব'লে এগুতে বিলম্ব হয়; ভালবাসা পড়লে নিজের মত হাত পা ওয়ালা আর এক জনকেই সংসারের অপর সকলের মত ভালবাসতে আরম্ভ করে, জোর ক'রে কোন কাজ করতে হয় না। এই ভালবাসাই বেড় দিয়ে একটু বিচার ক'রে রক্ষা করলে ক্রমশঃ জোর পড়লে আর দেখতে হয় না, আপনি টেনে নিয়ে যায়। গোড়ায় বেশ বেড় দেওয়া দরকার, যাতে যেটুকু ভালবাসা পড়ল সেটুকু না ভেঙ্গে যায়; এই সময় বিরুদ্ধ সঙ্গ থেকে তফাৎ থাকা দরকার, বিশেষতঃ পরের কথায়, নিজে না দেখে সংশয় এনে ছেড়ে দেওয়ার মত আর মূর্খতা নেই। তুমি গুরুকে দেখেই এলে, তাঁর কাছে এসে যাদের সঙ্গে চেনা হ'ল তাদের কথাতেই এমন বিশ্বাস হ'ল যে যাঁর দ্বারা তাদের চিনলে তাঁর সম্বন্ধে ওরা

যেটা বলছে সেটা না দেখেই তাঁর ওপর অবিশ্বাস আনলে! তাদের দরকার কি? তুমি নিজে দেখ, যে জন্যে তাঁর কাছে এসেছ তোমার সে দিকে কিছু লাভ হচ্ছে কি না, তোমার বাসনা কামনা কিছু কমল কিনা, রিপু অধীন হ'ল কি না, মনের শক্তি বাড়ছে কি না। যদি এদিকে তোমার একটুও কিছু লাভ দেখতে পেয়ে থাক ত পরের কথায় ছাড় কেন? লাভ কিছু বুঝতে না পারলেও লোকসান যদি কিছু না হয়ে থাকে তা হলেও বা ছাড় কেন? অপরের কথায় তোমার দরকার কি? তোমার ভাল না লাগে তুমি চ'লে যেও, ভাল লাগে থেকো, তার জন্যে অপরের কথায় দরকার কি? তোমরা যখন এখানে আসছ, তখন তোমাদের কিছু ভালবাসা নেই বলতে পারি না, তোমরা নেহাত সে দলে নও যে কিছু দূরে আমার নাম শুনে দেখতে আসছ পথে শুনলে মন্দ নয় কিন্তু নীচে এসে যেই শুনলে 'না কিছু নয়' অমনি এত কষ্ট ক'রে এত খরচ ক'রে নীচে পর্য্যন্ত এসেও না দেখা ক'রে ফিরে গেলে। এই ভালবাসা রক্ষা ক'রে গতি করলেই ফল পাবে। ভালবাসায় আটকে রাখবে, সহজে ছাড়তে দেবে না। তখন কিছু সংশয় এলেও বিচার ক'রে সংশয় তাড়াতে পারবে, কিন্তু ভালবাসা না থাকলে যতক্ষণ প্রতিপক্ষ বিচার থাকবে ততক্ষণই দাঁড়াতে পারবে, যেই বিপক্ষ বিচার আসবে অমনি সংশয় এনে তোমায় সরিয়ে দেবে, তাই শুধু বিচার নিয়ে গুরুর কাছে এলে গতি করতে পারবে না; সব চেয়ে সোজা হচ্ছে গুরুকে ভালবেসে তাঁর সঙ্গ ক'রে গতি করা, তাও যতক্ষণ না তাঁর ওপর একটু জোর ভালবাসা পড়ে ও তাঁর ওপর বিচার ক'মে যায় ততক্ষণ তাঁর সব ভাব বুঝতে পারবে না; ততক্ষণ তাঁর আদেশ অনুযায়ী সঙ্গ করতে হয়, পরে মন ঠিক হয়ে গেলে সব ভাবই ভাল লাগবে, তখন সকল সময়ে সঙ্গ করা চলে। মন দেওয়াই আসল কাজ, যেটুকু ভালবাসবে মন দিয়ে সরল ভাবে ভালবাসবে, মনে যে ভাব ঠিক ভাল লাগবে সেই ভাব নিয়েই ভালবাসা রক্ষা

করলেই হবে, জোর ক'রে ভগবান বলবার দরকার নেই, আমি সে বলা চাই না, তবে যার সে ভাব এসে গেছে সে আলাদা। যোগ-মায়া (মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা একটী ব্রহ্মচারিণী) বলে 'আমি মাকে দেখবার জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছি, এমন কি মরতে গেছি তখন আপনাকে চিনি নি জানি নি, তবুও সেই অবস্থায় যখন আপনাকে পেয়েছি, আর আমার মন এত পড়েছে, তখন আপনিই আমার সেই 'মা', আমার আর কোন আকাঙ্খা নেই, আপনাকে পেয়েই আমি যখন তৃপ্ত হয়েছি তখন আর আমার কিছু দরকার নেই।' তার যখন এ ভাব হয়েছে ভাল, এটা তার যথার্থ ভাব, লোক দেখান শুধু মুখের কথা নয়, কারণ তার ভেতরে কিছুই নেই, ভোগ বল, দেহ সুখ বল, রসনা তৃপ্তি বল, কোন বাসনা বল কিছুই তার নেই; সে নির্ভীক, সর্ব্বদাই বালকের মত আনন্দে রয়েছে; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, হিংসা, দ্বেষ, কপটতা কিছুই তার নেই; বক, গালাগাল দাও, হাঁসছে। মেয়ে ভক্তদের মধ্যে যোগমায়া এবং সুরূপার (মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা একটী কুমারী) ভেতরে ভোগ ব'লে কোন জিনিষ নেই, তাদের দুজনকে অসৎ সংসারী বেটা ছেলের সঙ্গে ছেড়ে দিলেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে ওদের কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু অপর অল্প বয়সী মেয়ে ভক্তদের কাউকে, অসৎ সঙ্গ ত দূরের কথা, সৎ সংসারী বেটা ছেলেদের সঙ্গেও মিশতে দিতে রাজী নই পাছে পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে প'ড়ে যায়, কারণ তাদের বৃত্তি গুলো ত সব মরেনি, সংসারীদের সঙ্গে মিশলেই আবার তার কার্য্য করবে। তাদের ঠিক কচ্ছপের ভাব, কচ্ছপ মানুষ দেখলেই যেমন হাত পা গুড়িয়ে ভেতরে পোরে, আবার নিজের দলের কাছে গিয়ে হাত পা বের করে, সেই রকম যতক্ষণ আমার কাছে থাকে ততক্ষণ সংসার ইত্যাদি সব বেশ ভুলে ঠিক ভাবে আছে হয় ত, কিন্তু ভেতরে বাসনা সব যায় নি ব'লে যেই এখান থেকে বেরিয়ে যায় অমনি সে গুলো আবার মাথা ঠেলে ওঠে এবং সংসারীদের সংস্পর্শে এলেই

যে যার কাজ ঠিক করতে থাকে; তাই সাধন অবস্থায় যে যে জিনিষে মনের চাঞ্চল্য হয় সেই সেই জিনিষ থেকে তফাৎ থাকা দরকার; এইটাই হ'ল সাধনের বেড়। ভালবাসায় গতি করবার সময় অন্য সাধনা, কঠোর নীতি পালন প্রভৃতি নেই বটে কিন্তু সঙ্গই হচ্ছে ঐ পথের প্রধান সাধনা, তাই এ পথেও প্রথম প্রথম ভালবাসাটা বজায় রাখবার জন্যে বেড় দেওয়া দরকার।

কালু। আমরা যখন 'মা' 'মা', ব'লে ডাকি তখন বিশ্বাস আছে ত তিনি ঠিক শুনবেন? কিছু বিশ্বাস আমাদের আছেই।

ঠাকুর। এ ত হ'ল সাধারণ জীবত্ব বিশ্বাস। ষ্টেশনে যাবার জন্যে মোটর চড়লে, তখন তোমার বিশ্বাস আছে যে মোটরে গেলে এই সময়ের মধ্যে ট্রেণ ছাড়বার আগে পৌছুবে, পথে হয়ত মোটর খারাপ হয়ে গেল তুমি ট্রেণ পেলে না; এটা ত জানতে না বা ভাবও নি। তুমি ঠিক পৌছে ট্রেণ ধরবে এই বিশ্বাস নিয়েই গিয়েছিলে, এ বিশ্বাস ত সকলেরই সব সময় আছে, তা না থাকলে ত সংসারে এক পা চলতে পারবে না, কোন কাজই করতে পারবে না। আর যদি তোমার সে স্থির বিশ্বাস থাকে যে মাকে ডাকছি, মা শুনবেনই, তখন না ডেকে থাকতে পারবে না; মা শুনবেন, কি না শুনবেন, এ চিন্তাই উঠবে না। যেমন ছোট ছেলে 'মা' 'মা' ক'রে কাঁদে, মাকে ডাকলে মা শুনবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে সে মাকে ডাকে না, সে মাকে না ডেকে থাকতে পারে না। সাধারণ সংসারীরা প্রথমে জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি নিয়ে এই পথে আসবে, কিছু বিশ্বাসও রাখতে হবে আবার কাজও করতে হবে।

পুতু। অনুরাগ কি ক্ষণিক হয়ে আবার চ'লে যেতে পারে?

ঠাকুর। অনুরাগ ঠিক এলে আর যায় না, তবে অনুরাগের প্রথম অবস্থায় সেটা ভেঙ্গে যেতে পারে। দুই উপায়ে প্রথম অনুরাগ ভেঙ্গে যেতে পারে. এক, নিরুপায় হ'য়ে অর্থাৎ আমি এত কষ্ট করছি, এত কঠোর করছি তবু যখন তোমায় পেলুম না তখন আর আমি তোমায়

পাব না, এই হতাশ হয়ে ছেড়ে দেয়, যেমন ছেলে ম'রে গেলে প্রথমে খুব শোক করে, পরে যখন দেখে যে সে ত আর কিছুতেই ফিরবে না, তখন হতাশ হয়ে শোক নিবারণ করে। আর এক, অপরে বুঝিয়ে নিরস্ত করে, অর্থাৎ যার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশী সে এসে বুঝিয়ে দিলে যে ও পথে যাচ্ছিস ও কিছু না এবং অনেক উদাহরণ ও যুক্তি তর্ক দিয়ে তোমাকে লইয়ে নিরস্ত করালে। এখানে তোমার চেয়ে তার মনের জোর বেশী না থাকলে তোমায় নিরস্ত করাতে পারবে না। মনের শক্তির ওপর জিনিষটা স্থায়ী হয়।

পুত্তু। এক এক সময় তাঁর নাম করতে বেশ ভাল লাগে, আবার এক এক সময় কোন বিশেষ কারণ নেই, অথচ নাম করতে ভাল লাগে না।

ঠাকুর। যখন বায়ু সরল থাকে সত্ত্বের ভাব আসে, তখন নাম করতে কিছু আনন্দ পাও ব'লে ভাল লাগে আর বায়ু অসরল থাকলে বিরক্ত লাগে। যখন নাম করতে আনন্দ পাও, তখন মন ঠিক লাগে এবং কাজ বেশী হয়। এই আনন্দ পাওয়া যায় ব'লেই সংসার ছেড়ে, বেরুতে পারে; দুই ভাবে লোকে সংসার ছাড়ে, যে এই রকম আনন্দ পেয়ে ছাড়ে, সে আর ফেরে না কারণ সংসারের চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছে ব'লে সংসার ছেড়ে এসেছে, কাজেই এর চেয়ে আবার বড় আনন্দ না পেলে ত এটা ছেড়ে যাবে না, আর যে সংসারে দুঃখ পেয়ে সুখের আশায়, শান্তি পাবার জন্যে সংসার ছেড়ে ছোটে, তাকে ভয়ানক কঠোর করতে হয়, তখনও শান্তি পায় নি, অথচ দেহ সুখ প্রভৃতি নষ্ট ক'রে অগ্নি তরবারির মধ্য দিয়ে গতি করতে হবে, তাই সৎ গুরু ছাড়া এ পথে ধৈর্য্য রেখে চলা বড় শক্ত, তা ভিন্ন হয় ত কঠোরতায় প'ড়ে আবার ফিরে আসতে পারে। সাধক সব বাসনা ছাড়তে ইচ্ছা করে কিন্তু কোথায় এক কোণ থেকে বাসনা ঠেল মেরে উঠল। কর্ম্মে এ সব বাসনা তুলে দেয়, বহু চেষ্টা করলেও সহজে এর থেকে নিস্তার নেই তাই

রামপ্রসাদ সাধক অবস্থায় গেয়েছিল 'তুমি মা থাকতে আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি' অর্থাৎ জাগা কি না, এত চেষ্টা সত্ত্বেও বাসনা চোরের মত ঢুকে পড়ল। যত মন স্থির হয়ে আসবে তত বাসনা কম ঠেল মারবে অর্থাৎ বাসনা এলেও আগের মত অত জড়িয়ে ফেলতে পারবে না আর পূর্ণতা এলে মন শান্ত হয়ে যায় তখন বাসনা কামনা হয় ত আসছে যাচ্ছে, সে দিকে কোন নজরই নেই, আর তারাও জড়াতে পারে না। এর দুটো অবস্থা, মন প্রকৃতির পারে চ'লে যায়, তখন সৃষ্টিই থাকে না অর্থাৎ ভেতরে সৃষ্টির কোন বস্তুই নেই, তখন সাধক নিজেকেই হারিয়ে ফেলে, সে কেবল নিজেই উপভোগ করে, তার দ্বারা কোন লোকশিক্ষার কাজ হয় না। আর, মন প্রকৃতির ভেতর আছে অথচ প্রকৃতি ধরতে পারে না, এই অবস্থায় লোকশিক্ষা চলে। গুরু শিষ্যের ঠিক সম্বন্ধ হচ্ছে সেনাপতি আর সৈন্য। যুদ্ধের সময় যেমন সৈন্য সেনাপতির হুকুম অবিচারে পালন করে, মরবে কি বাঁচবে তাও ভাবে না, তেমনি ঠিক শিষ্য হ'লে গুরু যা বলবে তাই শুনবে কোন চিন্তা রাখবে না; এটা গোছান, ওটার ব্যবস্থা করা, ভাল মন্দ কিছুই তার থাকে না, সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, গুরুর হুকুম পাওয়া মাত্রই কাজে লাগে। এই হ'ল ঠিক নির্ভরতা, ত্যাগ না হলে এ ভাব আসে না, তখন যত ধাক্কা খাক স্থির আছে, দুটো কাঁটা একবার ঠিক এক হয়ে আছে, তা ভিন্ন, ত্যাগের পথে গতি করবার সময় বাসনা উঠলে সেটাকে অধীন ক'রে রাখতে হবে। এ ত কম মনের শক্তির কাজ নয়। শত্রু ত রয়েছেই, থাকলেও শত্রুকে অধীন ক'রে রাখতে পারলেই তোমার জয়।

ভক্তরাজ। সদ গুরু ধ'রে থাকলেও কর্ম্ম বৈগুণ্যে হয় ত অবিশ্বাস এল, তখন তিনি ত আবার এই অবিশ্বাস নষ্ট ক'রে ঘুরিয়ে আনবেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কারণ সদগুরু ত্যাগী, তাঁর ত লাভ লোকসান কিছুই নেই। তিনি ত আর কোন লাভের আশায় তাকে ধ'রে নেই। তার বিশ্বাস থাকলেও যে তাঁর কিছু লাভ হ'ল তা নয়, আবার তার অবিশ্বাস এলেও যে তাঁর কিছু লোকসান হ'ল তাও নয় তবে তাকে ভালবাসেন ব'লে সে এই অবিশ্বাস জনিত যে অশান্তি ভোগ করে তার কিছু এসে হয় ত তাঁকে কিছু দুঃখ দিলে নইলে তাঁর আর কি? বিশ্বাস ত ফের আসতেই হবে তা ভিন্ন ত কিছুই হবে না, ***এটা আমি বেশ জোর ক'রে বলতে পারি যে একচুল পরিমাণ গুরুতে অবিশ্বাস থাকলে সমস্ত দুনিয়া এক হয়ে দাঁড়ালেও তার কিছুতেই উন্নতি হতে পারে না।*** সদগুরু তাকে ভালবাসেন, তাকে ধ'রে আছেন, আর সেও তাঁকে কিছু ভালবাসে নইলে তাঁর কাছে আবার আসবেই বা কেন? কাজেই তাকে ফিরতেই হবে এক দিন। যত দিন কর্ম্ম আছে তত দিন ত ঘুরতেই হবে; তবে তখনও নিয়মিত সদগুরুর সঙ্গ করলে চট্ ক'রে কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে আবার শীঘ্র ফিরে আসতে পারে। সদগুরুর আবির্ভাবে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হয়, সকলেরই কিছু কিছু কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে সকলেই কিছু কিছু এগিয়ে যায় তবু যারা তাঁর কাছে থাকবে, তাঁর সঙ্গ করবে, তাদের খুব শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়, যেমন ভিজে কাঠ যত আগুনের কাছে থাকবে তত শীগ্‌গির শুকিয়ে যাবে। যারা দেহ মন প্রাণ দিয়ে সঙ্গ করে তারাই সব চেয়ে নিকট, তাদের চট্ চট্ ক'রে সব ম'রে আসে, মন দিয়ে সঙ্গ করলেই কাজ হবে। সে হিসাবে তাঁর কাছে না এসেও দূরে থেকে তাঁতে মন রাখলেও কাজ হতে পারে, আর সাধন মানেই গুরু উপদেশ দিয়ে সেই মত চলবার জন্যে গুরুই ত দূরে নির্জ্জনে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সংসারে এত বিরুদ্ধ ভাব, এত বিরুদ্ধ জিনিষ থাকে যে তার ভেতরে থেকে, সে সব থেকে মনকে তুলে সদগুরুতে লাগিয়ে রাখা সংসারীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, সংসারে পঞ্চাশটা পেছলের মধ্যে পা ঠিক রেখে

চলা অত্যন্ত কঠিন, একটায় না একটায় পিছলুবেই, বিশেষতঃ যারা সম্পদশালী, যাদের তার ওপর আবার পাঁচটা বিষয় চিন্তা করতে হয়, মান সম্ভ্রম বজায় রাখবার দিকে নজর দিতে হয়, দশটা বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে এবং খোসামুদের সঙ্গে ব্যবহার রাখতে হয় তাদের পক্ষে ত আরও অতি কঠিন। মনের স্বভাব যখন যেটায় পড়বে সেইটেই ধ'রে নেবে। আর, এক সঙ্গে কখনও দুটো জিনিষকে ঠিক ভালবাসতে পারা যায় না, একটায় জোর পড়লেই পাল্লার মত আর একটায় সেই পরিমাণ ক'মে আসতেই হবে। ভালবাসার লক্ষণ হচ্ছে, যাকে ভালবাসা যায় তাকে না দেখে থাকতে পারে না, সর্ব্বদা তার কাছে, তার ভাবে থাকতে ভাল লাগে, কাজেই তার কাছ থেকে দূরে গিয়েও কিছু সময়ের জন্যে ভাব রক্ষা করতে গেলে, সেই সময়ে অপর কোন ভাবে কাজ করতে পারবে না কারণ ভাব মনকে অধিকার ক'রে বসে। তখন দূরে থাকলেও মনটা তাঁর ভাবে থাকায়, তাঁরই কাছে প'ড়ে থাকল ত, তবে এটা হওয়া বড় শক্ত অনেক মনের শক্তির দরকার, অথচ সদগুরুর কাছে যতক্ষণ থাক ততক্ষণ ঢের সহজে সব ভুলে মনটা লাগিয়ে রাখতে পার কারণ তাঁর কাছে কেবল সৎ নীতি, সৎ ভাব, ত্যাগের কথা, ত্যাগের ভাব ছাড়া আর কিছুই থাকে না ব'লে মনটা খুব সহজে তাঁতে রাখা যায়। যদি কেউ দূরে থেকে, সংসারের মধ্যে থেকেও পারে ত ভাল কিন্তু জানি না কেউ, বিশেষতঃ কোন সংসারী, এ রকম পারে কি না। যার মন ঠিক তেলা কাগজের মত হয়েছে তার কথা অবশ্য আলাদা, সে যে ভাবেই থাকুক কালীর দাগ পড়বে না কোথাও একটু সাদা জায়গা পেলেই হিজি বিজি যা তা লিখে বসবে। তাই গোড়ায় কিছু সংস্কার ও বন্ধন দিয়ে আটকান দরকার, এইটেই সদগুরু সঙ্গ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর ক'রে সঙ্গ করলে কিছু সদভাব লেগে যাবেই, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও বিরুদ্ধ ভাবে ডুবতে পরলে না, এটাও ত হ'ল, এও বড় কম লাভ নয়। সদগুরুর সঙ্গ যখন ভাল লাগবে,

সদগুরুতে যখন ভালবাসা পড়বে, তখন তাঁর কাছে যাবার সময় হ'লে প্রাণটা ছট ফট করবে। টাকাকে ভালবাস ব'লে সংসার বজায় রেখে, ঝড় হোক, জল হোক ঠিক অফিস যাচ্ছ, কামাই কর না, বাড়ীতে ছেলের অসুখ, স্ত্রীর অসুখ কিছুই গ্রাহ্য কর না, এমন কি নিজের ছোট খাট অসুখও তুচ্ছ ক'রে অফিসে ছুটী নাও না। তেমনি সাধুসঙ্গে এই রকম একনিষ্ঠ নীতি হ'লে বোঝা যাবে যে সংসারের মত ধর্ম্মের দিকেও একটা নীতি বল আছে। কর্ম্ম নিয়ে কর্ম্ম ভোগের জন্যেই এখানে এসেছ, তা কর্ম্ম ভোগ করবে না? অফিসে যখন যাও তখন অফিসের কাজ করতেই যাও, সাধন ভজন করতে যাও না। কর্ম্ম ভোগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে আসতেই হবে, তাই যতটা পার ধর্ম্মের পথে গিয়ে কর্ম্ম সঞ্চয় করাটা যত পার কমাও। ডাক্তার, উকিল, বেশ্যা, দারোগা অর্থাৎ পুলিশ এবং জমিদারের কর্ম্মচারীরা, যারা অপরকে উৎপীড়ন ক'রে টাকা নেয়, প্রভৃতি, যারা কেবল নিজের স্বার্থের জন্যে পরের যা ইচ্ছে হোক, যত কষ্ট হোক সে দিকে দৃকপাত না ক'রে, রোজগার করে তাদের টাকা ভোগ হয় না, প্রায়ই এক পুরুষে চ'লে যায় এমন কি প্রালব্ধে বেশী টাকা এলেও নিজে ব্যবহার করতে পারে না। এই সব অর্থে যে কেবল অশান্তি আসে, তা নয়, বহু কর্ম্ম সঞ্চয় হয়। একে নিজের কর্ম্মের চোটে অস্থির আবার এত কর্ম্ম যাতে না আসে সেই জন্যেই সাধু সঙ্গ করতে বলেছে। তখন এই সব ব্যবসায় শুধু নিজের স্বার্থ রেখে টাকা রোজগার করাটাই যে প্রধান উদ্দেশ্য, এইটে ক'মে আসবে। যত ক্ষণ ভেতরে বাসনা থাকবে ততক্ষণ কি সব ছেড়ে আসা সোজা। আমি তোমাদের ত সব ছেড়ে আসতে বলছি নি, বা তোমাদের বাসনা যায়নি ব'লে দোষ দিচ্ছি নি তবে বাসনা ছাড়বার চেষ্টা করছ, ধর্ম্মের দিকে যাবার ইচ্ছা হয়েছে অর্থাৎ প্রবর্ত্তক অবস্থায় এসেছ এটুকু অন্ততঃ দেখলে আনন্দ হয়, বিশেষতঃ যাদের বয়স হয়েছে, যারা সংসার নিংড়ে খেয়েছে, এমন কি আঁটিটাও চুষে খেয়ে কসি বের ক'রেছে তাদের আর সংসারে জড়িয়ে থাকা

উচিত নয়। অপটু ব'লে অফিস থেকে পেন্সন নিলে কিন্তু সংসার থেকে পেন্সন নেবার সময় হচ্ছে না, তাদের অন্ততঃ যে সময়টা অফিসে কাটত সেই সময় টুকু সংসার থেকে তফাৎ রেখে তাঁর চিন্তায় নিজের পাথেয় জোগাড় করা উচিত। একটা আধটা হয়ত সত্যিই ভালবাসতে পারে কিন্তু সাধারণ সংসার ক্ষেত্রে যতক্ষণ তোমার ভেতরে একটু স্বার্থ পুরণের আশা থাকবে, তত ক্ষণ কেউ ছাড়বে না, আর যেই দেখবে যে স্বার্থ সিদ্ধির আর কিছুই নেই, তখন মেরে তাড়িয়ে দেবে। সংসারে শুধু কি নানা চিন্তা, অপরের কত নোংরা ভাব এসে লাগে, আবার বাসনা একেবারে না গেলে ত সব ছেড়ে বেরুতে পারবে না, তাই যতক্ষণ কিছু বাসনা কিছু মায়া থাকে ততক্ষণ নেহাত যতটুকু সংসার না করলে নয় ক'রে বাকী সময়টা গুরু সঙ্গে কাটাতে পারলেই অনেক হ'ল, তাই কি সোজা কথা, বিশেষতঃ সম্পদ, বিষয়ের ভেতর থেকে ধর্ম্মের দিকে আসবার ইচ্ছা বা যৌবনে স্থির থাকা খুব পূর্ব্ব সুকৃতির লক্ষণ। বাসনাই জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তখন যে, গুরুর কথায় সংশয় আছে তা নয়, গুরুর কথায় বিশ্বাস আছে, তিনি আমার চেয়ে বেশী বোঝেন, তিনি যা বলেন তাই করব, এ সব ভাব ঠিক আছে, তত্রাচ ছাড়তে পারে না। মনের শুদ্ধতার মাত্রা অনুসারে বিশ্বাসের তারতম্য হয়। প্রেমের ভালবাসার স্বভাব হচ্ছে যত ভালবাসা পড়বে তত অপর দিক সব ছেড়ে যাবে। সদগুরু ত্যাগী, তাঁর কোন ভোগের প্রয়োজন নেই, বরং ভোগের জিনিষটা না থাকাই ভাল, কারণ তাতে তাঁর কোন ক্ষতি না হ'লেও সাধারণ লোকের হিংসা হয়। তিনি প্রধান জিনিষ চাইবেন সব ছেড়ে এসো, কিন্তু বললেই ত হবে না, যতক্ষণ কর্ম্ম থাকবে ততক্ষণ কর্ম্মের জন্য সংসারে রাখতেই হবে নইলে কাঁচা অবস্থায় টেনে আনলে দরকচা মেরে যাবে।

জিতেন। গুরু কি কাউকে কম, কাউকে বেশী কৃপা করেন?

ঠাকুর। হ্যাঁ তা কবেন। কৃপাটা ত তোমাব কাছে বোধ হচ্ছে, কেন না তুমি অতটা পাবে আশা কব নি। যে যেটা আশা করে নি সেইটে পেলেই তার কাছে কৃপা ছাড়া কি? তুমি এক দিন দু টাকা আশা ক'বে বেরুলে কিন্তু হয় ত দশ টাকা পেলে তুমি তাঁর কৃপা মনে কববে না? যদি বল তোমাব প্রালব্ধে ছিল তাই পেয়েছ, তা সব ঠিক কিন্তু তুমি ত সে কথা জানতে না, যদি জানতে যে প্রালব্ধে দশ টাকা আছে, তুমি দু টাকা আশা ক'বে বেরুতে না দশ টাকাই আশা কবতে বা ঘবেই নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে। প্রালব্ধ অনুযায়ী দেওয়া, না দেওয়া, তাঁর কাজ হতে পাবে কিন্তু তোমার পক্ষে সবই কৃপা। কৃপা গ্রহণ কববাব আবাব ক্ষমতা থাকা চাই, যাব যেমন আধাব, যেমন শক্তি সেই পবিমাণ কৃপা সে সহ্য কবতে পাবে, তাব বেশী দিলেও সে সহ্য কবতে পাববে কেন? যাব আধ সেব খেলে ক্ষিদে যায় তাকে আধ সেব দিতে হবে আব যাব এক পোতে খিদে যায় তাকে এক পোয়াই দেওয়া চাই, বেশী দিলে সে খেতে পারবে কেন? ফেলে দেবে। সংসাব বাসনা যত ক্ষণ আছে তত ক্ষণ সেই বাসনা পূবণ হ'লে, সংসারে কিছু সুখ হলেই বললে তাঁব কৃপা, আবার দুঃখ পেলেই বললে তিনি নিষ্ঠুব। আবাব, যাবা ত্যাগেব পথে আসছে তাদের বাসনা যত যাবে, রিপু যত অধীন হবে এবং মন থেকে সংসাব যত ক'মে যাবে তত তাবা তাঁব কৃপা বলবে অর্থাৎ যার যেমন ভাব সে সেই রকম কৃপা বোধ কববে, তবে তাঁব আসল কৃপাই হচ্ছে সংসার বাসনাদি কমিয়ে ত্যাগেব দিকে নিয়ে যাওয়া। জগাই, মাধাই কি বৃত্তিতে ছিল? চৈতন্য দেবকে দেখবা মাত্র যে তাদের সমস্ত বৃত্তি গুলো বদলে গেল, কামনা, বাসনা সব চ'লে গেল এবং তারা সব ছেড়ে তাঁকে ভালবেসে গতি করতে লাগল এটা কি তাঁর সোজা কৃপা হ'ল, একেবারে (Last Class) লাষ্ট ক্লাস থেকে (2 nd Class) সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল, কেবল একটা ক্লাস মাত্র বাকী রইল, অর্থাৎ কেবল আত্মদর্শনটাই বাকী, আর সব ত দেখা মাত্রই

হয়ে গেল। কামনা, বাসনা, আসক্তি, রিপুর তাড়না সব যে ছেড়ে গিয়ে মন এক মুখী হওয়ায় কত ঝঞ্ঝাট কেটে গেল, এবং গতি করার তিনি কত সুবিধা ক'রে দিলেন বল দিকি, আর তারা নিজে চেষ্টা ক'রে হয় ত পাঁচ বছরেও একটা বৃত্তি ছাড়তে পারত না; এখানে তাঁর সঙ্গই হ'ল তাদের প্রধান সাধনা, তাই সঙ্গকে এত বড় করেছে।

পুত্তু। তিনি ত মঙ্গলময় সর্ব্বদাই মঙ্গল করেন, তা হ'লে তিনি কেবল পুরুষ মূর্ত্তির ভেতর দিয়ে কাজ করেন কেন?

ঠাকুর। তিনি যে মঙ্গলময় সেটা কি বোধ আছে, ওটা ত ভাষা বললে, তিনি মঙ্গলময় এইটে ঠিক বোধ থাকলে ত আনন্দে ভ'রে যাবে, তোমাদের ত কিছুই উপলব্ধি নেই, কিছুই বোঝ না শুধু কতক গুলো বই এর পাতা মুখস্থ ক'রে ভাষা আওড়াচ্ছ; কি যে সব বল তার ঠিক নেই। এই যে পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় ব'লেছে, এ কথাটার আসল ভাব বুঝলে না অথচ পুরুষকে নিষ্ক্রিয় ধ'রে নিলে কিন্তু আসল ব্যবহারের বেলা গুরুর কাছে কি নিষ্ক্রিয় ব'লে আসছ? তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পার এবং তাঁর কথা ভাল লাগে ব'লেই ত তাঁর কাছে এসো, আর নিষ্ক্রিয় বোধে তাঁর কাছে এলেই কি কাজ করতে পার? যত ক্ষণ ক্রিয়া আছে তত ক্ষণই ভাল মন্দ বোধ থাকে। তিনি সাধারণতঃ পুরুষের ভেতর দিয়েই সদগুরুর কার্য্য করেন, কারণ পুরুষের স্বতঃই কিছু বেশী শক্তি থাকে, পুরুষ একটু বেশী কঠোরতা রক্ষা করতে পারে। সদগুরুকে অনেক সময় বাহ্যিক কঠোরতা রক্ষা ক'রে শিষ্যদের গতি করাতে হয়, এই রকম কপট কঠোরতা রক্ষা করা এবং স্থান বিশেষে কোমল ব্যবহার করা পুরুষ ছাড়া পারবে না, তাই পুরুষই গুরু হয়। আর এক আছে, গুরু অবস্থা এলে পুরুষ স্ত্রী বোধ থাকে না এবং তাঁর শক্তি যারই ভেতরে ঢুকবে তা সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীই হোক সেখানেই কাজ করবে।

জিতেন। পরমহংসদেবের স্ত্রী শ্রীশ্রীমার ত অনেক শিষ্য আছে, তিনি ত দীক্ষা দিতেন।

ঠাকুর। দেখ কারুর নাম করাটা ঠিক নয় তবে যখন কথা তুললে তখন বলতে হয়। প্রথমে দেখ শক্তিটা কার? কাকে দেখে লোক আসত? পরমহংসদেবকে না তাঁর স্ত্রীকে? যত দিন পরমহংসদেব ছিলেন তত দিনই বা লোক কার কাছে যেত? পরে সেই পরমহংস-দেবের শক্তিই তাঁর স্ত্রীর ভেতর দিয়ে কাজ করেছে। তা ছাড়া, তিনি ত নিজেই বলতেন যে তাঁর (পরমহংসদেবের) শক্তিতেই কাজ হচ্ছে, আর তিনি এ কথা বলতেন ব'লেই তিনি পরমহংসদেবের স্ত্রী হতে পেরেছিলেন এবং এত লোক তাঁকে মানত। তাঁর মত কঠোরী, তাঁর মত ত্যাগী, তাঁর মত স্বামী ভক্তি অতি বিরল। তিনিই ঠিক সহধর্ম্মিনী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি যদি পরমহংসদেবের বিবাহিতা স্ত্রী না হতেন তা হলে কি এত শক্তি তাঁর ভেতর খেলত? স্বামীকে দুই ভাবে ভক্তি করে, স্বামীকে ভক্তি করতে হয় বিধি আছে ব'লে, সাধারণ স্বামী ভাবে ভক্তি করে অথবা স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে। যারা সাধারণ স্বামী ব'লে সেবা করে তাদের হিংসা, দ্বেষ, কামনা, বাসনা, ভাল, মন্দ সবই থাকে, তারা নিজেরাও অতি সাধারণ, তাই স্বামীকেও অতি সাধারণ ভাবে কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, বাসনা পোরাবার জন্যে সেবা করে, কিন্তু যারা ঠিক সহধর্ম্মিনী তাদের ত নিজের স্বার্থ ব'লে কিছুই থাকে না, তারা ত্যাগী হয়, স্বামীর সুখেই তাদের সুখ তারা স্বামীকে স্বার্থ সিদ্ধির বা বাসনা পোরাবার একটা কল ব'লে ধরে না, বাস্তবিকই ভগবান জ্ঞান ক'রে তারা স্বামীর সেবা করে; তাদের হিংসা, দ্বেষ, কপটতা কিছুই থাকে না, এমন কি দেহটাও স্বামীর জন্যে ছেড়ে রাখে। তা ভিন্ন, তাঁর শক্তি তার ভেতরে আসবে কেন? পরমহংসদেব ত তাঁর স্ত্রীকে সাধারণ স্ত্রী ভাবে ব্যবহার করতেন না, তাই কখন দেবী

ভাবে কখনও বা মধুর ভাবে সাধনা করেছিলেন। আর তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব।

কৃষ্ণকিশোর। বিধি মত পূজার যে সব নিয়ম আছে তার ভুল হলে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ হয় বলে, এটা কি ঠিক?

ঠাকুর। হ্যাঁ, যখন কামনা নিয়ে বিধি মত পূজো করছ তখন ঠিক বিধি না হ'লে চলবে কেন? অফিসে যখন চাকরী করতে যাও তখন অফিসের কোন নিয়মের ভুল হলে কি চাকরী থাকে? যত ক্ষণ অফিসে চাকরী করতে যাচ্ছ তত ক্ষণ বাঁধা নিয়ম ধ'রে সেটা মেনে তবে সাহেবের কাছে যেতে পাবে নইলে চাকরী থাকবে না, আবার, বাড়ীতে সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নীতি ঠিক বজায় রাখবার দরকার হয় না এমন কি বাড়ীতে hand shake ক'রে পাশে বসিয়ে কথা কয়, তেমনি কামনা নিয়ে পূজো করবার সময় বিধি মত ঠিক না হ'লে কাজ ত হ'লই না উল্টে অকল্যাণ হ'ল কিন্তু তাঁকে ভালবেসে নিঃস্বার্থ ভাবে পূজো করার সময় তত বিধি দরকার হয় না, তখন "মন মানসে করবি পূজা দিবস রজনী।" যেটা মানস কর অর্থাৎ যে মূর্ত্তিটা ইচ্ছা কর সেইটে মনে এনে সমস্ত ক্ষণ তারই জপ ধ্যান কর। এই মানস পূজারও আবার আলাদা বিধি আছে তখন সেই অনুযায়ী সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিধি মত পূজার ব্যবস্থা আছে। সাধারণের পক্ষে নীতি রক্ষা ক'রে সংস্কার বজায় রেখে চলা দরকার। সংস্কার গুলোর অনেক ভাল উদ্দেশ্য আছে। বিনা নীতিতে মন ঠিক থাকতে পারে না। ***যতক্ষণ বাঁধন না কাটে ততক্ষণ নীতি রাখতেই হবে,*** তাই সন্ন্যাসীরা নীতি বা সংস্কার সব ফেলে দেয় ব'লে সমাজের বাইরে থাকে, পাছে তাদের দেখে সমাজ সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়। চৈতন্য দেবকে যখন বলেছিল তোমার আবার দেবস্থানে গিয়ে অত নাচবার, হৈ হৈ করার দরকার কি? তখন তিনি বলেছিলেন 'ওগো, এ আমার জন্যে নয়, এ তোমাদের দুর্ব্বলদের জন্যে। আমি এই সব নীতি সংস্কার রাখছি দেখলে তবে ত সাধারণ আমার দেখাদেখি কিছু নীতি ও সংস্কার মেনে

চলবে, "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শেখায়।" দুর্ব্বলের জন্যেই সর্ব্বদা আইন, সবলের কিছুরই দরকার হয় না, অর্থাৎ অবস্থা লাভ হয়ে গেলে তখন আর কোন নীতি বা সংস্কারের দরকার হয় না। সাধারণ নিয়ম ও সংস্কার হচ্ছে, ঠাকুর ঘর গীতা পাঠ ও জপ, ধ্যান প্রভৃতির জায়গা, তা ব'লে কি পায়খানায় ব'সে তাঁর নাম করা চলবে না? তাঁর কাছে ত সবই সমান শুচি আর অশুচি। অশুচি অবস্থায় দেহ গেলে কি শেষ সময়ে তাঁর নাম নেওয়া হবে না? তেমনি এক জন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সেই বীজ রেখে অপরের কাছে শিক্ষা নিতে পার কিন্তু সেই বীজটা ফেলে দিতে পার না। ভুল ক'রে অপরের কাছে দীক্ষা নিয়ে থাকলেও তাঁকে ত তখন ঠিক ভেবেই কথা দিয়েছ। তাই ত্যাগী গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে গেলে, ভোগী গুরুর বীজ বজায় রেখে তাঁরা শক্তি দেন, শিক্ষা দেন, চলবার পথ দেখিয়ে দেন। তাঁর দিকে যাবার উপায়ই হচ্ছে ত্যাগ, ব্রাহ্মণদের সেই ত্যাগ ধর্ম্ম ছিল ব'লে গুরু প্রভৃতি শক্তির কাজ তাদেরই দিয়ে গেছে কিন্তু কোন শূদ্রাণীও যদি ত্যাগী হয় তা হ'লে তার ব্রাহ্মণত্ব এল ত তখন সেও দীক্ষা দিতে পারে বটে কিন্তু গৃহী সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারুর কাছে দীক্ষা চলে না। ত্যাগী গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে গিয়ে তাঁকে বীজ মন্ত্র বলা চলে অপর কাউকে বলতে নেই। তোমার শক্তি না হলে অপরকে শিষ্য করা হিসাবেও তোমার বীজ দিতে নেই কারণ মন্ত্র দিলেই নিজের শক্তি কিছু ক্ষয় হ'ল আবার শিষ্যর কর্ম্ম খানিকটা এলো।

জিতেন। ভালবাসা পড়লে কি আবার চ'লে যায়?

ঠাকুর। সেটা ভালবাসা কি ভাবে লেগেছে, তার ওপর নির্ভর করে, জোর ভালবাসা পড়লে আর যায় না, কারণ ভালবাসা মানেই ত্যাগ, তখন আর কিসের জন্যে ফিরবে? এ হ'ল ভালবাসার লক্ষণ তা সৎ এ এই ভালবাসা পড়লে সৎ হ'ল, আবার অসৎ এ পড়লে

অসৎ হবে। বিল্বমঙ্গলের চিন্তামনির ওপর ভালবাসা প'ড়েছিল, তার জন্যে দেহ সুখ নষ্ট ক'রে, সম্পদ ঐশ্বর্য্য সব ছেড়ে, এমন কি প্রাণটা পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রে, মড়া ধ'রে, নদী পার হয়ে, সাপ ধ'রে পাঁচিল টপকে পড়ল। ভালবাসা তার ঠিকই প'ড়েছিল কিন্তু অসৎ এ প'ড়েছিল, সে আধারে তার এই ভালবাসা দাঁড়াতে পারলে না, ফিরতে হ'ল। অল্প ভালবাসায় সাধারণতঃ স্বার্থ নিহিত থাকে, সেই স্বার্থের গোলমাল হ'লেই ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়। যাকে ভালবাসে তাকে দেখতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু তা ব'লে লোকসান ক'রে তাকে দেখতে যেতে পারে না; আর, জোর ভালবাসায় তার জন্যে সব ছেড়ে পাগল হয়ে ছোটে, লাভ লোকসান কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ভালবাসা তিন প্রকার—সামর্থা অর্থাৎ রাগাত্মিকা, যে রকম ক'রে হোক তাকেই চাই, রাধিকার সামর্থা প্রেম; সামঞ্জস্যা—ভালবাসে, যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সব নষ্ট ক'রে যেতে পারে না; এ দিক সব বজায় রেখে যেতে চায়, রুক্মিণীর প্রেম সামঞ্জস্যা কারণ সে ত ভালবাসার জিনিষে ভাল-বাসা দিয়েছে রাধার মত ভালবাসার জিনিষ ছেড়ে অপরকে ভালবাসেনি; আর, সাধারণী হচ্ছে, সময় পেলুম ত গেলুম, দেখে এলুম, সব দিক বজায় রেখে, সব সুবিধা হ'লে দেখতে যায়, না যেতে পারলে মনে দুঃখ পায় না, কুব্জার সাধারণী ভালবাসা স্ত্রী পুরুষ সবাইয়ের ভেতরই সমান পরিমাণ আছে, তবে মান, অভিমান, অর্থ, সম্পদ, যশ, মান, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি অনেক জিনিষে ছড়িয়ে আছে; যার যত গুড়িয়ে এসেছে তার ভালবাসার তত জোর হয়েছে, তবে পুরুষদের স্বতঃই একটু শক্তি বেশী থাকে, তারা স্বতঃই একটু বেশী কঠোর ও বেশী বিচার রক্ষা করে তাই তাদের ভালবাসা চট্‌ ক'রে আসে না, আর স্ত্রীলোকেরা স্বতঃই একটু দুর্ব্বল, কোমল ও তাদের মায়া একটু বেশী ব'লে ভালবাসা চট্‌ ক'রে আসে। সাধারণ ভালবাসায় স্বার্থের সঙ্গে অভিমানও থাকে কিন্তু সাধুতে এই ভালবাসা পড়লে স্বার্থ ও অভিমান নষ্ট ক'রে দেয় এবং ক্রমশঃ ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়। সদগুরু

বা অবতারদের আলাদা ভাব, তাঁরা আলাদা শক্তি নিয়েই আসেন তাঁরা যেন ভালবাসার tank তা থেকে অপরকে ভালবাসা দিয়ে তাদের মন ঘুরিয়ে ভালবাসা আনিয়ে দেয়।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

সঙ্গই প্রধান, যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে; মনে ভোগের বাসনা থাকলেও ত্যাগীর সঙ্গ করলে সেই ভোগ বাসনা কমিয়ে দিয়ে মনকে ঘুরিয়ে ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে, এতে প্রয়োজন হ'লে অনেক সময় একটু ভোগও করিয়ে নেয়, যেমন বিকারের রোগীর খুব বেশী তৃষ্ণা থাকলে যোজবার জন্যে একটু জল খাইয়ে দিতে হয়। আবার ত্যাগ করবার ইচ্ছা থাকলেও ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগ বাসনা বাড়িয়ে দিয়ে ত্যাগের ইচ্ছা টুকু নষ্ট ক'রে দেবে। সংসার হচ্ছে জ্ঞান ভূমি, এখান থেকে শিক্ষা হয়, বাসনা থাকতে ত সংসার ছাড়তে পারবে না, তাই সংসারে মায়ের ভালবাসা কিছু স্বার্থ ও ভুল ভ্রান্তি যুক্ত হলেও সেই ভালবাসা বড় ক'রে সেই জগত মাকে ডাকলে তিনি এই স্বার্থ, ভুল, ভ্রান্তি কমিয়ে দেবেন, তখন মনে শক্তি আসে এবং তখন সংসার আর বাঁধতে পারে না। তখনও আমিত্ব বুদ্ধি থাকে ও কিছু বিচারও থাকে কিন্তু তখন সেই জ্ঞান বিচারে ঠিক ঠিক কিছু ধরতে পার, তা ভিন্ন সংসারে ডুবে থাকলে অন্ধের মত বিচার হবে। শেষে ক্রমশঃ ভালবাসা জোর পড়লে এই আমিত্ব বুদ্ধি ও বিচার চ'লে যায়, তবে যার একেবারে প্রেম লেগে যায় তার ত সব আপনিই চ'লে গেছে। সঙ্গের এমনি প্রভাব দিয়েছে যে নিজে চেষ্টা ক'রে বহু বৎসরে যা না করতে পারবে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে তা করিয়ে দেয়। সংসার অনিত্য, মায়ার জিনিষ, এ ত শাস্ত্রে কত লেখা আছে কিন্তু এত প'ড়েও ত কিছুই ছাড়তে পার না অথচ সাধুর কৃপায় অতি সহজে সেগুলো হ'য়ে যায়। এই খানে ঠাকুর রূপ সনাতনের গল্প বললেন (অমৃতবাণী ২য় ভাগ ১৭২ পৃঃ) সাধুর কৃপায়, যে আজ অর্থ, সম্পদ, যশ, মান, প্রভৃতিতে ম'জে রয়েছে

কালই হয় ত তার বৈরাগ্য এসে গেল ও সে সব ছেড়ে বেরিয়ে গেল, এর চেয়ে আর বড় কৃপা কি হতে পারে। গুরুর কৃপায়, বহুকালের অন্ধকার ঘরে আলো আসার মত হঠাৎ নজরটা ঠিক খুলে গিয়ে আসল ভেতরটা দেখতে পেয়ে ত্যাগ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে, এই হ'ল গুরুর আসল কৃপা, এতে অনন্ত সুখের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু সংসার সুখের জন্য তাঁর কৃপা হ'লে দুঃখের হাত থেকে ত নিষ্কৃতি পেলে না। কিছু সময় অন্ততঃ তাঁকে দিয়ে সৎ ভাবে সৎ সংসারী হয়ে দিন কাটালে তিনি অনেক কৃপা করেন। এইখানে ঠাকুর পুঁটলিনাথ শিব ও দামাজীর গল্প বলিলেন (অমৃতবাণী ৩য় ভাগ ২৩ পৃঃ)।

তা দেখ, তাঁকে পেতে গেলে এই রকম সব ছেড়ে বেরুতে হবে তবে ত তাঁর আসল কৃপা পাবে, ত্যাগ আনিয়ে দেবে। গুরুতে ভালবাসা পড়লেই জানবে সেই ভগবানেই ভালবাসা পড়ল, কারণ গুরুর ভিতর তিনিই আছেন, তাঁর শক্তিই কাজ করছে। সদগুরু ভালবেসে এত আপন ক'রে নেন যে এত মায়ার ভেতরে থেকেও, এত আকর্ষণে প'ড়েও তারা সব কেটে যেন ছিটকে দৌড়ে আসে, তাই বার বার বলেছে গুরু সঙ্গ কর এতেই সব হবে।

দ্বিজেন গাহিল

> তারা সব ঘুচালি লেঠা, মা সব ঘুচালি লেঠা,
> ও যে আগম নিগম শিবের বচন মানবি কি না মানবি সেটা।
> শ্মশান পেলে ভাল থাক মা, তুচ্ছ কর মনি কোটা,
> তুই আপনি যেমন, তোর পতি তেমন, ঘুচলো না তোর সিদ্ধি ঘোঁটা।
> যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর এক রূপ হয়, রূপের ছটা;
> তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভস্ম আর মাথায় জটা।
> সংসারে আনিয়ে মা গো করলি আমায় লোহা পেটা,
> তবু তোরে ছাড়িনি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা
> চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রী রামপ্রসাদ মায়ের বেটা,
> ওরে মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার, এর মর্ম্ম বুঝবে কেটা

চতুর্থ ভাগ—একাদশ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ৮ই ভাদ্র ১৩৪০
ইং ২৪শে আগষ্ট ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, কালু, পুতু, জিতেন, কেষ্ট, তারাপদ, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, জয়, ইঞ্জিনিয়ার, নৃপেন, মতি ডাক্তার, অমল, প্রফুল্ল, সুধাময়, পঞ্চানন, কানন, কালীমোহন, মৃত্যুন, হরপ্রসন্ন, ইন্দ্র, মহাবিষ্ণু, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। এমনও দেখা যায় আপনারা যাকে অনুভূতির দর্শন বলেন এ রকম দর্শন হওয়ার পরও বৃত্তি যেমন তেমনি থাকে কিছুই বদলায় নি।

ঠাকুর। হ্যাঁ, এ রকম দর্শনও হয়, একটা চিন্তা করতে করতে হয় ত কিছু সময়ের জন্যে মনে সত্ত্বের ছায়া এসে পড়ায় ক্ষণিকের জন্যে সেই জিনিযটাই কেবল তখন চোখে ভাসে, এটাকে ঠিক অনুভূতি বলে না, তবে এরূপ দর্শন হ'লে মনের কিছু উন্নতি হয় বৈ কি। অনুভূতি করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনটাও সেই স্তরে ওঠা চাই তবে ত উপভোগ করতে পারবে; অনুভূতি হতে গেলেই প্রথমে অনুভূতির জিনিষ ও যে অনুভূতি করে হুটো আলাদা থাকবে, তবে যে অনুভূতি করে সে তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে থাকে এবং অনুভূতি চ'লে যাওয়ার পরও খানিক ক্ষণ সেই রকম নেশার মত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয় এবং উচ্চ স্তরের অনুভূতি হ'লে মন আর সাধারণের মত অত নীচে নামতে পারে না, কারণ সংসারটা তখন অনিত্য বোধ এসে যায়, কাজেই মন আর সে সব জিনিষ তত জোর ক'রে ধরে না, শেষে এক হয়ে যায়, আমি তুমি থাকে না, একেই আত্মদর্শন বলে; তখন মন আত্মস্থ হয়, তখন দেখে

যেন আমিই তাঁতে রয়েছি এবং তিনি আমাতে রয়েছেন, এ অবস্থায় উপভোগ হয় না কারণ উপভোগ করবে কে? সে ত তাঁর সঙ্গে মিশে গেল। যারা ঠিক মন ধর্‌তে পেরেছে তারাই জানে মনের কোন অবস্থায়, কোন স্তরে কেমন বোধ হয়, তা ভিন্ন ঠিক ভাব সব সময় ধরতে পারবে না, তার প্রমাণ দেখ, চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস পণ্ডিত নয় কিন্তু মন ঠিক বুঝেছে ব'লে, ঠিক অনুভূতি হয়েছে ব'লে, মনের সব অবস্থা জানে, তাই চণ্ডীদাস বলেছে 'যে দিকে ফিরাই আঁখি সবই কৃষ্ণময় দেখি', এ একটা অবস্থা আছে তখন সবই কৃষ্ণ দেখছে, তখন আর বাহ্যিক কোন জিনিষের অস্তিত্ব বোধ থাকে না; অপর লোক, জানলা, দরজা, গাছ প্রভৃতি সবই কৃষ্ণ রূপ দেখে, কিন্তু বিদ্যাপতি ভাষার খুব পাণ্ডিত্য দেখালেও আসল এই ভাবে ভুল করেছে, সে বলেছে রাই সখীদের দেখছে অথচ কেবল তমাল বৃক্ষটাই কৃষ্ণ হ'ল, এ রকম মনের অবস্থা হয় না, পাশা পাশি সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ অনুভূতি হ'তে পারে না।

কানন। চৈতন্যদেবকে ভগবান বলব না ভক্ত বলব?

ঠাকুর। তোমার ভগবান বলাই ভাল, কারণ তুমি তোমার লক্ষ্যটাকে যত বড় করবে ততই ভাল, আর ভক্ত ভগবান কি আলাদা? ভক্ত আছে ব'লেই ভগবানের অস্তিত্ব, ভক্ত হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, কাজেই ভক্ত পূজা করা মানেই ভগবানকে পূজা করা হ'ল। গীতায় রয়েছে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ভাবে পূজা করছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কাছে ডেকে বললেন "কি দেখছ?" অর্জ্জুন বললে 'এক প্রকাণ্ড গাছে প্রত্যেক ডালে থোলো থোলো ফল ঝুলছে; তখন আরও কাছে আসতে ব'লে আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'এই বার কি দেখছ? অর্জ্জুন বললে এক প্রকাণ্ড গাছে প্রত্যেক ডালে থোলো থোলো কৃষ্ণ ঝুলছে; তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'এই পরম ব্রহ্ম, এর একটা অংশে আমি হয়েছি, তাহলেই বুঝে দেখ পরম ব্রহ্ম কি? তবে তোমার এ সব বোধ নেই, তুমি কেবল আমাকেই দেখতে পাচ্ছ, আমাকেই তুমি সেই

পরম ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে চল, তোমার পক্ষে আমিই এখন সেই পরম ব্রহ্ম তারপর যেমন জ্ঞান বাড়বে তখন তাঁকে বুঝতে পারবে।

পুত্তু। ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যা কথা বললে কোন ক্ষতি হয় কি ?

ঠাকুর। সত্য মিথ্যা উদ্দেশ্যের ওপর; মিথ্যা, বল কেন ? সাধারণতঃ নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে মিথ্যা বল, তাতে পরের অপকার হ'লেও সে দিকে লক্ষ্য কর না। তুমি ত সত্য ব্রত নাও নি যে সত্য ছাড়া বলবে না কাজেই তোমার নিজের বা অপরের কোন ক্ষতি না হয় এমন মিথ্যা কথায় দোষ হয় না। আর ধর্ম্মের পথে ত বলেছেই 'সত্য ব্রত হিসাবে পালন করলে তাতেই ত সিদ্ধি লাভ করবে'। তুলসীদাস ব'লে গেছেন "সত্য বচন দীনভাব পরধন উদাস ইসমে নেহি হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাস।" আবার, ***আমার এই লোক শিক্ষা কাজে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলতে হয়।*** আমার উদ্দেশ্য, তোমাদের মঙ্গল হোক, তা যদি দুটো মিথ্যা কথা ব'লে তোমাদের মঙ্গল করতে পারি, ত আমার তাই ভাল।

কানন। সংসারে থেকে কি চরম অবস্থা লাভ করা যায় ?

ঠাকুর। সন্ন্যাসী বল, ত্যাগী বল, সবই সংসার থেকেই হয়। সংসারে থাকে ব'লেই সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়, ভোগ না থাকলে আর কি ত্যাগ করবে ? তবে সংসার বাসনা থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না, চরম অবস্থায় যেতে গেলে অর্থাৎ তাঁকে পেতে হ'লে সব ত্যাগ হওয়া দরকার, সেই জন্যে বরাবর সংসারে থাকলে ঠিক ত্যাগ হ'ল কি না বোঝা যায় না ব'লে মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে দূরে গিয়ে নিজের মন কতটা তৈরী হ'ল দেখতে হয়; ভোগ থেকে তফাৎ না থাকলে ঠিক মনে ভোগ ত্যাগ হ'ল কি না বোঝা যায় না। বৃত্তি গুলো, তা দয়া, ক্ষমা আদি ভালই হোক, আর হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি মন্দই হোক সব মনের, এরাই মনকে চঞ্চল করে, এই বৃত্তি গুলো সব নিবৃত্তি হয়ে গেলে মন স্থির হয়, একেই

আত্মস্থ হওয়া বলে তখন মন চিন্তা শূন্য, স্থির থাকে। এই শুদ্ধ মন টুকুও না থাকলে সৃষ্টি থাকে না, মোট কথা, বাসনা ত্যাগ না হ'লে কিছু হবে না, তা যে পথেই যাও বাসনা ত্যাগ হওয়া চাই। ভালবাসায গতি কবার সময় সদগুরুর ওপর জোর ভালবাসা পড়ায় আপনি সব দিক ছেড়ে যায়, তখন তার আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, তা ছাড়া, জ্ঞান পথে বল, বা যে কোন সাধন পথে ঐ একটাকেই জোর ক'রে ধ'রে যেতে হবে; এক লক্ষ্য মানেই অপর সব দিক ছেড়ে গেছে। সংসারে থেকে এই মনকে এক মুখো ক'রে আনা বড় কঠিন, তাই মনকে সর্ব্বদা গুরুর চরণে ফেলে রাখবে; গুরুসঙ্গে, গুরু কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে তার সঙ্গে তোমার যেটুকু চেষ্টা আছে সেটাও লাগাবে, তাতে শীঘ্র কাজ হবে। যত ক্ষণ নিজের আমিত্ব রেখেছ, যত ক্ষণ নিজে চেষ্টা ক'রে টাকা রোজগার প্রভৃতি অপর সকল কাজ করছ তত ক্ষণ এদিকেও সেই রকম কিছু চেষ্টা দেবে না কেন? তখন সংসার বাসনা না গেলেও গুরুসঙ্গে বাসনা ছাড়িয়ে দেবে। যদি কোন দিকেই কিছু চেষ্টা না ক'রে তাঁর ওপর নির্ভর কর ত আলাদা কথা, অবস্থা অনুযায়ী নির্ভরতা আসে, এ ত শুধু মুখে বললেই হবে না। সঙ্গের এমনি প্রভাব যে ঠিক সদগুরুর সঙ্গ করলে, মনে সৎ হব, বাসনা ত্যাগ করব, আন্তরিক এই ইচ্ছা থাকলে প্রবৃত্তি সব উল্টো দিকে থাকলেও গুরু কৃপায় অন্য দিকে ঘুরে যায়, তা ছাড়া মনেরও স্বভাব হচ্ছে, সৎ হোক অসৎ হোক, যে দিকে মন জোর ক'রে পড়ে সেটা হয়ই, তবে ঠিক মন দিয়ে সঙ্গ করা চাই। সাধারণতঃ গুরুকেও ভালবাসি, তাঁর সঙ্গ চাই, আবার অর্থাদি ভোগও চাই অথবা এমনও হয় যে অর্থাদি ভোগের বৃত্তি গুলো হয় ত চাপা রইল, সঙ্গ করতে করতে সংস্কার গুলো হঠাৎ ঠেলে উঠে কাজ করলে, তখন ঠিক সঙ্গ হ'ল না বটে, কিন্তু এতেও, সংস্কার গুলো ঠেলে উঠলেও, আবার আপনি চ'লে যাবে এবং পুরো মন দিয়ে সঙ্গ করলে যতটা কাজ

হ'ত, ততটা না হ'লেও এই সঙ্গের দরুণ কিছু কাজ ত হবেই, অন্ততঃ অনিচ্ছা সত্ত্বে জোর ক'রে সঙ্গ করায় যেটুকু কাজ হয়, সেটাও ত হবে। সংস্কার মরা কি সোজা কথা? কত সাধনা ক'রে কত ওপরে উঠছে, কত আনন্দ উপভোগ করছে, তবুও হয় ত কোন সময় টক্ ক'রে একটু সুবিধে পেয়ে আবার ঠেল মারলে, তাতে মন খারাপ করতে নেই, ধৈর্য্য রেখে গতি ক'রে যেতে হয়। যাঁর কৃপায় এতটা উঠলে, ওপরের কিছু আনন্দ পেলে, সেখান থেকে হঠাৎ কিছু নামলেও যে আবার তাঁর কৃপায় উঠতে পারবে না, সে আনন্দ পাবে না, তা ত নয়, তাই সর্ব্বদা গুরুতে বিশ্বাস রেখে সঙ্গ ক'রে চললে ক্ষণিক ওঠা নামা থাকলেও মূলে কোন ক্ষতি হবে না, ঠিক উন্নতি হতে থাকবে। সংসারে মায়ার ঠেলায় যত দুঃখ কষ্ট পাও তত সংসারটা বোঝা মনে হয় কিন্তু যখন ওরই মধ্যে আবার কিছু সুখ পাও, আনন্দ পাও, অমনি আর বোঝা বোধ হয় না, তখন সংসার ছাড়বার নাম করলেই উল্টে ভয় আসে। সংসার বাসনা ও মায়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সদগুরু জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেও সে থাকতে পারবে কেন? তার প্রাণ যেন হাঁচড় পাঁচড় করে। এমন কি বিবেকানন্দের মুখে গোড়ার দিকে বেরিয়েছিল 'তুমি কি করলে আমার! আমার যে ভাই আছে, আমার যে মা আছে!' তখন পরমহংসদেব বললেন "হ্যাঁরে! তুইও এ কথা বললি, সবাই দেখছি সেই একই কড়ায়ের ডালের খদ্দের!" তা, ছাড়বে বললেই কি হয়? এত সোজা হ'লে দুঃখ পেয়ে অনেকেই সংসার ছেড়ে দিত, তবে হ্যাঁ, যার যত মায়া ক'মে আসবে তার তত সাহস বাড়বে। আবার, এও দেখতে পাওয়া যায়, দেহ সুখ অর্থ প্রভৃতির বেলা হয় ত অনেক সাহস আছে অর্থাৎ এ গুলোর বেলা মায়া অনেকটা ক'মে গেছে, কিন্তু ছেলের অসুখ হ'লেই পাগলের মত হয়ে পড়ে, সে দিকে মায়াটা তখনও কমেনি, সংসারটা যদি ঠিক বোঝাই মনে কর, ত ছাড়তে পার না কেন? আর সহ্য করবার শক্তি নেই মুখে বললেই

'ত হবে না, কারণ দেখা যাচ্ছে সহ্য ক'রে রয়েছ, হতে পারে, খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু যখন তুমি সেটা ঘাড়ে নিয়েও বেঁচে রয়েছ অথচ ফেলেও দিচ্ছ না, তখন সে বাঁধা মারই খাও, আর যাই কর, সহ্য ক'রে চলেছ ত? যখন ঠিক ঠিক বোঝা ব'লে বোধ আসবে, তখনই না, সেই বোঝা নামাবার চেষ্টা করবে, তখনই না সংসারের দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করবে। সংসারে থেকে তাঁর দিকে গতি করতে গেলে সকল জিনিষ নিয়মিত ভাবে করা দরকার। অনিয়মিত আহারে, অনিয়মিত নিদ্রায় যেমন শরীর খারাপ হয় তেমনি অনিয়মিত কথা বলায় ও অনিয়মিত রিপুর বশবর্ত্তী হ'লে মনের উন্নতি হওয়া কঠিন। স্তর হিসাবে সব জিনিষেরই মাপ আছে: যে জিনিষটা সন্ন্যাসীর পক্ষে কড়া বারণ করা আছে, সংসারীদের পক্ষে হয় ত তত দোষের নয়। সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নীতি আছে, তাদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ ত দূরের কথা, স্ত্রীলোকের ছবি দেখা বা চিন্তা করা পর্য্যন্ত বারণ, কিন্তু সংসারীদের তা বললে চলবে কি? তাদের বেলায় স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রীলোকের সঙ্গ যতদূর সম্ভব কম করতে হয় এবং সকল বিষয়ে খুব সংযম নিয়ে গতি ক'রতে হয়। পরমহংসদেব বলেছেন 'সংসারীদের পক্ষে সহধর্ম্মিনী স্ত্রী কামিনীর মধ্যে নয়, আর ক্ষুধা নিবৃত্তি প্রভৃতির জন্যে যে অর্থ সেটা কাঞ্চনের মধ্যে নয়'। তিনি আবার বলেছেন 'স্ব দ্বারায় গমনে তত দোষ হয় না' এর মানে হচ্ছে সংযম রক্ষা করা। কারণ ব্যতিরেকে, উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কার্য্য ব্যবহার করতে নেই। শাস্ত্রেই ঋতু রক্ষার জন্য বিধি আছে, তার উদ্দেশ্য আছে, তবে সংযম রেখে কাজ করা দরকার। কারণ সংসারীর ব্রহ্মচর্য্য মানেই যে একেবারে স্ত্রী সহবাস বারণ তা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র সত্ত্বেও তাঁকে শাস্ত্রে জিতেন্দ্রিয় বলেছে, মূল হচ্ছে উদ্দেশ্য নিয়ে। অনিয়মিত ব্যবহার করলে শরীরে শক্তি ক'মে আসবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার শরীরের শক্তি না কমে, তবে সংসারীদের ত বিন্দু রক্ষা হয় না। পাত্রে জল পূর্ণ

রয়েছে এক বিন্দু পড়লেই ছাপিয়ে পড়ল, সেখানে এক বিন্দু পড়া রক্ষা করতে পারলে লাভ হ'ল, নইলে একটু ছাপিয়ে পড়ল, তেমনি তোমার শরীরের শক্তি ছাপিয়ে যে টুকু প'ড়ে গেল সে টুকুত তোমার নষ্ট হ'ল, তা সে যে ভাবেই হোক, তবে সেই টুকুর অতিরিক্ত না হয় সেটা দেখা দরকার, তাই খুব সংযম রক্ষা ক'রে খুব নিয়মিত ভাবে চলা উচিত। শুধু ব্রহ্মচর্য্যের বেলা কেন? ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বেলাও খুব সংযম রক্ষা ক'রে চলতে হবে; ক্রোধের উদ্দীপনা হ'লেও সংযম রক্ষা ক'রে চেপে যেতে হবে, তবে ত বৃত্তি গুলো নিস্তেজ হয়ে ম'রে আসবে, এর জন্যে তোমার নিজের চেষ্টা ত লাগাবেই কিন্তু গুরু সঙ্গ, গুরু কৃপা ছাড়া ক'রে উঠতে পারবে না। প্রথমতঃ গুরু কৃপা ছাড়া এই সংযমের ইচ্ছেই হবে না, তা ছাড়া, তাঁর কৃপা এবং তাঁর সঙ্গ ছাড়া বৃত্তি গুলো নিস্তেজই হবে না, যে সহজে তাদের বাগে আনতে পারবে, কাজেই যত চেষ্টাই কর, তাঁর দয়া ব্যতিরেকে, বিনা সঙ্গে কিছুই হবার যো নেই।

জিতেন। মন যে বিষয় ধ'রে নেয়, তা এই সব বিষয় কি মনের সৃষ্টি, না সে গুলো বাইরেই রয়েছে?

ঠাকুর। মন যে যে জিনিষ জোর ক'রে ধ'রে তার অধীন হয়ে থাকে সেই সেই জিনিষ গুলোই তার পক্ষে বিষয়। বিষয় যে সব মনের সৃষ্টি তা নয়, বাইরে চোখে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হ'লে হয় ত, বা কানে শুনে সেটা পাবার জোর বাসনা হ'ল। স্বাভাবিক ন্যায্য জিনিষের, যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, মাথা গোঁজবার জায়গা ইত্যাদির অভাব জনিত কষ্ট আলাদা, এতে মন চঞ্চল হতেই পারে কিন্তু এগুলো ঠিক থাকলেও অপর বাসনার জিনিষ মন ধরলেই দুঃখ আসবে, আবার যখন কোন জিনিষ চ'লে গেলে দুঃখ আসে, তখন বুঝতে হবে মন সেটা জোর ক'রে ধ'রে ছিল; অনেক সময় এটা হয় ত ঠিক বোধ আসে না। সংসারে যশ

মান কিছু আছে হয় ত, তবে সে গুলো বাড়াবার জন্যেও হয় ত বাহ্যিক কোন চেষ্টা করছ না, অথচ এগুলো যেই চ'লে গেল অমনি দুঃখ বোধ করলে, তখন বুঝতে হবে মন সে গুলোও ধ'রে ছিল। যে জিনিষ মন ধ'রে নেই, সে জিনিষের জন্যে মন চঞ্চল হবে না, থাকে ভাল, না থাকে ক্ষতি নেই। যত ক্ষণ নিজের অবস্থায় সুখী থাকে ও মনে যাচঞা থাকে না তত ক্ষণ সকলেই মানবে কিন্তু নিজের অবস্থায় সুখী না হলেই যাচঞা থাকবে তখন সকলে নাও মানতে পারে। তুমি যদি নিজের প্রয়োজন কমিয়ে শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্নে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রে ও মাথা গোঁজবার সামান্য জায়গায় সুখী থাক তা হলে ধনী, দরিদ্র সকলেই তোমাকে মানবে এবং তারা তোমার সংস্পর্শে এসে কিছু ত্যাগ নীতি শিখে ফেলবে। নিজের অবস্থায় সুখী থাকার নামই শান্তি, কিন্তু বাসনা এমনই ক'রে রেখেছে যে তা থাকতে দেয় না, তবে ন্যায্য অভাব না থাকলে এটুকু মনের শক্তি নিতে পার, যার যেটা আছে সে সেইটায় ঠিক থাকতে চেষ্টা করলেই সাধন পথে অনেকটা গতি করতে পারবে। এই যে শাল আলোয়ান সব দামী দামী জিনিষ গায়ে দাও, সেটা ত দেহকে পরাও না, মনকে পরাও কারণ দেহের প্রয়োজন ত সামান্য কম্বলেই বরং আরও ভাল মিটে যায়। বাসনাই পর পর যত প্রয়োজন আনিয়ে দেয়, ভেতরে বাসনা থাকে ব'লেই বাইরের জিনিষ দেখে বা বাইরের জিনিষের কথা শুনে প্রয়োজন বোধ হয়, ভেতরে বাসনা না থাকলে শুধু বাইরের জিনিষে কাজ করতে পারে না কিন্তু এগুলো বাসনার উদ্দীপনা ক'রে দেয় অর্থাৎ মনে হয় ত তখন ঠিক সেই জিনিষের জন্যে বাসনা নেই, অথচ বাসনা তখনও মরেনি ব'লে বাইরের জিনিষে বাসনা যেন জাগিয়ে দিলে, তখন সে ঠিক তার প্রকৃতি মত কাজ করতে লাগল। মনের এমনি ধারা যে যখন ভোগে আছে তখন যে যে জিনিষ পাবার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে, যেই ত্যাগ আসে, অমনি সেই সেই জিনিষ যাতে চ'লে যায় তারই জন্যে

আগ্রহ হচ্ছে। বাসনা থেকেই হিংসা আসছে, তুমি একটা ব্যবসা করছ তোমার পাশে আর একজনও ব্যবসা করছে, তোমার চেয়ে তার ভাল ব্যবসা চললেই অমনি তার মত লাভ পাবার বাসনা পুরল না ব'লে হিংসা এলো এবং কিসে তার ক্ষতি হয় সেই চেষ্টা করতে থাক। এ হ'ল তমগুণীর হিংসা, তার ক্ষতি করলে যে তোমার কিছু লাভ হবে তাও নয় শুধু সে তোমার চেয়ে ভাল হবে কেন, এই ব'লে তার ওপর হিংসা ক'রে ক্ষতি করতে যাও। যদি রজঃগুণীর হিংসা হ'ত, ত তুমি তার অপকারের চেষ্টা করতে না, কিসে নিজে তার চেয়ে আরও বড় হবে তার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগতে, কিন্তু যদি তোমার ব্যবসা কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজের দুঃখের জ্বালায় তার ওপর আর হিংসা কর না, কারণ তোমার ত সব গেছে কাজেই হিংসা ক'রে তার ক্ষতি ক'রে আর নিজের লাভ করবার আশা নেই ত, তবে অনেক সময় আবার তার দ্বারাই তোমার ক্ষতি হয়েছে এই ধ'রে নিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাক, এ সবই তম-গুণীর লক্ষণ। এও দেখা যায়, যে পেটের দায়ে অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তির মত জুটছে না ব'লে চুরি করলে, হাকিম সাজা অনেক কমিয়ে দেয় কিন্তু এ রকম হয় ত বড় জোর একটা দুটো, সাধারণ চোরেরা ব্যবসা হিসাবেই চুরি করে। জন্ম জন্মান্তরীন কর্ম্মে মন বাসনা কামনার অধীন হয়ে রয়েছে, চট্ ক'রে, বাসনা যাও বললেই কি যায়? তার জন্যে কত খাটতে হবে, কত চেষ্টা করতে হবে তবে হবে; তাই সদগুরুর সঙ্গ, সাধু সঙ্গ করতে বলেছে এতে অনেকটা কমিয়ে দেবে কারণ গুরুর কাছে যাবার ইচ্ছেটাই তোমার পক্ষে চেষ্টার কাজ করলে, তুমি চেষ্টা ক'রে তাঁর কাছে যাচ্ছ কেন? না, তিনি বাসনা কিছু কমিয়ে দুঃখের কিছু নিবৃত্তি ক'রে দেবেন।

প্রশ্ন। রোগের যন্ত্রণার সময় ত তাঁকে মনে করতে পারা যায় না, তাহলে মরার সময় তাঁর নাম করতে না পারলে কি, আগে যে সে সৎ ভাবে ছিল, সদগুরু সঙ্গ করেছিল, তার দরুণ কি তাব সদগতি হবে না?

ঠাকুর। দেহ থাকতে রোগের যন্ত্রণা বোধ থাকবে, তবে যারা মনকে একেবারে উঠিয়ে নিতে পারে তাদের মন নেমে এলে যন্ত্রণা উপলব্ধি হয় বটে কিন্তু মনকে এত জড়াতে পারে না; বেদনা মানেই কোন একটা বিকৃতি হয়েছে, তা যত মনের শক্তি থাকবে তত এই বিকৃতি তোমায় দুঃখ দিতে পারবে না. এই সময় মনটা কত ঠিক থাকে তার ওপর মনের শক্তি বোঝা যায়। যন্ত্রণার জোর বেশী হ'লে মনে তাঁর চিন্তা করতে দেয় না বটে, কিন্তু যে যতটা মন উঠিয়ে রাখতে পারে তার ততটা তাঁর চিন্তা করার সুযোগ হয়, আর যন্ত্রণার জন্যে তাঁকে ডাকতে পারছি নি এই বোধ থাকলেই তাঁকে চিন্তা করা হ'ল ত; তাঁর নামের এমনই প্রভাব দিয়েছে যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজান্তে মৃত্যুর সময় তাঁর নাম করলে তিনি তাকে মুক্ত করেন, যেমন অজামিল মৃত্যুর সময় তার ছেলেকে ডেকেছিল, কিন্তু ছেলের নাম নারায়ণ ছিল, তাই মরার সময় নারায়ণ বলব ব'লে না বললেও, পাকে চক্রে ঐ কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল ব'লে মুক্তি পেলে। যে জীবনে সদগুরু সঙ্গ করেছে, সদভাবে থেকেছে. তার ত সেগুলো নষ্ট হচ্ছে না, তবে মৃত্যুর সময় তাঁর নাম করতে পারলে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায় এবং বাসনা মনে আসতে পারে না ব'লে একেবারে মুক্তি না হ'লেও অনেকটা উন্নতি হয়, কিন্তু তা ত বললেই হবে না, মনে যে সব বাসনা থাকে সেইগুলোই তখন সেই চিন্তা এনে দেয়। এ দিকে মুখে হরি হরি বলছে আবার এই সংসার ছেলে পরিবার ছেড়ে যাচ্ছে ব'লে মায়ায় কাঁদছে তাতে কি আর বেশী কাজ হয়? তবে মন্দের ভাল এই যা, মুখে হরি হরি বললেও মনের বাসনা বা মায়া আর তত জোর ক'রে ধরতে পারবে না। মরবার পুর্ব্বে যদি অজ্ঞান হয়ে যায় ত অজ্ঞান হবার সময় যে বাসনা নিয়ে অজ্ঞান হয়েছিল সেই বাসনাই কাজ করবে তাই জন্যে হিন্দুদের ঐ সময় কানের কাছে নাম শোনাবার প্রথা আছে তাতে যদি প্রাণে গিয়ে ধাক্কা লেগে কিছু তাঁর চিন্তা আসে।

পুত্র। সদগুরুর কৃপা কম বেশী হয় কেন ?

ঠাকুর। সদ গুরু ত ত্যাগী তাঁর ত কোন স্বার্থ থাকে না যে সেই জন্যে কাউকে কম কাউকে বেশী কৃপা করবেন, তবে আধার অনুযায়ী সেই কৃপা কম বেশী দাঁড়ায়, যেমন বৃষ্টি পড়বার সময় কি ব'লে পড়ে যে অমুক জায়গায় বেশী জল দেবে তথাপি পাত্র হিসাবে কম বেশী দাঁড়ায়। সাধারণ সংসারী হিসাবে দেখ না, তুমি কয়েক জনকে খাওয়াতে বসেছ, তোমার ত ইচ্ছে সকলকেই সমান ভাবে পেট ভরিয়ে খাওয়াই কিন্তু কেউ দু খানা খেলে আবার কেউ বা চার খানা খেলে, তুমি সবাইকেই সমানভাবে খাওয়াতে চাইলে কি হবে, যার দু খানাতেই পেট ভ'রে যায় তাকে চার খানা দিলে সে ফেলে দেবে, আবার যে চার খানা খেতে পারে তাকে দু খানা দিলে তার পেট ভরবে না, কাজেই যার যত টুকু দরকার তাকে তত টুকু দাও, সেই রকম বেশী কৃপা করলেও নিতে পারবে কেন ? সে শক্তি কই ? জোর ক'রে দিলে হয় ত টেনে দৌড় মারবে সহ্য করতে পারবে না। কেউ সব ছেড়ে পাগল হয়ে ছুটছে, আর কেউ সব বজায় রেখে আসছে, এ দুই কি সমান হবে ? যে সব ছেড়ে আসছে তার ভেতরে যে আর কিছু নেই, তার ক্ষিদে খুব বেশী তাই তাকে সেই পরিমাণ না দিলে তার পেট ভরবে কেন, সে তৃপ্তি পাবে কেন ? আর, যে সব বজায় রেখে নীতি হিসাবে আসে তার ভেতরে অপর অনেক জিনিষ আছে ব'লে ক্ষিদেও কম, তাকে বেশী দিলে সে ফেলে দেবে, তাই সদগুরু অবস্থা বুঝে যার যেমন দরকার তাকে তেমনই দেন। তিনি যেটা ব'লে দেন সেই টাই তার পক্ষে তার অসুখের ঠিক ওষুধ, তবে, সদ গুরুর সঙ্গ করতে করতে আধার বেড়ে যাবে তখন আবার বেশী নিতে পারবে ; এই দুজনের লক্ষণই দেখ না কত আলাদা, যে সব ছেড়ে আসছে তাকে দু ঘণ্টা আমার কাছ থেকে চ'লে যেতে বললে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে, আবার যে সে ভাবে আসছে

না তাকে দু ঘণ্টা থাকতে বললে নানা অছিলা ক'রে, নানা কারণ দেখিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

পুত্তু। মূলে ক্ষতি নেই এমন জিনিষে অপরের প্রবৃত্তি না থাকলে আমার প্রবৃত্তি থাকলে তা নিয়ে চলতে দোষ কি?

ঠাকুর। কতকগুলো জিনিষ আছে তোমার ঘৃণা হয় না কিন্তু আশে পাশে যারা থাকে তাদের ঘৃণা হয়, তখন তাদের সঙ্গে বাস করতে গেলে তাদের ভাবে তোমায় মেনে চলতে হবে, আর কতক গুলো আছে ঘৃণা না থাকলেও খেলেই অপকার হবে, সে গুলো বন্ধ করতে হবে। সমাজে থাকতে গেলেই সব সময় সকলের সংস্কার ছেঁটে ফেলে থাকা যায় না; তোমাদের মেয়েদের সংস্কার আছে দু বার তিন বার কাপড় ছাড়া, এর বিরুদ্ধ করতে গেলেই গোলমাল হবে, তবে রাত্রে ঘুমুবার পর সকালে কাপড় ছেড়ে ফেলা উচিত কারণ ঘুমুবার সময় দেহ থেকে যে খারাপ জিনিষ গুলো লোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই গুলো কাপড়ে থাকে তাতে অপর অসুখ হতে পারে তাই একবার সকালে কাপড় ছাড়া ভাল, আর লোমকূপ গুলো ঘামে বা ময়লায় বন্ধ হয়ে থাকলে বাইরের পরিষ্কার হাওয়া প্রভৃতি ভেতরে যেতে পারে না আবার ভেতরের ময়লা বেরুতে পারে না, তাতে মন চঞ্চল ক'রে দেয়, তাই স্নানের ব্যবস্থা আছে।

কৃষ্ণ কিশোর। সংসার করতে করতে হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে সাধু স্থানে আসা একটা গ্রহের ফের মনে হয়, কেন না এর কোন পরিণাম জানা যায় না, এ দিকে গেলে কি হবে কিছুই জানা নেই।

ঠাকুর। গ্রহের ফের কাকে বলে? আনন্দ পাচ্ছে হঠাৎ দুঃখ পেলে গ্রহের ফের বলে, আর সংসারে দুঃখের ঠেলায় অস্থির হয়ে কিছু আনন্দ পাওয়ার আশায় ছেড়ে আসা কি গ্রহের ফের? সংসারে ত ঘেয়ো কুকুরের মত থাকা, ঘেয়ো কুকুর যেমন নিজের মাথার ঘায়ে অস্থির হয়ে বেড়ায় ও যে কাছে যায় তাকে কামড়াতে যায়,

তেমনি সংসারের দুঃখে কষ্টে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হয়ে রয়েছ এবং কেউ কিছু বলতে গেলে অনেক সময় সে ভাল বলছে কি মন্দ বলছে না দেখেই আগে তাকে খেঁকিয়ে ওঠ। এত দুঃখ কষ্ট পেয়েও যত ক্ষণ সংসার ভাল লাগে তত ক্ষণ কি ছেড়ে আস ? যত ক্ষণ আশা থাকবে তত ক্ষণ দুঃখ যাবে না, সংসারে পঞ্চাশটা আশার ঝুড়ি নিয়ে ব'সে আছ কাজেই দুঃখও পর পর সাজান রয়েছে কিন্তু এ পথে আসবার সময় সব ছেড়ে কেবল ভগবানের ওপর একটা আশা নিয়ে চল, তা ছাড়া সংসারের আশা নিয়ে চললে দুঃখ পাও কিন্তু ভগবানের আশা নিয়ে গতি করলে ক্রমশঃ আনন্দ পাও। সংসারী সর্ব্বদা সুখের আশায় ঘুরছে, দুঃখ কেউ চাচ্ছে না অথচ সকলেরই ত দুঃখের ইতি নেই, এই গুলোই গ্রহের ফের তাও সংগুরুর ঠিক শরণাগত হতে পারলে যদিও গ্রহ কিছু কাজ করবেই, মোটের ওপর তত ক্ষতি করতে পারে না। অনেকে বলে সাধু হওয়া ত ভাল বেশ চুপ ক'রে ব'সে খেতে পাওয়া যায়; মুখের কথা ব'লে দিলে ত ঠিক চুপ ক'রে বসাটাই কি সোজা কথা, সংসারে সবাই ত চুপ ক'রে ব'সে থাকতে চায়। এক দিন ছুটী পেলেই ব'লে 'আ! একটু ঘুমিয়ে নিই কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে কই ? যত ক্ষণ বাসনা রয়েছে, আশা রয়েছে তত ক্ষণ একটা না একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছেই যেন ঘাড়ে ধ'রে ছোটাবে বসতে দেয় কই। এ ত সংসারে নিজেরাই বুঝতে পার, একটা সামান্য বাটী হারালেই, একখানা কাপড় হারালেই হৈ হৈ ক'রে সকলকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোল, আর তোমরা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারবে ? যত বড়ই কুড়ে হোক তার ছাতায় বা সামান্য একটি জিনিষে হাত দাও দেখি, কেমন সে চুপ ক'রে ব'সে থাকে ? রাজসিক বুদ্ধি থাকতে আশার কার্য্য যাবে না, সাত্ত্বিক বুদ্ধি এলে আশার কাজ ক্রমশঃ কমতে থাকে, আর শুদ্ধ সত্ত্বে আশা থাকে না তখন মানুষ ঠিক স্থির হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে, এই চুপ ক'রে বসবার জন্যেই এত চেষ্টা, তা ভিন্ন, একটা গেরুয়া পরলেই যদি

সব ছেড়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না, এত সোজা হ'লে এই ঘর এত দিনে ভ'রে যেত। আর, তুমি যে বললে সব ছেড়ে ছুড়ে আসে, তা, ছাড়া কাকে দেখলে? এই যে এত লোক এখানে আসে একটার নাম কর, যে সে সব ছেড়ে এসেছে, কেউ ছাড়েনি সকলেই ধ'রে আছে, তবে ওরই মধ্যে কম বেশী, আর এ দিকে যখন আসছে তখন এ গুলো ছাড়বার চেষ্টা আছে কিন্তু কি করবে ছাড়তে পারে না, এই করতে করতে হয় ত এক দিন ঠিক ভাব লেগে ছাড়তে পারবে, এ পথের এইটুকুই লাভ। সংসারে থাকলে ছাড়তে চাইবেও না পারবেও না। যত দুঃখ পাচ্ছ তত আরও ধরছ, ভাবলে, টাকা পেলে সুখ পাবে কিছু টাকাও হ'ল হয় ত, কিন্তু যখন সুখ পেলে না, তখন হয় ত ভাবলে বাড়ী হ'লে সুখী হবে. কি ছেলে হ'লে সুখী হবে, তা রাজা রাজড়া থেকে সবাইকেই দেখ কারুর টাকা আছে, কারুর বাড়ী আছে, কারুর যশ মান আছে, কারুর ছেলে আছে কিন্তু সুখী কেউই নয়, তা হলেই দেখ, যে সব জিনিষ পেলে সুখ হবে মনে কর তাতে সুখ হয় না, এই বোধটা না আসা পর্য্যন্ত ঠিক সুখ কিসে পাওয়া যায় তা ভাববেই না; যখন ঠিক বুঝবে যে এতে সুখ নেই তখনই ঠিক সুখের আশায় বেড়াবে, তখনই দেখবে সাধু ঋষিরা সংসারে সুখ না পেয়েই ত সব ছেড়ে ভগবানের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে, আর তারা সকলেই ব'লে গেছে এই পথ ছাড়া ঠিক সুখ বা শান্তি পাবে না, আবার ত্যাগ না এলে এ পথে গতি করতেই পারবে না। যার ঠিক ত্যাগের ভাব এসেছে সেই এ পথে আসতে পারে, আর সেই কেবল এক দিন সত্যি সত্যি সব ছেড়ে বেরুতে পারে, এর সংখ্যা দলে দলে পাওয়া যায় না, দলের মধ্যে হয় ত দুটী একটি ঠিক ত্যাগী আছে যারা বাস্তবিকই সব ছেড়ে এসেছে তা ভিন্ন কেউ ছেড়ে আসেনি, তবে ওরই মধ্যে যাদের মনে সৎ হবার চেষ্টা আছে তারা সৎ না হলেও, তাদের ত্যাগ না এসে থাকলেও, মনের মধ্যে যে একটা সৎ হবার ইচ্ছা হয়েছে, তাতেই ঠিক

পথে নিয়ে যাবে, কিন্তু আবার কয়েকজন এমন আছে তারা কোনও কাজেরই নয়, তারা না পারে সংসার করতে, না পারে ধর্ম্ম করতে, ভেতরে হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, দেহসুখ, মান, অভিমান সবই ঠিক রয়েছে অথচ এই দেহটার জন্যেই পরাধীন হয়ে অর্থাৎ পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাইচে, এ ত কাপুরষতা। তারা কি ইচ্ছা করলেই শুধু এই দেহটার খরচই অর্থাৎ ক্ষুধার অন্নই কি নিজে জোগাড় করতে পারবে? কখনই না, তাদের চেয়ে সাধারণ সংসারীও ঢের ভাল, তারা তবু পাঁচটার ভার মাথায় নিয়ে নিজে চেষ্টা ক'রে চালাচ্ছে। সাধারণ সংসারীদেরও যে টুকু সাধারণ বুদ্ধি আছে এই সব গেরুয়া পরা লোকদের সে টুকুও নেই। যে যত নীচ জাতই হোক, একবার যার কাছে উপকার পেয়েছে, বা একবার যার খেয়েছে অন্ততঃ মুখেও সেটুকু স্বীকার করে কিন্তু এদের ভেতর এমনও আছে, এত দিন যার খেয়ে এলো তারই নামে যা তা নিন্দে, এই ত তাদের বৃত্তি, তারা এটুকু বোঝে না, যে গেছ কাকে দেখে? নিন্দে করছ কার? যে শক্তির আশ্রয়ে গিয়েছিলে, নিন্দে করলে সেই শক্তিরই নিন্দে করলে, কারণ যারা সেখানে কর্ত্তা হয়ে আছে তারা সেই শক্তির আশ্রয় পেয়ে সেই শক্তির দ্বারাই চালিত হচ্ছে। সেই সব মহাপুরুষের আশ্রমে তাঁদের নাম শুনে যখন গেছ তখন তাঁরাই তোমার লক্ষ্য, তাঁরাই তোমার সাধনা, কেবল তাঁদের উপদেশ নিয়ে, নিজের দোষ খুঁজে খুঁজে ছাড়তে চেষ্টা কর তবে ত উন্নতি করতে পারবে। অপরের যাই দোষ থাক না, সে নিজে তার ভাবনা ভাবুক, তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি নিজে খোঁড়া, তোমার অপর এক জন খোঁড়াকে দেখবার দরকার কি? যে তোমায় তুলতে পারবে কেবল তাকেই দেখ, এদের দেখে মনে ক'রো না যে ছেড়ে এসে কি লাভ হবে এরা ত কিছুই ছাড়েনি। যদি দেখতে চাও ছেড়ে আসাটা গ্রহের ফের কি না, তা হলে যারা ঠিক ছেড়ে এসেছে তাদের দেখ, দেখবে কত আনন্দে আছে; এরই মধ্যে দেখ বেটা ছেলেদের ভেতর ভক্তরাজ, আর

মেয়েদের ভেতর যোগমায়া, এরাই কেবল ঠিক সব ছেড়ে ত্যাগ ক'রে এসেছে, এদের ভেতর দেখ সাফ, সর্ব্বদাই বালকের ন্যায় পবিত্র আনন্দ ভোগ করছে, মনে কোন রকম কিছুর ছায়ার লেশ মাত্র নেই। যে ছেড়ে আসবে তার ভেতর মান অভিমান থাকবে না, প্রথমেই তাকে উপেক্ষা করতে শিখতে হবে, কোথায় কে কি বললে এই নিয়ে থাকতে গেলে তার আর এ দিকে গতি করবার সময় কই? সমস্ত দিনই একটা না একটা এ রকম লেগে থাকবেই। তা, এই সংসার দুঃখের ভেতর থেকে যদি কেউ ছেড়ে আসতে পারে সে ত মহা ভাগ্যবান। পরিণাম ভাববে দেহের পর অর্থাৎ দেহান্তে, আর এই দেহের পরিণাম ত জান, দেহ যাবেই, এখন মাঝ খানে সুখ দুঃখের হাতে প'ড়ে যে কষ্ট টা পাচ্ছ সেই টা কমাবার জন্যে চেষ্টা করছ, তা যে দিকে গেলে কষ্ট কমে সেই দিকেই যাও, যদি বোঝ সংসারে থাকলে কষ্ট পাবে না, ত ছাড়বে কেন? এ পর্য্যন্ত সংসারে কেউ সুখ পায়নি ব'লেই না ছেড়ে আসার ব্যবস্থা; সংসারে স্ত্রী পুত্রকে ভালবেসে ত কেউ সুখ পেলে না, তাই, যদি সে সব বজায় রেখেও সৎ এ কিছু ভালবাসতে পারে ত সৎ এর প্রভাবে ও দিকটা (সংসারটা) ক্রমশঃ ক'মে আসবে, এ কি কম লাভ? এও যদি না ধর, ত, যে সময়টা সংসারে বাজে গল্প ক'রে, অসৎ সঙ্গে কাটাতে সে সময়টাও অন্ততঃ সৎ সঙ্গে, কিছু সৎ নীতি নিয়ে, সৎ ভাবে কাটালে, কাজেই এ পথে যে টুকুই এসো, তার লোকসান ত কিছুই নেই পুরোই লাভ, এতে ক্রমশঃ সৎ বুদ্ধি আসবে। সাধারণের মত সকল সময় সংসারের পেছনে না দিয়ে কিছু সময়, অন্ততঃ যে টুকু ফুরসুত পাও, গল্প না ক'রে বা থিয়েটার, বায়োস্কোপ না দেখে যে এই সৎ স্থানে এসে ব'সছ, মনে মনে সৎ হবার ইচ্ছা নিয়ে ধ্যান জপ করছ, দেবস্থানে যাচ্ছ এবং কই, কিছুই উন্নতি হ'ল না ত, ব'লে মনে মনে যে একটা অশান্তি ভোগ করছ, এর মানেই হচ্ছে মনে সৎ হবার একটা আকাঙ্খা হয়েছে। সব ছাড়া কি সোজা কথা?

যে মাতাল মদ খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকে, সে হয় ত, নেশা ছুটে গেলে কালী বাড়ী গিয়ে প্রতিজ্ঞা করছে যে সে আর মদ খাবে না, কিন্তু এমনই রিপুর তাড়না যে ঠিক সময় হয়ে এলেই মনটা ছট ফট করতে থাকে, আর, তার ওপর একটা ঐ দরের বন্ধু এলেই প্রতিজ্ঞা সব ভুল হয়ে গেল, সে আবার মদ খেলে। সে জানে যে এটা খারাপ জিনিষ, এটা ছাড়া দরকার, এর জন্যে তার মনে কিছু অনুতাপও হচ্ছে, নইলে কালী বাড়ীতে মাকে জানাতে যাবে কেন? কিন্তু পেরে উঠছে না। তার সৎ হব, মদ ছেড়ে দেব এই ভাব নিয়ে মাকে জানিয়ে সে যখন চেষ্টা করছে তখন এইটে ধ'রে থাকলে এক দিন তার এ বৃত্তি বদলাতেই হবে। এইটে যে অসৎ সঙ্গ এই বোধ ও এই অসৎ সঙ্গ ছাড়বার ইচ্ছে কি সাধারণ জিনিষ, তবে প্রথমে এই ভাবটাকে খুব ধৈর্য্য সহকারে ধ'রে রাখতে হবে নইলে এ টুকু ভেঙ্গে গেলে কি ক'রে হবে? তা, এই ধৈর্য্য কোথায় নেই বল; টাকা রোজগার থেকে আরম্ভ ক'রে সংসারে এক একটা বাসনার পেছনে কত ধৈর্য্য নিয়ে ছুটছ বল দেখি। মানুষের সন্তান হচ্ছে, দুঃখ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, তবু আবার ছেলে চাইছে, আশা কি? না, বারবারই কি যাবে একটা ত থাকবে; কবে একটা থাকবে কি না, এই আশায় কত ধৈর্য্য ধ'রে চলবে, তবু বলবে না যে এর জন্যে যখন এত দুঃখ পাচ্ছি এ আর দরকার নেই, এ কথা ভুলেও বলবে না। সংসারে এত জিনিষে এত ধৈর্য্য ধ'রেও সেই দুঃখেই পড়ছ তত্রাচ ছাড়বার নাম নেই, আর এ দিকে কিছু ধৈর্য্য ধ'রে চললেই প্রথম থেকেই বুঝতে পারবে যে দিন দিন মনে শান্তি আসছে; তখন দেখবে, যে সেই একই দুঃখ আর পুর্ব্বের মত ধাক্কা দিতে পারে না। শাস্ত্র কথা ত সব পুরান, নতুন কিছুই নেই, শুনেছও অনেক বার কিন্তু কিছুই হয়েছে কি? যে সেই গুলো শোনাতে পারে তারই কাছে শোনাই হ'ল ঠিক শোনা; সদগুরু শুধু উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেন না ত, তিনি জোর ক'রে সে গুলো শুনিয়ে নেন।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান, সঙ্গ অনুযায়ী ভাব বৃদ্ধি হয়; মন যত বদ্ধ হয় তত অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়, আর যত বাসনা কমতে থাকে তত ঠিক জ্ঞান আসে, নজর ঠিক মত পড়ে এবং বৃত্তি গুলো সব ঠিক হয়ে আসে, সেই জন্যে এত ক'রে বার বার সঙ্গ করতে বলেছে, বিশেষতঃ সংসারীদের সাধন ভজন ক'রে যাবার ক্ষমতা নেই, তাদের সঙ্গ ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। শাস্ত্রে ত অনেক কথা লেখা আছে, ভাল কথা শুনতেও ত কসুর নেই কিন্তু বিনা সাধনে শাস্ত্রের ঠিক ভাব ধ'রে চলা যায় না। ত্যাগ ভিন্ন ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য বোঝা বড় মুস্কিল। মায়াবদ্ধরা সংসারে মায়ার অধীন হয়ে থাকে, আর মায়ামুক্তরা মায়া অধীন ক'রে সংসার করে। মায়ার ভেতরে থেকে মায়ামুক্তদের ব্যাপার বোঝা বড় কঠিন, রামচন্দ্রের বনে যাওয়ার কথা শুনে লক্ষ্মণ এসে বলছে 'পিতা স্ত্রৈণ, তিনি বুড়ো হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন তাই স্ত্রীর কথায় তোমাকে বনে পাঠাচ্ছেন, এ রকম পিতার কথা শোনার দরকার নেই'? তখন রাম বলছেন 'ছিঃ লক্ষ্মণ, তুমি না আর্য্য পুত্র, তুমি অনার্য্যের মত কথা ব'লো না; যারা ধার্ম্মিক তারা জগতের আর কোন জিনিষ গ্রাহ্য করে না, কেবল অধর্ম্মকেই ভয় করে, পিতা আজ সেই অধর্ম্মের ভয়ে আমাকে বনে পাঠাতে বাধ্য হলেন, কারণ তিনি স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে অধর্ম্ম হবে, তিনি স্ত্রৈণ নন। আবার দেখ, সেই রাম একবার সীতা হরণে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন কিন্তু কর্ত্তব্য পালনে প্রজারঞ্জনের জন্য, রাজকার্য্যের সম্মান হেতু সেই সীতাকেই পুনরায় বনে দিলেন, তখন লক্ষ্মণকে আগে কঠোর ভাবে আদেশ দিলেন ঠিক যেমন বলব সেই রকম কাজ করবে, কেন জিজ্ঞাসা করবে না; সীতাকে বাল্মিকী আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে আসবার সময় তাকে এই কথা ব'লে সেখানে

রেখে আসবে, যে রামচন্দ্র জানেন যে সীতা সতী কিন্তু প্রজারা ত সে কথা ধারণা করতে পারে না, তাই তাদের জন্যে সীতাকে ছাড়তে হ'ল, তা দেখ কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বেলা স্ত্রী, পুত্র কিছুই দেখলেন না। যে সীতা সব ছেড়ে তাঁর সঙ্গে বনে এসেছে তার জন্যে শোক প্রকাশ না করলে যে নিষ্ঠুরতা হবে তাই অত কেঁদেছিলেন, যদি সাধারণের মত মায়ার ঠেলায় কাঁদতেন ত আবার এত কঠোর হয়ে বনে দিতে পারতেন না। পাছে রাজ্যের মধ্যে সীতাকে স্পষ্ট বললে লক্ষ্মণ ও অন্যান্য লোকে সীতার পক্ষ নিয়ে একটা গোলমাল বাধায়, তা রক্ষা করবার জন্যে সীতাকে বাল্মিকী আশ্রমে যাবার নাম ক'রে পাঠালেন; আবার লক্ষ্মণের রামের ওপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও রাগ ভাঙ্গবার জন্যে লক্ষ্মণ ফিরে আসা পর্য্যন্ত শোকে অধীর হয়ে রাজকার্য্য পর্য্যন্ত এমন ভাবে ছেড়ে রইলেন যে লক্ষ্মণকেই আবার বোঝাতে হ'ল। প্রজাদেরও দেখান হ'ল কি কঠোর নীতিজ্ঞ রাজা, ন্যায়ের বিচারের বেলা কারুর নিষ্কৃতি নেই, স্ত্রীরও রক্ষে নেই; আবার রাজকার্য্যের প্রথা বজায় রাখবার নাম ক'রে স্বর্ণ সীতা পাশে রেখে রাজত্ব করলেন, তাতে সীতার পক্ষে যারা তারাও খুসি হ'ল যে রামের সীতার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা আছে তবে কি করবে কর্ত্তব্যের খাতিরে তাকে ছাড়তে হয়েছে; তা হলেই দেখ, কি ভাবে রাজনীতি সমাজনীতি একাধারে রক্ষা ক'রে স্ত্রীর প্রতি, প্রজার প্রতি এবং আত্মীয় স্বজন সকলের প্রতি কর্ত্তব্য অক্ষুন্ন রাখলেন, সবাইকে এক সঙ্গে সন্তুষ্ট করবার জন্যে শেষে স্বর্ণ সীতা পর্য্যন্ত সিংহাসনে বসিয়ে রাজনীতির চূড়ান্ত দেখিয়ে দিলেন। আবার রাবণ এ দিকে যে ভাবেই চলুক যুদ্ধের সময় চিত্রাঙ্গদা বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও একমাত্র পুত্রের জীবন ভিক্ষা ক'রেছিল ব'লে এত প্রিয় রাণীকেও কারাগারে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। মায়াকে বড় ক'রে তার অধীন হয়ে, রাজত্বই বল, আর সংসারই বল, কারণ সংসারও ত একটা ছোট খাট রাজত্ব, কোন খানে শান্তি পাবে না কিন্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে যাই কর ঠিক চলবে।

সেখানে স্বার্থ থাকতে পারে না; ত্যাগের পথে, সংসারকে অধীন ক'রে কাজ করলে কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের সুবিধার দিকে নজর থাকে না। সৎ গুরু সঙ্গে এই ভাব গুলো আনিয়ে দেয় তাঁরা ত কারুর ভাল মন্দ দেখেন না, কারণ মন্দ যখন থাকে না, বদলে যায়, তখন সে দিকে তাঁরা নজর দেন না, তাঁরা দেখেন কে কতটা ত্যাগ ক'রে, কতটা ভালবেসে আসছে; তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে ত্যাগ আনিয়ে দেওয়া, তখন সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। সদগুরু সঙ্গের এমনি প্রভাব যে অতি দুরাচারী কপটও যদি কিছু সময় তাঁর সঙ্গ করে এবং বিশ্বাস রেখে তাঁর কাছে আসে তারও সেই বৃত্তি বদলে দিয়ে তাকেও সৎ দিকে গতি করায়। সরল ভাবে তাঁকে ডাকলেই ঠিক ঠিক জ্ঞান আসবেই। এই খানে ঠাকুর "ডাকাতের ব্যাকুল ক্রন্দনে কাল পুঁটলি সাদা হওয়ার গল্প বললেন। সংসারীদের পক্ষে সংসার বজায় রেখেও অন্ততঃ কিছু সময় নিয়মিত সাধু সঙ্গ করা উচিত, তাতে মনের ঢের শক্তি বাড়ে এবং সঙ্গে ভালবাসা আনিয়ে দেয়, এই ভালবাসা লাগানই আসল কাজ, একবার ভালবাসা লাগাতে পারলে গতি করা খুব সহজ হয়ে যায়; যার ঠিক ভালবাসা লেগেছে তাকে দুনিয়া এক হয়ে টানলেও সে ছেড়ে যেতে পারবে না, সে যত রকম বাধা থাক, তুচ্ছ ক'রে ছুটে আসবে, আর যার লাগেনি তাকে যত জোরেই টানা টানি করা যাক সে আসবে না। যারা বাধা গুলো বজায় রেখেও সাধু সঙ্গ করে, তাদেরও নীতি বল ভাল, এই নীতি ঠিক পালন করতে করতেই এক দিন হয় ত পাগল ক'রে দেবে, তাই নিয়মিত নীতি রক্ষা ক'রে সাধু সঙ্গ করা বিশেষ দরকার। সদগুরু আর কে? সেই ব্রহ্মময়ী মার শক্তিই তাঁর ভেতর দিয়ে কাজ করে, সেই জন্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর সঙ্গ করলেই কাজ হতেই হবে। তিনি কি জানেন না যে ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশলে নানা ধাক্কা খেতে হবে তবু তিনি এ সব জেনে ঘাড়ে নিয়ে সঙ্গ করতে চান কেন? তোমাদের মঙ্গলের

জন্যে। তোমাদের জোর ক'রে ধ'রে বৃত্তি গুলো বদলে ভালবাসার মোড় বেঁকিয়ে ঠিক পথে লাগিয়ে দিতে না পারলে তোমরা যে এ দিকে আসবে না, তাই লোক শিক্ষার জন্যে সদ গুরুকে এত ভালবেসে, সবাইকে টেনে আপন ক'রে, তাঁর ভালবাসা ছড়িয়ে তাদের ভেতর ভালবাসা আনিয়ে দিতে হয়, তা ভিন্ন সাধারণ গতি করতে পারে না।

জ্ঞান (গোস্বামী) গাহিল

বল'না, ভুলিতে ব'লো না।
সে কি ভুলিবার ধন রমণী মোহন
হেরিবারে করি কত সাধনা।
চাহিনা অন্যে, চাহি বনমালী
আমি যে পদে দিয়াছি মন প্রাণ ঢালি
নহি সখি আমি পথের কাঙ্গালী
শ্যাম ভিখারিনী ললনা।
কলঙ্কেরই কথা হতাশেরই ব্যথা
কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা।
করি সোহাগেরই হার পরেছি গলায়
খুলিবারে পাই কত যাতনা॥

———

চতুর্থ ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ১১ই ভাদ্র ১৩৪০,
ইং ২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, প্রফুল্ল, কালু, জিতেন, কেষ্ট, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কৃষ্ণকিশোর, হরপ্রসন্ন, নীরোদ, ইন্দ্র, মতি ডাক্তার, অমল, পুত্তু, তারাপদ, মৃত্যুন, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

কৃষ্ণকিশোর। মানুষরাই কেবল, কর্ম্মভোগ করে কি?

ঠাকুর। হ্যাঁ, মানুষের ভেতর বিবেক আছে, তখন ফলাফলের বিচার থাকে, কর্ম্মফল ত সেই সব জিনিষের যোজনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণ কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি ভাব নিয়ে এখানে আস?

কৃষ্ণ কিশোর। গোড়ায় কিছু লাভের আশা ছিল কিন্তু এখন আর সে সব আশা কিছু নেই।

ঠাকুর। যারা সংসার ছেড়ে বেরুবে তাদের ভয়ানক কঠোরতা করতে হবে, মান, অভিমান, বা দেহসুখ থাকতে দাঁড়ান বড় কঠিন, তাই সংসারের সুখ ভোগের আশা থাকতে সংসার ছেড়ে বেরুতে নেই। প্রথমে সঙ্গ করতে হয়, সঙ্গ করতে করতে ভালবাসা পড়লে এই পথে আসবার মত ঠিক বেগ আসবে, তখন ভালবাসা আছে, ছাড়বার ইচ্ছাও হচ্ছে কিন্তু কষ্ট সহ্য করতে পারে না ব'লে ছেড়েও যেতে পারে না, তাতেই মনে দুঃখ পায়। বিনা তিতিক্ষায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াবার যো নেই, সংসার ছাড়বার আগে দেহসুখ কমাতে হবে, রসনা জয় করতে হবে এবং মান, অভিমান নষ্ট করতে হবে। এই হ'ল সংসার ত্যাগের উপযুক্ত হওয়ার লক্ষণ, এই গুলো ঠিক ক'রে

বেরুতে পারলে পরে ভেতরের রিপু অধীন করা ও আসল ত্যাগের কথা ভাবতে পারবে। তবে যাদের গুরুতে ঠিক বিশ্বাস ও ঠিক ভালবাসা আছে তাদের এত কঠোরতা দরকার নেই। তত্রাচ দেহের জন্যে ভয়টা নষ্ট করবার জন্যে, এবং মনের শক্তি কত টুকু হয়েছে বা দুঃখে পড়লে কতটা শক্তি রাখতে পারে সেইটে দেখবার জন্যে গুরু অনেক সময় শিষ্যের শক্তি অনুযায়ী কঠোর করিয়ে নেন।

জিতেন। জ্ঞানী বা ভক্ত, এ ত কিছু এগুবার পর, গোড়ায় ত সবই এক ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, গোড়ায় সবই এক। যখন সংসারে দুঃখ পেয়ে কিসে সেই দুঃখের নিবৃত্তি করা যায় সেই চেষ্টা কর তখন তুমি জ্ঞান বিচার দ্বারা গতি করতে চাচ্ছ; আর, যখন ভগবানকে ডাকলে তিনি সকল সময়ই মঙ্গল করেন তাতে সুখ আসতে হয় আসুক দুঃখ আসতে হয় আসুক এই ভেবে তাঁকে ধর, তখনই ভক্ত ভাবে গতি কর। যে ভাবেই যাও সৎ হবার জোর ইচ্ছা থাকা চাই এবং কিসে সৎ হওয়া যায় এইটে লক্ষ্য রেখে লেগে থাকতে হবে।

নীরোদ। ইচ্ছে আছে, লেগেও আছে তথাপি কর্ম্ম অনুযায়ী বাধা পায় কেন ?

ঠাকুর। দেখ, জগতটাই যে বাধাময়, যখন যে জিনিষটা চাইবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধটা এনে দেবে, সুখ চাইলেই দুঃখ এসে হাজির হবে, আলো চাইলেই অন্ধকার আসবে; এ জগতের নিয়ম। তোমার ইচ্ছে প্রবল হ'লে সেই বাধাটা অতিক্রম ক'রে যাবে, বাধা পেলেও ফিরবে না। এই ধর্ম্ম পথে আসতে গেলে সংসারে যে যে সংস্কারে আছ সেগুলো আগে ছাড়তে হবে তা হলেই দেখ প্রথমেই বিরুদ্ধ। এ গুলো ত হ'ল বাইরের বিঘ্ন, যদিও বা এ গুলো অতিক্রম করতে পারলে এর পর ভেতরের বিঘ্ন সংশয় আসবে, এ হচ্ছে খুব বড়

বিঘ্ন। তখন মনে হবে, এই যে করছি এতে কিছু হবে কি না? সংসারের ক্ষতি ক'রে যে এ সব করতে এলুম, শেষে এ দিক ও দিক দু দিক যাবে না ত? এই সংশয় উঠলে মনে যেটুকু সৎ ভাব এসেছিল চট্ চট ক'রে কমতে থাকে এবং অনেক সময় এ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, এই সংশয় তাড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে সদ্গুরুর সঙ্গ; যত সংশয় আসুক সদ্গুরুর সঙ্গ ছাড়তে নেই, অবশ্য তাঁকে সব ব'লে সংশয় ভঞ্জন করিয়ে নেবার চেষ্টা করলে শীগ্‌গীর কাজ হয়।

নীরোদ। পরমহংসদেবের কথায় 'মা যেন পা পিছলোয় না', এই ব'লে কাঁদলে হতে পারে ত?

ঠাকুর। হ্যাঁ, কান্না মানেই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি সেই বস্তুর জন্য খুব লালায়িত। যে বস্তুর জন্যে মনে খুব জোর আকাঙ্খা ওঠে এবং মন জোর ক'রে ধ'রে থাকে সে বস্তু লাভ হবেই। কান্নাটা এই জোর ধ'রে থাকার একটা লক্ষণ, তবে কান্না যে দরকারই, তা নয়। আসল কথা বাসনা ত্যাগ করতে হবে, বাসনা নিবৃত্তি হলেই শান্তি আসে বাসনা নিবৃত্তি মানেই সব ত্যাগ, ত্যাগ ভিন্ন কিছু হবার যো নেই, তবে সংসারে থেকে তৈরী হতে হয়। প্রথমে সংসারে থেকে মনটা আস্তে আস্তে, সংসার থেকে তুলে নিতে হয় অর্থাৎ একটা একটা ক'রে সংসার বাসনা সব ত্যাগ করতে হয়, তার পর একেবারে মন তুলে নিতে পারলে তখন সংসার করলেও আর ক্ষতি নেই। তা, সংসারে থেকে একেবারে মন তুলে নোওয়া বড় কঠিন, তাই সংসারে খানিকটা তৈরী হয়ে এক বার বেরুতে হবে তবে মন একেবারে তুলে নিতে পারবে, তা ভিন্ন, ভদ্র ভাবে সংসার করতে পারবে। ভদ্র ভাবে হচ্ছে, পরের অপকার করবে না, পশুর মত রিপুর এত অধীন হবে না যে ক্রোধ হবা মাত্রই যা তা ক'রে বসবে, নিজের স্বার্থটাকেই সব চেয়ে বড় করবে না। এ গুলো ত অন্ততঃ হওয়া চাই তবে ত তুমি সৎ সংসারী হবে, নইলে ত তুমি ভদ্র ঘরে জন্মে অতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মত একটা যা তা হয়ে রইলে।

নীরোদ। সুষুপ্তি অবস্থায় যে সব দেব দেবীর বা মহাপুরুষের স্বপ্ন দেখা যায় সে গুলো কি ঠিক? কোন মহাপুরুষ জীবিত অবস্থাতেও কি স্বপ্নে দেখা দেন? আর এ রকম অবস্থায় সংসার ত্যাগ করা চ'লে কি?

ঠাকুর। সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায় না, তিনটে অবস্থা আছে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি; স্বপ্ন অবস্থায় অর্দ্ধেক ঘুমন্ত অর্দ্ধেক জাগ্রত। সাধারণ মনের অবস্থায় অর্থাৎ মন সাধারণ বৃত্তিতে থাকলে স্বপ্ন বেশীর ভাগই মিথ্যা হয়, আর কিছু সত্যও হয় কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হ'লে যে সব স্বপ্ন দেখা যায় সে সব সত্য হয়, আজ না হ'লেও ভবিষ্যতে স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ হবেই। মহাপুরুষ আর জীবিত অজীবিত কি? মহাপুরুষ সকল সময়েই জীবিত, মহাপুরুষের স্বপ্ন সত্য হয় এবং তিনি যা বলেন তাও সত্য হয়; অনেক সময় স্বপ্নে দীক্ষা পর্য্যন্ত হয়, সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মে সম্বন্ধ ছিল হয় ত, বা তাঁর তোমার ওপর কৃপা হয়েছে তাই এ সব ঘটনা হয়। স্বপ্নে দেখলে হয় ত তিনি তোমায় সন্ন্যাস দিলেন, তা হয় ত বিশ বছর পরে তুমি সন্ন্যাস নেবে তখন সেটা স্বপ্নে দেখলে। সন্ন্যাস মানে পূর্ণ ত্যাগ, সন্ন্যাস নেবার সময় শ্রাদ্ধ করা মানে তোমার মৃত্যু হল অর্থাৎ তোমার পূর্ব্ব সংস্কার, পূর্ব্ব ভাব, পূর্ব্বের সমস্ত জিনিষ ছেড়ে দিয়ে এই বিপরীত জিনিষ গুলো ধরলে, তাই সন্ন্যাস হবার আগে এই ভাব গুলো ঠিক আসা চাই, এই সব ভাব ঠিক হ'লে, ঠিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে সদ গুরু সন্ন্যাস দেন। তবে এও আছে, সদ গুরু যেমন সন্ন্যাস দিলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থা হয়ে পড়ল। সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে সব ত্যাগ শিক্ষা করতে করতে সেই অবস্থা হবে। স্বপ্ন সিদ্ধ মানে স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখলে সব মায়া প্রায় কেটে গেছে, সংসার প্রভৃতিতে আসক্তি অনেক ক'মে গেছে, ভোগের প্রবৃত্তি ছেড়ে গিয়ে ত্যাগের

দিকে মন আসছে, তখন আপনিই এ পথে এত এগিয়ে পড়লে, তারপর এই ভাবে এই পথে গতি করতে করতে শীঘ্রই অবস্থা লাভ হবে।

ইন্দ্র। কোন রূপেতে মন নির্দ্দিষ্ট করতে পারা যাচ্ছে না, অথচ ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাস আছে এবং তিনি সব তাতেই আছেন এ ধারণাও আছে; এ অবস্থায় কি রূপ ধ'রে চিন্তা করব?

ঠাকুর। সব তাতেই তিনি আছেন এই ভাব ঠিক পূর্ণ হ'লে সে ত ব্রহ্ম জ্ঞান অবস্থা, এ অবস্থা না এলে সে ভাব ঠিক আসা বড় শক্ত, কিন্তু একেবারে শোনা কথা বা বই পড়া কথা না হয়ে যদি এই ভাব ঠিক কিছু এসে থাকে তা হ'লেও অনেকটা হয়ে গেল ত। তবে এর লক্ষণ আছে, এ ভাব এলে সকলকেই সমান ভাবে দেখবে, সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করবে। যে জিনিষটা ধারণা নেই সেইটে অবস্তু, তাই যে টায় মন মজে সেই রূপ নিয়ে গতি করা সহজ হয়। যদি মূর্ত্তি ধ'রে যেতে যেতে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে আসে ত, তখন সদ গুরুর সঙ্গ ক'রে সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে গতি করতে হয়। কতক গুলো মূর্ত্তিকে ভগবান ব'লে জ্ঞান আছে, যেমন শালগ্রাম দেখলেই সংস্কার আছে ব'লে নমস্কার করা হয়, বিবেক ব'লে দিচ্ছে এইটে ভগবানের মূর্ত্তি একে পূজা কর, তখন আর তাকে সাধারণ পাথর ব'লে ধারণা কর না। আবার সুন্দর ফুল দেখে তার রূপে মন টানলে, তখন বললে বাঃ! এ বেশ ফুল ত এই ফুল দিয়ে ভগবানকে পূজা করি। অনেক সময় সংস্কার বশতঃ কালীঘাটে বা অপর তীর্থ স্থানে ভগবানের মূর্ত্তি দেখতে যাও, তোমার ধারণা আছে কালীঘাটে গেলে মঙ্গল হবে। যত ক্ষণ এই কাম্য বাসনা নিয়ে পূজা করবে তত ক্ষণ সেই বিধি মত পূজা করতে হবে; যখন টাকার জন্যে লক্ষ্মী পূজা কর তখন ভগবানেরই পূজা কর বটে কিন্তু তখন ত ভগবানকে চাও না, চাও টাকা, কাজেই সেই কাম্য লক্ষ্মী পূজার বিধি আসল ভগবান প্রাপ্তির

হিসাবে অবিধিকর হ'ল; যেমন তোমার বাড়ীতে চুরি হ'লে তুমি লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে লাট সাহেব নিজে দেখা না ক'রে পুলিশের কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দেন, কারণ তখন তুমি ত সত্যি সত্যি লাট সাহেবকে চাচ্ছ না, চাচ্ছ, তাঁর যে শক্তি চুরির তদন্ত ও বিচার করে, সেই শক্তির সাহায্য চাচ্ছ। এই বিভিন্ন শক্তির বিধি পূজা তোমরা জান না বা ঠিক করতে পারবে না ব'লে যাদের সেই শক্তি আছে ও যারা এই পূজার পদ্ধতি জানে তাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পূজা করিয়ে নাও। ব্রাহ্মণের সে শক্তি ছিল, তাদের প্রার্থনা তিনি সহজে শুনবেন ব'লে, তারা গৃহস্থের হয়ে তাঁকে জানালে তিনি শুনবেন, ও কিছু ফল দেবেন এই আশায় এই রকম প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের সে শক্তি থাক আর নাই থাক, এটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে যারা তাঁকে ভালবেসে ডাকে তাদের ত কোন কামনা বাসনা থাকে না, তারা যে মূর্ত্তিতেই হোক ভগবান জ্ঞানে পূজো করলে একই কাজ হবে; তখন লক্ষ্মীকে ভগবানের টাকা দোবার শক্তি ব'লে ত পূজো কর না, ভগবানেরই আর এক রূপ ব'লে তাঁর উদ্দেশ্যে পূজো কর।

নীরোদ। দীক্ষা না নিয়ে তাঁর নাম জপ করলেও কাজ হবে ত?

ঠাকুর। দীক্ষা না নিয়ে ঠিক বিশ্বাস রেখে নাম করলে আপনি দীক্ষার কাজ হয়, যদি ঠিক বিশ্বাস রাখতে পার তবে দীক্ষার কাজ হবে তা ভিন্ন হবে না, কিন্তু সংসার এমন জায়গা, এখানে থেকে ঠিক বিশ্বাস রেখে সব সময় চলা বড় শক্ত; ঠিক যাচ্ছে হয় ত, কোথা থেকে সংশয় এসে তোমার ভাবটা ভেঙ্গে দিলে। সেই জন্যে সদগুরুর সঙ্গকে এত বড় করেছে, সদগুরু ত আর সেই মানুষটা নয়, সেই জগদগুরু ভগবান, যখন যার ভেতর দিয়ে কাজ করেন তখন তাকেই গুরু বলা হয়, কারণ তখন কেবল খোলটা তার,

ভেতরে সবই তাঁর শক্তি। সদগুরু এই সংশয় নষ্ট ক'রে দেয়, যেমন চাষা ভাল বীজ পেলে মাটী চাষ করলে কিন্তু বীজ বোনার নিয়ম না জানলে বা আগাছা না মেরে দিলে গাছ হ'লেও ম'রে যায়, তেমনি নিজে সব সময় স্থির বিশ্বাস রাখতে পার না ব'লে সদগুরুর আশ্রয় দরকার, সদগুরু আগাছা মেরে দেন। তার পর যত ক্ষণ রূপ, রস, গন্ধে আছ তত ক্ষণ রূপ নিয়ে গতি করাই সহজ; আবার, গুরুকে নিজের মত দেখছ, তাঁর সঙ্গে কথা কইছ, ব্যবহার রাখছ ব'লে, তাঁর রূপ ধ'রে গতি করা আরও সোজা, তবে সে ভাবটা ঠিক আসা চাই যে ভগবান এই গুরু মূর্ত্তিতে কৃপা করছেন। সেই জন্যে সদগুরুকে ভালবেসে এলে আপনি সেই মূর্ত্তিটাতেই মন প'ড়ে যায় এবং কত শীগ্‌গির কাজ হয়। সংসারীদের এই ভক্তি পথই সোজা আর গুরুতে এই ভালবাসা আনবারও সোজা উপায় হচ্ছে সদগুরুর সঙ্গ, ভক্তি পথে রূপ চাইই কিন্তু জ্ঞান মার্গে বা যোগ মার্গে রূপের তত প্রয়োজন হয় না। বিনা ত্যাগে এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে যোগী হতে পারা যায় না কারণ যোগ করবার আগে বিয়োগ বন্ধ করা দরকার, কলসী ছেঁদা থাকলে কি তাতে জল দাঁড়ায়? কিন্তু যত ক্ষণ না পুরো ত্যাগ হয় তত ক্ষণ একটা না একটা রূপ নিয়ে চলতেই হবে তবে চোখ মুখ গুলা কোন রূপ না নিতে পারে, যেটা ধ'রে আছে তা থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। যদি বিশ্বাস থাকে যে ভগবানের আকার আছে, সব তাতেই তিনি আছেন, অথচ কোন রূপ যদি ধরতে না পার তাতেও কাজ হবে কিন্তু তখন আর কোন জিনিষই ধ'রো না। জ্ঞানী নেতি নেতি ক'রে সব ত্যাগ ক'রে যায়, জ্ঞানে সব শূন্য বলছে যখন, তখন শূন্যতে কি মুটো দিয়ে ধরবে? শক্তি বৃদ্ধি করবার সময় ভগবান যে সাকার এ চিন্তাটা নিয়েই ত থাকবে কারণ মন একেবারে চুপ ক'রে থাকতে পারে না, তা হলেই সেই একটা ধরলে, তবে যেটাকে রূপ বলছ, সেটা ত কেবল উদ্দীপনা ক'রে দেয়, যেমন পিতার

তৈল চিত্র (oilpaint) দেখলে পিতারই উদ্দীপনা হয়। মনের স্বভাব যখন যেটাকে জোর ক'রে ধরে তখন সেটাকে আকর্ষণ করে; যে রূপটাকে ভগবানের মূর্ত্তি ব'লে ধর সেটাতে তাঁর আকর্ষণ হয়, তিনি ত ভাষা দেখেন না তিনি ভাব নিয়ে কাজ করেন, তা সাকার ব'লেই ডাক আর নিরাকার ব'লেই ডাক তাঁকেই ত ডাকছ, চিত্রকর তাঁরই গুণ শুনে তার ভাবে সেই গুলো ফলাচ্ছে, এই খানে ঠাকুর "তুমি দীন তারিণী দুরিত বারিনী..." এই গানটী গাহিলেন। আসল কথা যে ভাবেই তাঁকে ডাক, ঠিক ডাকতে পারলেই দেখবে আপনি সংসার মায়া কেটে আসবে, আসক্তি ক'মে আসবে, বাসনা নিবৃত্তি হয়ে আসবে এবং মনে আনন্দ পেতে থাকবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে, যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব বৃত্তি উঠবে, ত্যাগীর সঙ্গ করলে বাসনা কমিয়ে আনবে এবং সংসারটা কি, কত টুকু সংসারে প্রয়োজন, কত টুকু না হলে বাস্তবিক সংসারের ক্ষতি হয়, এই সব ঠিক বুঝিয়ে দিলে তবে ধর্ম্মের দিকে গতি করতে চাইবে। বেশীর ভাগ লোক আর্ত্ত হয়ে অর্থাৎ সংসারে দুঃখ পেয়ে যখন বোঝে যে তার নিজের কোন ক্ষমতা নেই, ভগবান ছাড়া আর কেউ এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না তখন তাঁকে ডাকে, তাও ঠিক আর্ত্ত কটা লোক হয়? কোন বিপদে পড়লে কেঁদে পড়ল, আর যেই বিপদ কেটে গেল, অমনি সে দিকও আর মাড়ায় না। এরা সংসারটাকেই সব চেয়ে বড় ক'রে ধরেছে, টাকার জন্যে যত শরীর খারাপ হ'ক, যত ক্ষণ একটুও উঠতে পারে তত ক্ষণ অফিস কামাই করবে না, কিন্তু শরীর একটু খারাপ হতে না হতেই, পাছে শরীর বেশী খারাপ হয়ে পড়লে অফিস কামাই হয়, এই ভয়ে সাধু স্থানে আসা গোড়া থেকেই বন্ধ ক'রে দিলে; আবার অফিসে সমস্ত দিন খাটছে তাতে ক্লান্তি নেই, শরীর খারাপও হয় না, অথচ সাধু স্থানে আসবার সময়

শরীর ক্লান্ত হয় ব'লে দুদিন ত এলেই না আর যদিও বা এলে, একটু থেকে পালাবার চেষ্টা কর, এতেই বোঝ কোনটা বড় করেছ। যত ক্ষণ বাসনা আছে তত ক্ষণ সংসারে মায়া থাকবে, আর তত ক্ষণ টাকাকে ছোট করতে পারবে না, আর আমি তোমাদের টাকাকে বা সংসারকে ছোট করতে বলছি নি তবে ধর্ম্মটাকেও অন্ততঃ তার সমান কর, এটাকে একেবারে ছোট ক'রে ফে'ল না। শরীরের যে যে অবস্থায় অফিস কামাই কর না, অন্ততঃ সেই সেই অবস্থায় এখানে কামাই ক'রো না। ত্যাগ না এলে ধর্ম্মটাকে বড় করতে পারবে না, সে বললেই ত হবে না। যার অবশ্য সে ভাবে ত্যাগ এসেছে তার কথা আলাদা। সংসারে চাচ্ছ কি? টাকা না শান্তি? চাচ্ছ ঠিক শান্তি কিন্তু ভুল বশতঃ মনে কর টাকা এলে শান্তি পাবে তাই টাকাটাই চাও। আজ যদি বলা যায় দু লাখ টাকা পাবে কিন্তু ভয়ানক অশান্তিতে পড়বে, তখন কি আর টাকা চাও? আবার টাকাকে এত বড় ক'রে ধরেছ ত, কিন্তু রোগ শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সেই টাকা অকাতরে খরচ ক'রে ফেল, তাতেও চোখ খোলে না, যে শুধু টাকা এলেই শান্তি আসে না, বিনা ত্যাগে শান্তি কিছুতেই আসতে পারে না। তোমাদের সাধারণ বোধ কত কম, তোমরা ত এত শুনছ, সাধু সঙ্গে জন্মজন্মান্তরীণ কত কর্ম্ম ক্ষয় হয়, তত্রাচ মনে কর সাধু স্থানে একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত থাকলে শরীর খারাপ হবে। ব্যাধি ত কর্ম্মজনিত, তা হ'লে সাধু স্থানে এলে শরীর খারাপ হবে, এ ভাবটা মনে আসতে দাও কেন? সাধু স্থানে যে আনন্দের সহিত থাকে সে যত অনিয়মই করুক না, তার শরীর খারাপ হতেই পারে না, বরং জোর ক'রে ব'সে থেকে বেশী অনিয়ম করলে হয় ত একটু আধটু শরীর খারাপ হলেও হতে পারে। যখন গ্রহের ফেরে অসুখে পড় তখন কোথায় আরও সাধু সঙ্গ করবে যাতে স্থান মাহাত্ম্যে দশটা কর্ম্মের ভেতর পাঁচটা অমনি ভস্ম হয়ে যায় আর পাঁচটার প্রকোপও ঢের ক'মে আসে, না সেই সময় কামাই কর; অবশ্য

এমন অসুস্থ হও যে উঠতে পার না, সে কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণ অসুখের সময় আরও বরং বেশী নিয়মিত সঙ্গ করা বিশেষ দরকার। কেউ হয় ত বলবে আর এ বয়সে, বার্দ্ধক্য এলে কি ঠিক পাল্লা দেওয়া যায়? তা দেখ, বার্দ্ধক্যটা কি? এটা অলসতা মাত্র। যে জিনিষটা মন জোর ক'রে ধরবে, তাতে আর অলসতা আসে না, তখন বুড়ো কি যুবা কোন খেয়ালই থাকে না, এমন কি অসম্ভবও আনন্দ চিত্তে সম্ভব ক'রে ফেলে। এই খানে ঠাকুর কন্যাদায় গ্রস্ত ব্রাহ্মণের কাশীতে হত্যা দেওয়া ও হেঁটে হালিসহর আসার গল্প বললেন (অমৃতবাণী ৩য় ভাগ ৭১ পৃষ্ঠা)। আসল কথা মনের শক্তি দরকার, মনের শক্তি থাকলে যত বড় দুঃখ হোক না কেন, তত ধাক্কা দিতে পারে না, কাজেই তত অশান্তি দিতে পারে না কিন্তু মন যত দুর্ব্বল হবে তত অশান্তি আসবে। সংসার দুঃখ ভোগের জায়গা, এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হতেই পারে না, এই দুঃখে পড়লে অনেক সময় মন ঠিক রাখতে পারা যায় না, অমনি মনে সংশয় এসে পড়ে। ঠিক ত্যাগ না এলে, বাসনা সব নিবৃত্তি না হ'লে, সংশয় ওঠা খুবই স্বাভাবিক, তখন জোর ক'রে সদগুরু সঙ্গ না করলে সংশয় হয় ত কোথায় টেনে নিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই, তাই সদগুরু সঙ্গকে এত বড় ক'রেছে, ঠিক সঙ্গ করলে সংশয় বড় আসতেই দেয় না, আর যদিও কিছু ওঠে, ত, সদগুরু চট্ ক'রে সেটা নষ্ট ক'রে দেন, অনেকে আবার বলে, সদগুরু ধ'রে থাকলে তিনি সংশয় উঠতে দেন কেন? জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্ম জনিত সংশয় ওঠে, এক কথায় যাও বল্লেই যায় কি? আর যাওয়াবার তোমার চেষ্টা কই? যাতে সংশয় না আসে ও গুরুতে স্থির বিশ্বাস থাকে তার জন্যে তুমি কি করছ? বেশ, কিছু নাও কর ত, অন্ততঃ সদগুরুতে স্থির বিশ্বাস রাখ, যে তিনি যখন ধ'রে আছেন, তিনি বুঝবেন, গুরুত সব সময়েই ধ'রে আছেন, তুমি ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে স'রে পড়লেও, তিনি ঠিক ধ'রে আছেন, তিনি ছাড়েন না, আর না ধ'রে থাকলে কি আবার বিশ্বাস ফিরে আসতে পারে? তা, সে

শীগ্‌গিরই হোক আর দেরীতেই হোক তাকে ঘুরতেই হবে, তবে তোমার চেষ্টা বা স্থির বিশ্বাস এর সঙ্গে লাগালে তুমি অনুকুলে বাইতে লাগলে, শীগ্‌গির কাজ হ'য়ে গেল, নইলে প্রতিকুলে বাইলে ঢের বিলম্ব হয়ে যাবে, তাই সংসারীদের অন্ততঃ কিছু সময় নিয়মিত সঙ্গ করা বিশেষ দরকার, তখন মনে রাখা দরকার এইটেই তাদের সাধনা, কাজেই সাধন পথে যেমন বস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পেছনে চাইতেই নেই, তেমনি কিছু সময় সাধু সঙ্গ বজায় রাখতে কিছুতেই পেছ পা হওয়া উচিত নয়। সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয়ে এলে ঠিক জ্ঞান আসবে, ঠিক আনন্দ পাবে, তখন আলাদা দৃষ্টিই হবে, লোককে ঠিক ঠিক চিনতে পারবে এবং সকলের সঙ্গে ঠিক বিচার ক'রে ব্যবহার করতে পারবে, তা ভিন্ন যত পণ্ডিতই হও না, অন্ধের মত যা তা বিচার ক'রে সাধারণ অজ্ঞানীদের মত যা তা ব্যবহার ক'রে বসবে।

ইন্দ্র গাহিল

আমাঁর শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম।
মা হ'লেন মোর মন্ত্র গুরু, ঠাকুর হ'লেন রাধাশ্যাম।
ডুবে শ্যামা যমুনাতে আমি খেলব খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোরে করবে হেলা, মা পুরাবেন মনস্কাম।
আমার মনের দো'তারাতে শ্যাম ও শ্যামা দুটী তার
সেই দোতারায় ঝঙ্কার দেয় ওঙ্কার রব অনিবার
মহামায়ার মায়ার ডোরে আনবে বেঁধে শ্যাম কিশোরে
আমি কৈলাশে তাই মাকে ডাকি দেখব সেথায় ব্রজ ধাম॥

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩৪০
ইং ৩১শে আগষ্ট ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, প্রফুল্ল, পুত্তু, জিতেন, কেষ্ট, তারাপদ, কৃষ্ণ কিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কালীমোহন, ভগবান, কানন, হরপ্রসন্ন, মনোরঞ্জন, ধনকৃষ্ণ, মতি ডাক্তার, কাল্লু, নৃপেন, দাশরথি, পঞ্চানন, দ্বিজেন সরকার, অমল, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। আজকাল যে কীর্ত্তন গান চলছে, এতে দেশের অনেক অবনতি হচ্ছে। কারণ একেই ত আমরা ভীরু, কাপুরুষ, তার ওপর আবার মেয়েলি ভাব নিয়ে নাকি সুরে গান গেয়ে, চোখের জল ফেলে পৌরুষত্ব ত কিছুই হচ্ছে না উল্টে যে টুকু বীর ভাব ছিল সে টুকুও চ'লে যাচ্ছে।

ঠাকুর। কীর্ত্তনের করুণ সুরে সহজেই মনটা আকৃষ্ট হয় ব'লে সাধারণের কীর্ত্তনটা ভাল লাগে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় গানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর গুণ গান ক'রে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যে মনটা তাঁতে লাগিয়ে রাখা, তাই কীর্ত্তনটা অনেকেরই ভাল লাগে এবং সহজে তাঁর উদ্দীপনা হয় ব'লেই কীর্ত্তন আজ কাল বেশী চলছে, তা ভিন্ন আমি সৎ হব, ভাল হব, এই ভাব ঠিক যার মনে আছে তার ধ্রুপদই বা কি, আর কীর্ত্তনই বা কি, তার পক্ষে সবই সমান। সংসারে ছেলে, মেয়ে, আত্মীয় স্বজনের জন্যে ত কত চোখের জল ফেলছ, তাদের ভালবাস ব'লে তাদের দুঃখ কষ্ট হ'লে বা তাদের না দেখতে পেলে চোখের জল ফেলছই ত, তা না হয় তার সঙ্গে ভগবানের জন্যে একটু কাঁদলে। কাঁদে কারা? যাদের ভগবানের ওপর

কিছু ভালবাসা আছে, তাদেরই প্রাণে এই কীর্ত্তনের করুণ সুরটা বেশী লাগে এবং তখন সেই ভালবাসার জোর উদ্দীপনা ক'রে দেওয়ায় তাঁকে পাচ্ছে না ব'লে একটু চোখের জল ফেলে বা তাঁর জন্যে প্রাণ এত ব্যাকুল হওয়া সত্ত্বেও তিঁনি দেখা দিচ্ছেন না এই অভিমানে একটু কাঁদে, এটা ত কিছু খারাপ নয়, এই চোখের জল ত তোমার তৈরী নয়, এও ত তিনি দিয়েছেন, এবং এই চোখের জল ফেলবারও একটা সময় ও পদ্ধতি আছে। যদি বল সংসারে ত দিন রাত্রি কত কাঁদছে আবার ধর্ম্ম করার সময়ও কাঁদবে কেন? তা, ভগবানের জন্যে প্রাণের আবেগে যদি একটু কাঁদে সে ত খুব ভাল। আর দেখ, কীর্ত্তনের আসরে কত লোক জমে, তাদের ভাল না লাগলে কি তারা আসে বা অতক্ষণ ব'সে কাঁদে তবু নড়ে না, কিন্তু ধ্রুপদ ইত্যাদি গান সাধারণের ভাল লাগে না ব'লে সেখানে অতি সামান্য লোক থাকে। তা হলে, কীর্ত্তনে অন্ততঃ, সেই সময়ের জন্যেও, ঢের বেশী লোকের মন ভগবানের ওপর পড়ে, তা ছাড়া, সংসারে বদ্ধ হয়ে মায়ার জিনিষের জন্যে কান্নার ভেতর থেকে, কিছু সময়ও যদি সেই মায়ামুক্ত সচ্চিদানন্দ ভগবানের জন্যে কাঁদ ত সেই সময় অপর সব দিক ছেড়ে গিয়ে মন তাঁতে দেওয়ায় কিছু মায়ার হাত থেকে নিস্কৃতি পেলে, কিছু বাসনা কমল ও কিছু দুঃখের নিবৃত্তি হল ত! এও কি কম লাভ? তবে বেটাছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্বতঃই কোমল স্বভাব ও তাদের মায়াটা কিছু বেশী ব'লে তারা একটু বেশী কাঁদে এবং তারা যে টুকু কাঁদে সে টুকু সরল ভাবে বাস্তবিকই প্রাণের আবেগে কাঁদে, তাদের কপটতা বড় থাকে না, বরং বেটাছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত নাম কেনবার জন্যে বা লোক দেখাবার জন্যে কাঁদতে পারে। আবার অনেক সময় বেটাছেলেরা কেউ কেউ শোক দাবিয়ে রাখে; ভেতরে শোকের জ্বালা সমানই রয়েছে, অশান্তি সমানই ভোগ করছে, বাইরে শুধু চেপে রেখেছে। এতে বাইরের লোক না হয় টের পেলে না যে সে শোকে অধীর হয়েছে, বাইরের লোকের কাছে না হয় সে খুব (thank you)

প্রশংসা পেলে, কিন্তু ভেতরে ত সেই সমান বরং চেপে রাখার জন্যে আরও বেশী কষ্ট বোধ করছে। যদি শোক ত্যাগ করতে বা শোক জয় করতে পেরে থাকে ত বোঝা গেল যে তার মনের, শক্তি হয়েছে সে আর তত অশান্তি ভোগ করছে না, তা ভিন্ন না কাঁদলেই যে পৌরুষ হ'ল তা নয়। আর, পৌরুষের কথা যে বলছ, পৌরুষ কি ? পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষত্ব অর্থাৎ মনের শক্তি; মরার ভয় না থাকা বা প্রকৃতির ধাক্কা থেকে রক্ষা করতে পারার নাম পৌরুষ, আর সব চেয়ে বীর ভাব কি ? না, সংসার মায়া কমিয়ে ফেলা। শুধু দেহের শক্তি বা লোক ঠেঙ্গান বুদ্ধি থাকলেই বা ধ্রুপদের গুরু গম্ভীর গলার আওয়াজ থাকলেই যে খুব পৌরুষ হ'ল ও ধর্ম্ম ভাব রইল তা ত নয়। রাগের মাথায় লোক ঠেঙ্গানর শক্তি ত চাষা প্রকৃতির, এ শক্তি নিম্ন জাতির মধ্যে ঢের পাবে, আর তারা প্রায়ই সব বৈষ্ণব এবং কীর্ত্তন গান করে, তা ব'লে কি তারা দুর্ব্বল না কাপুরুষ ? ভদ্র লোকদের প্রায় সবই শাক্ত তারাই বরং বেশী ভীরু, বেশী কাপুরুষ, তা ছাড়া কীর্ত্তনটাকে মেয়েলি ভাব বলছ কেন ? আসল ভাবটা দেখ, এটা সখী ভাবে সাধনা, কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি ; কেন সকলেই প্রকৃতি ? না, সকলেই ত সর্ব্বদাই প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রে প্রকৃতির অধীন হয়ে রয়েছে তা পৌরুষ কোথায় ? তা ছাড়া এ দিক দিয়ে আবার, পুরুষ, স্ত্রী সকলকেই এক প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী ভাবা কি কম পৌরুষের কথা ? এই পুরুষ স্ত্রী আলাদা বোধ না রাখা কি কম মনের শক্তির কথা ? এই সখী ভাবে সাধনায় আর একটা মস্ত লাভ হচ্ছে যে সবাই এক প্রকৃতি ব'লে তাদের মধ্যে রিপুর কাজ হয় না, যদি বা তাদের রিপুর কাজ হতে হয়, সেই কৃষ্ণ এক মাত্র পুরুষ তার সঙ্গে হতে হবে, কিন্তু কৃষ্ণকে ত আর সামনে পাচ্ছে না, যে সে দিকেও রিপুর কাজ হবে। তা দেখ ঠিক এই ভাব নিয়ে গতি করলে কত সহজে রিপু দমন হয়ে গেল, শেষে কৃষ্ণের দর্শন যখন পাবে তখন ত সব রিপু ম'রে গেছে, আর

কিছু থাকলেও, কৃষ্ণ যে সৎ, তার সঙ্গে রিপুর কাজ ত হলই না, বরং যে টুকু ছিল তার সঙ্গে সে টুকুও ম'রে গেল, এ কত বড় উচ্চ ভাব বল দেখি,. এর নাম কি সাধারণ মেয়েলি ভাব?

পুত্তু। যাদের এমন কাজ যে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তার চিন্তা করতে হয় বা তাই নিয়ে থাকতে হয় তাদের ত ঐ সময় স্মরণ মনন হ'ল না? কাজেই তাদের আর কত টুকু স্মরণ মনন হতে পারে?

ঠাকুর। প্রথমে দেখ, যতক্ষণ কাজে থাক বললে, তার ভেতর কি অন্য রকম কাজ কর না? তার ভেতর স্নান করেছ, খেয়েছ, কোন বন্ধু এলে তার সঙ্গে দুটো কথাও কয়েছ। এ সবের যখন সময় করতে পেরেছ তখন তাঁকে ডাকবার মত কিছু সময় করতে পার, তা ছাড়া অর্থের দিকে বেশী মন থাকলে ত সমস্ত ক্ষণ তাঁর চিন্তা করতে পারবে না, তবে চেষ্টা থাকা উচিত, ফুরসুত পেলে বাজে গল্প ক'রে সময় না কাটিয়ে তাঁর চিন্তা করবে। ত্যাগ না এলে অর্থের প্রয়োজনটাকে এত ছোট করতে পারবে না, যে যত কাজই হাতে থাক, ঠিক সময় মত কিছু সময় তাঁকে দোবই, হয় ত এরূপ ঘটনা হ'ল যে ঠিক সেই সময় এমন কাজ পড়ল যে তখন নিয়মিত তাঁর কাজ করতে গেলে বিশেষ ক্ষতি হয়, এখানে যদি ক্ষতিটাকে গ্রাহ্য না কর তবেই ত সেই সময় তোমার কাজ নষ্ট ক'রেও তাঁকে দিতে পারবে। এ যদি পার, যে সংসার আসক্তি এখনও রয়েছে ব'লে কাজ করছ, অথচ যে সময় তাঁর জন্যে রেখেছ সেটা কিছুতেই নষ্ট করবে না, তাতে যা অর্থ এল ভাল ও যেটা না এল তার জন্যে দুঃখ করবে না, তা হলে ত তুমি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করছ, এ একটা বেশ বড় অবস্থা, এতে বেশ শান্তি পাবে। এটা ঠিক নির্ভরতা নয় কারণ নির্ভরতা এলে এত হাঁপাহাঁপি ক'রে চেষ্টা করাটাও ক'মে আসবে এবং ক্রমশঃ

স্থির হয়ে আসবে। নির্ভরতায় সব ছেড়ে কেবল একজনের ওপর লক্ষ্য রাখ, আর সমদৃষ্টি এলে তখন আর কারুর ওপর কোন লক্ষ্য বা আশা রাখবে না, পূর্ণ নির্ভরতার কাজ থাকে না, এ আলাদা উচ্চ অবস্থা। তবে কাজের থেকে তাঁর জন্যে মন বেশী ব্যাকুল হলে এবং কাজের ঠেলায় বেশী সময় দিতে না পারায় যদি ঠিক ঠিক অশান্তি ভোগ কর ত, তিনি অনেক সময় কাজ কমিয়ে দেন। মোট কথা গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে সংসার করলে তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না, অনেক সময় প্রথম ব্যাকুলতা এলেই সংসার ছেড়ে চ'লে যাবার ইচ্ছা ওঠে, কিন্তু তখন ছাড়বার মত অবস্থা হয় ত হয় নি, অথবা সংসারে তখনও কিছু কর্ত্তব্য রয়েছে, সেই জন্যে সদগুরুর ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁর উপদেশ মত চলাই সব চেয়ে ভাল, তিনি যেমন অবস্থা বুঝবেন সেই রকম করিয়ে নেবেন। সব ভার তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার চেষ্টা কর তখন সংসার করলেও সে সংসারে আঁট থাকে না, পদ্ম পাতার ওপর জলের মত ভেসে ভেসে বেড়ায়, তিনি যেমন যেমন করাবেন ক'রে যাবে। কাজ, কর্ম্ম জনিত, বললেই ত কাজ কমবে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দরুন অনেক সময় আবার সংসার কাজ বেড়ে যায় তাতে কি হয়েছে? কাজ আসছে ক'রে যাও, কাজে মন লিপ্ত না থাকলেই হ'ল, আসল মায়াটা কমলেই হ'ল। মায়া মনের ওপর, আসক্তির ওপর, কাজেই আসক্তি যত কমবে তত মায়া কমবে, কাজ বেশী পড়ে না হয় একটু বেশী পরিশ্রম করলে। মায়াটা ত পরিশ্রমের ওপর নয় যে পরিশ্রম বাড়লেই মায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। সদগুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে তাঁকে সব ভার দিয়ে দাও, তিনি যেমন বলেন কেবল হুকুম তামিল ক'রে যাও, তারপর তিনি যেমন বুঝবেন, দরকার হয় সংসার করাবেন আবার যখন বুঝবেন সংসার ছাড়িয়ে দেবেন, সে চিন্তার তোমার দরকার কি?

অমল সংসার ছেড়ে সাধন পথে যাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে থাকতে চাওয়ায় ঠাকুর তাহাকে প্রথমে যে বারটী নীতি পালন করতে দিয়েছেন তার মধ্যে একটী হচ্ছে 'কোন আত্মীয় এলে ঠাকুরের বিনা অনুমতিতে তার সঙ্গে কোন কথা কইবে না, তাই অমলের জ্যেঠামশাইকে যখন ঠাকুর বললেন যে অমলের বাপ মার কাছ থেকে তাদের মত আনিয়েছি, আর তুমিও দেখে যাচ্ছ। তখন অমলের জ্যেঠামশাই বললে হ্যাঁ আমি নিজেও দেখে গেলুম তাদের বলব গিয়ে আর অমলের সঙ্গে কোন কথাই হয় নি কারণ আপনার অনুমতি ছাড়া কথা কওয়া বারণ আছে। পরে ঠাকুর বলছেন, এরা সবাই সংসার করে, আমার কাছে আসে কিন্তু ও যখন সংসারটা নষ্ট ক'রে আসছে তখন ওর নিয়ম আলাদা হবে, এদের সঙ্গে সমান হতে পারে না। ও যখন সংসার না ক'রে পিতা মাতার ওপর ওর কর্ত্তব্য ছেড়ে আসছে তখন যদি ও সেই জগত পিতা জগত মাতার প্রতি কর্ত্তব্য ঠিক করতে পারে তবেই ওর এ পথে আসা উচিত। বুঝলুম যে সেই বড় কর্ত্তব্যের জন্যে এই সংসারীয় ছোট কর্ত্তব্য না হয় ছাড়লে, নইলে ও দিকও ছাড়লে অথচ এ দিকও যদি ঠিক না করতে পারে ত ও অপদার্থ কাপুরুষ, কারণ সংসার করবার শক্তি নেই ব'লে ভয়ে সংসার থেকে পালালে। সংসার কার? সেও ত তাঁর, তবে আরও বড় উদ্দেশ্য, বড় লক্ষ্য ভিন্ন সংসার ছাড় কেন? হয় তাঁর দিকে চল, নয় তাঁর নিয়ম পালন কর. নইলে মনুষ্যত্ব কোথায়? কোন একটা বড় কাজও করবে না বা কোন দায়ীত্বও নেবে না, শুধু নিজের স্বার্থ পূরণ ক'রে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, এ ত পশু প্রকৃতি। এর বয়স কম, এখনও সংসারে জড়ায় নি, এ পথে থাকার এরই খুব সুবিধে, কেন না, এ পথে যেতে গেলে ভয়ানক কঠোর করতে হবে ও ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে স্থির ভাবে গতি করতে হবে তাই আগে সাধারণ নীতি কটা দিয়ে দেখছি ওর ক্ষমতা কি রকম, তার পর আস্তে আস্তে সাধন নীতি দোবো। যদি ঠিক বৈরাগ্য এসে থাকে ত ভাল তাতে কারুরই এ পথে বাধা দেওয়া উচিত নয়, নইলে দু দিনের জন্যে মর্কট বৈরাগ্য এসে থাকে ত ওই টেঁকতে পারবে না, পালাবে অমলকে লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। তুমি কিছু গোপন করবে না, সমস্ত আমাকে এসে বলবে তবে ত বুঝব যে তোমার দোষ গুলো তাড়াবার চেষ্টা আছে; আমার কাছে এসেছ মনের উন্নতি করতে, তা যদি আমাকেই সব খুলে না বললে ত উন্নতি করবে কি ক'রে? মহাদোষীও যদি সরল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে ত বোঝা যাবে, যে দোষ গুলো ছাড়বার জন্যে তার একটা জোর ইচ্ছে হয়েছে, তার দোষকে আমি তত খারাপ বলিনি, কেন না দোষ ত থাকবেই, জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্ম রয়েছে, এক কথায় যাও বললেই কি যায়? এত সোজা নয়, কিন্তু পারুক আর নাই পারুক, তার যে দোষ গুলো ছাড়বার জোর ইচ্ছে হয়েছে, এতেই তার কাজ হবে, আবার এর চেয়ে কম দোষী যদি আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে তাকে আমি খুব খারাপ বলব কারণ এ গুলো যে দোষ সে ধারণা তার নেই কাজেই দোষ তাড়াবার দিকে তার লক্ষ্যই নেই, তাই বলেছে বিশ্বাস ও সরলতা ভগবানের বড় বড় দান। গুরুতে ঠিক বিশ্বাস রেখে সরল ভাবে তাঁর কাছে নিজের দোষ স্বীকার করতে পারলে, যখন যে ভাব মনে উঠবে তা সে যত মন্দই হোক, অকপটে তাঁর কাছে সমস্ত ঠিক বলতে পারলে তার আর চিন্তা কি? সে ত মেরে এনেছে যে টুকু আছে তিনিই ঠিক ক'রে দেবেন, এর চেয়ে সোজা আর কি হতে পারে?

কানন। ভবিষ্যত চিন্তা যায় কি ক'রে?

ঠাকুর। বাসনা থাকলেই ভবিষ্যৎ চিন্তা থাকবে, ভবিষ্যত চিন্তা অর্থাৎ আশায় মানুষ বেঁচে থাকে, তাই ভবিষ্যতের চিন্তাই খুব বেশী হয়, যত সঙ্কল্প উঠছে তত চিন্তার স্রোত আসছে। বাসনা নিবৃত্তি না হলে চিন্তা যাবে না, বাসনা উঠলে সেটা পুরলে কি কি লাভ হবে ও না পুরলেই বা কি কি লোকসান হবে এই বিচার ক'রে নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করা উচিত কারণ বাসনা নিবৃত্তিতেই সুখ, এই

বাসনা নিবৃত্তি করাই কি সোজা! কত সাধন ভজন ক'রে মনের শক্তি বাড়লে তবে বাসনা নিবৃত্তি হবে। ধ্যান জপের কারণ কি? এতে মন স্থির হয়ে আসে এবং মনের শক্তি বাড়ে, তা ছাড়া এই মন্ত্র গুলো সিদ্ধ বীজ ব'লে আরও শীগ্গির কাজ হয়। বাসনা ত্যাগের জোর ইচ্ছা এলে, সেটা বেশী প্রয়োজন বোধ হলে, তার জন্যে ব্যাকুলতা আসবে এবং তখন আপনি কাজ হ'তে থাকে, ব্যাকুলতাই যেন তাকে টেনে নিয়ে যায়, এ অবস্থায় জপ করতে করতে এমন অবস্থাও হ'তে পারে ইচ্ছে করলেও জপ ছাড়তে পারছে না আপনা আপনিই চলছে। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন "প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর পরাণ, না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নারে। জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল তনু কেমনে পাইব সখী তারে, যেখানে বসতি তাঁর নয়নে হেরিয়া গো যুবতী ধরম নাহি রয়। পাশরিতে চাই মনে পাশরা না যায় গো কি জানি কি হবে গো উপায়, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুলনাশে"। একবার কোন জিনিষে প্রাণ আকুল করলে আর সব দিক আপনি ছেড়ে যায়, এমন কি যুবতী ধরম নাহি রয় অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি রিপুর কার্য্যও তখন থাকে না, সে দিকে কোন লক্ষ্যই থাকে না, তখন ছাড়ব বললেও ছাড়তে পারে না, এত উন্মাদ ক'রে দেয় যে কুল, শীল, জাতি, সংসারের বন্ধন গুলো পর্য্যন্ত থাকে না অর্থাৎ সংসার ছেড়ে যায়। ঠিক ভক্তি এলে ভক্তিই তাকে টেনে নিয়ে যায়, কিছু আকুলতা না এলে এ পথে আসতে চাইবে না, আবার ঠিক আকুলতা এলে এ ছেড়েও আর কোথাও যেতে পারবে না, আকুলতাই যেন ধ'রে টেনে নিয়ে যায়; এই ঠিক আকুলতা না আসা পর্য্যন্ত বৈধি ভক্তি, তখন ভগবানকেও চাইছে অথচ সংসারও ছেড়ে বেরুতে পারছে না এই অবস্থায় সদগুরু সঙ্গই একমাত্র উপায়, সঙ্গে এই আকুলতা

বাড়িয়ে দেবে ও ভালবাসা আনিয়ে দেবে তখন আপনি কাজ হতে থাকবে।

বিভূতি। সৎ সঙ্গ করতে করতে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু লাভ দেখতে পেলে লেগে থে.ক গতি করার ইচ্ছা হয় যেমন অফিসে কাজ করার সময় এক মাস পরেই টাকাটা পাব এ আশা আছে।

ঠাকুর। প্রথমে দেখ, অফিসে যে রকম খাট এ দিকে সে রকম খাটছ কি না? শরীর খারাপ হোক, বাড়ীতে যত বড় দরকার থাক, যত লোকসানই হোক, পারদ পক্ষে অফিস কামাই কর কি? তা ছাড়া সমস্ত দিন এত খাটুনির পর ওভারটাইমের লোভে রাত্রেও আবার ৩।৪ ঘণ্টা বেশ খাটতে পার কিম্বা দিনের বেলায় কাজ শেষ করতে না পারায় কাজ জ'মে গেলে সাহেবের তাড়ায় রাত্রি পর্য্যন্ত খেটে, বাড়ীতে কাজ এনে রাত্রে ও সকালে খেটে যে রকম ক'রে পার কাজ ঠিক সময়ে শেষ ক'রে দাও। কেন এত কর? না, সাহেবের কাজ ঠিক না করলে টাকা পাবে না। টাকার প্রয়োজন খুব বড় ক'রেছ ব'লে, পাছে টাকা না পাও এই ভয়ে সময়ে অসময়ে কত ক'রে কাজ তুলে দাও, তেমনি এ দিকে প্রয়োজনটা বড় করলে তবে ত এই রকম খাটতে পারবে আর তখনই কিছু লাভ হ'ল কি না বলতে পার। অফিসে একটু কাজ বাকী ফেললেই সাহেবের ভয়ে ঠিক সময়ে কাজ শেষ ক'রে দাও কিন্তু এদিকে সে জন্ম জন্মান্তরীণ কাজে কত বাকী ফেলেছ তার ঠিক নেই, অথচ এই বাকীটা শেষ করবারও যে বিশেষ চেষ্টা করছ তাও নয়। অফিসে সাহেবের কাজ, সাহেব তার জন্যে সময় ঠিক ক'রে দিয়েছে কাজেই যে রকম ক'রে হোক সেই সময়ের মধ্যেই যত বাকীই ফেল সব. শেষ ক'রে দিতে হয়, কিন্তু এদিকে যে তোমার নিজের কাজ, তুমি নিজেই বাকী ফেলেছ, কাজেই এ কাজ তোলবার সময় তুমি নিজেই ঠিক করবে; যত শীগগির বাকী কাজ তুলে দেবে তত শীগগির লাভ বুঝতে পারবে। এ পথে গতি

ক'রে কিছু লাভ পেতে গেলে কাম ক্রোধাদি রিপু দমন করতে হবে, বাসনা ত্যাগ করতে হবে, তা এ সব কিছু করতে পেরেছ কি, যে লাভ বুঝতে পারবে? তা ছাড়া, তোমরা যে টুকু সৎ সঙ্গ কর বা সৎ ভাবে থাক ও সৎ নীতি পালন কর তার প্রায়ই, হয় অর্থ না হয় সংসার সুখের আশায়, এতে বড় জোর তোমরা সৎ সংসারী হয়ে কিছু সৎ ভাব নিয়ে ভদ্র ভাবে চলতে শিখলে কিন্তু আসল আত্মোন্নতির জন্যে কত টুকু করলে, বাসনা ও সংসারে আসক্তি কতটা কমাতে পেরেছ, দেহ সুখ প্রভৃতি কতটা অধীন করতে পেরেছ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কতটা দমন করতে পেরেছ যে মুনাফা দেখতে পাবে? এই সব গুলো হচ্ছে লক্ষণ, এ গুলো দেখলে তবে ত বুঝব যে তুমি সত্যি এ পথে আসবার চেষ্টা করছ, শুধু দু'টো মুখের কথায় ত বিশ্বাস করব না। তোমরা, বাড়ী বিক্রী হয়ে গেলে পাছে দুঃখ পাও এই ভয়ে বাড়ী বিক্রী হবার আগেই চিন্তায় আকুল হয়ে পড়, আর রাজা রামকৃষ্ণের একটা সম্পত্তি লাটে উঠেছে শুনেই আনন্দ ক'রে বললে জয় কালীর পূজা দাও, বাঁচা গেল, তবু একটা বোঝা ঘাড় থেকে নামল। যেটাকে বাস্তবিকই বড় প্রয়োজন ব'লে ধ'রবে ও যেটার জন্যে ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা আসবে সেটার দিকে শীগগির গতি করতে পারবে ও সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা বুঝতে পারবে।

কানন। জ্ঞানেই হোক আর ভক্তিতেই হোক চরম অবস্থায় ত সব এক হয়ে যায়। তখন ত আর দুই থাকে না কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে ত বরাবরই দুই রেখে সাধন করে।

ঠাকুর। জ্ঞানে 'আমি তুমি' নেই, আর ভক্তিতে 'আমি তুমি' আছে, তবে প্রেমে আবার 'আমি তুমি' থাকে না বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনা, সব ছেড়ে সেই এক কৃষ্ণে মন অর্পণ করা, তাঁর লীলা উপভোগ করা। সব ছাড়া মানেই বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ, তখন আর মনে কোন সঙ্কল্প ওঠে না, কাজেই সুখ বা দুঃখ ভোগ

কিছুই থাকে না, এক কৃষ্ণতেই ম'জে আছে। যে কয় ভাব সাধনা আছে সব তাতেই সেই এক কৃষ্ণ নিয়েই সাধনা, আর এই লীলা উপভোগ করবার জন্যে 'আমি তুমি' ভাবটা রাখে, তখন আমি আর কৃষ্ণ এ ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তবে রাধিকার এমন একটা ভাব হয়েছিল যে 'সর্ব্ব বাসুদেব ময়' 'যে দিকে ফিরাই আঁখি সবই কৃষ্ণময় দেখি' অর্থাৎ সব তাতেই বাসুদেব জ্ঞান হয়ে চারি ধারে কৃষ্ণ রূপ দেখছেন এমন কি তিনি নিজেকেও কৃষ্ণ ব'লে দেখছেন। অপর ভাবে বিচ্ছেদ নেই কিন্তু মধুর ভাবে বিচ্ছেদটা রেখেছে, কারণ এটাও ত লীলার ভেতর। লীলা পূর্ণ ভাবে ভোগ করতে গেলে এটা না দেখালে চলবে কেন? সব ভাব মিলিয়ে মধুর ভাব, তা ছাড়া মানুষ রূপটাই বেশী পছন্দ করে এবং যে রূপে মন আকৃষ্ট হয় শেষ পর্য্যন্ত সেইটাই ধ'রে থাকতে চায়। এই দেখ, পরমহংসদেব ত কবে দেহ ছেড়েছেন, সে দেহ ত পুড়িয়ে নষ্ট করেছে, তবু সকলেই, এমন কি যারা নিজে সেই দেহ পুড়িয়ে নষ্ট ক'রেছে, তারাও পরমহংসদেব পরমহংসদেব ক'রছে। তা হ'লে, যে দেহটা নিয়ে কাজ করলে সে দেহটাত পরমহংসদেব নিশ্চয়ই নন, এটা ত স্বীকার করবে কারণ সে দেহ ত আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কাজেই সে পরমহংসদেব ত' চ'লে গেছেন অথচ সকলেই যখন এখনও তাঁকেই ডাকছে, তখন সেই দেহটার ভেতর যে আর একটা আসল পরমহংসদেব ব'লে শক্তি ছিলেন তাঁকেই সকলে ডাকছে; অর্থাৎ সেই শক্তিই যেন এদের সকলকে আকর্ষণ ক'রে ডাকিয়ে নিচ্ছে কিন্তু তবুও তাঁকে চিন্তা করতে গেলে সেই পুরান দেহটাকেই মনে করে, তারা এটা বোঝে না বা এটা ধারণাই করতে পারে না, যে যখন এই দেহটা পরমহংসদেব নন, ভেতরের শক্তিটাই আসল পরমহংসদেব, তখন ***"সেই পরমহংসদেব শক্তিই অপর একটা রূপেতে কাজ করতে পারেন।"*** এটা যখন বুঝবে তখন ধরতে পারবে, তবে যে রূপেতে উপকার পেয়েছ, যে রূপে মনটা আকৃষ্ট হওয়ায় যার ছাপটা মনে ধ'রে গেছে, সেই রূপটাই ভাল লাগে

এবং সহজে আসে। ***"তিনি আমার যেমন ইচ্ছে অন্যভাবে কাজ করতে পারেন।"*** এই জন্যে জ্ঞানীরা দেহটা কিছু নয় ব'লে সেটা ছেড়ে দিয়ে ভেতরের শক্তিটা ধরে, কিন্তু ভক্ত বলে তিনি যেখান থেকেই কাজ করুন না কেন, তাঁকে ছাড়ব কেন? তিনি ত জানছেন আমি তাঁকেই ধ'রে আছি। যত ক্ষণ গঙ্গার ওপর দাঁড়িয়ে আছ তত ক্ষণ তফাৎ, একবার ডুবলে আর তফাত থাকে না, জলের ঢেউ জলেই মিশে যায় কিন্তু যত ক্ষণ ঢেউ এর দিকে লক্ষ্য থাকে তত ক্ষণ শুধু ঢেউ দেখ। ভাবের দ্বারা গতি করবার সময় ভাবের অধীন থাকে এবং তখন যে কোন একটা ভাব ধ'রেই গতি করতে হয় কিন্তু চরমে পৌঁছে গেলে ভাব সব অধীন হয়ে যায় তখন ইচ্ছা করলে যে কোন ভাবের সঙ্গে থাকতে পারে। যার যেমন ভাব ওঠে সে সেই ভাবে গতি করে, কেউ বন্ধু ভাবে, কেউ সন্তান ভাবে, আবার কেউ বা দাস ভাবে গতি করে। সখা ভাবে গলা জড়িয়ে ধ'রে কত আপন ভেবে কাজ করছে: দাস ভাবে বিচার রাখে না, স্বার্থ রাখে না, প্রতিবাদ করে না, যেমন করায় তেমনি করে, বুদ্ধি না খাটিয়ে কেবল হুকুম তামিল করে: অপর ভাবে আব্দার আছে কিন্তু দাস ভাবে আব্দার নেই। সংসার মানে স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, যশ, মান, দেহসুখ স্বার্থ প্রভৃতি, যে এই গুলো সব আগ্রহ ক'রে রক্ষা করে এবং একটু এদিক ওদিক হ'লেই দুঃখ ভোগ করে সে ঘোর সংসারী কিন্তু যে তাঁরই সংসার ভেবে নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করে, সে এর কোনটাই রক্ষা করবার বিশেষ চেষ্টা করে না এবং গেলেও কোন চিন্তা রাখে না। বাসনাই জ্ঞান আবরণ ক'রে অজ্ঞানতা নিয়ে আসে; বাসনা থেকেই দেহসুখ প্রভৃতি আসে আবার সেই বাসনা যখন ছাড়তে চাও তখনই বুঝতে হবে বৈরাগ্য ভাব ভেতরে আসছে, নইলে ছাড়বার চেষ্টা কর কেন কিন্তু তখনও তোমার সে শক্তি নেই যে সেই বৈরাগ্য ভাব নিয়ে চল। সদগুরু সঙ্গে মনের এই শক্তি আনিয়ে দেবে এবং হিতাহিত জ্ঞান আনিয়ে দেবে। জ্ঞান ত আছেই, বাসনা জনিত

যে আবরণ ঢাকা থাকে সেটা সরিয়ে দিয়ে শুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশ করিয়ে দেয়, তাই সংসারীদের জন্যে সদগুরু সঙ্গই একমাত্র উপায়, সদগুরুতে স্থির বিশ্বাস রেখে তাঁর উপদেশ অবিচারে পালন করাই সংসারীদের প্রকৃষ্ট সাধনা।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন ;

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গে উদ্দীপনা হয়, যেমন সঙ্গ করবে তেমনি সব সংস্কার লাগে। বিশেষতঃ সংসারীদের পক্ষে সঙ্গই একমাত্র এবং প্রধান উপায়, সঙ্গ ব্যতিরেকে এক পাও গতি করতে পারবে না। সঙ্গ তিন প্রকার, তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। বেশীর ভাগ লোকই তামসিক সঙ্গ করে। সংসাব সুখকেই তারা বড় করে এবং কেবল তারই সাধনা করে। কিছু লোক রাজসিক সঙ্গ করে, এরা সংসারটা বজায় রাখতে চায় অথচ কিছু সৎ হবার ইচ্ছাও আছে, কিছু ধর্ম্মভাব আছে। অতি কম লোক সাত্ত্বিক সঙ্গ করে, তারা সংসার প্রায় ত্যাগ করে এসেছে এবং ধর্ম্মের দিকে গতি করছে। ঠিক সংসার করতে গেলেও বীর হতে হবে। সংসারের বোঝা যে ঘাড়ে নেবে, তা সে নেবার মত শক্তি না থাকলে বোঝা নিয়ে কেবল বিব্রত হবে। সংসার করতে গেলে বেশ মনের শক্তি চাই, তবে সংসারে প্রকৃতির ধাক্কায় দাঁড়াতে পারবে এবং কিছু শান্তি পাবে। সদগুরু সঙ্গ করলে এই মনের শক্তি আসবে, তখন বোঝা ঘাড়ে নিতে পারবে। ত ভিন্ন, যতই বুদ্ধি খাটাও না কেন, যা ঘটবার ঘটবেই, আর তুমিও তার অধীন হয়ে দুঃখ পাবে। বেশীর ভাগ লোক সংসারের দুঃখে কষ্টে পীড়িত হয়ে তাঁর প্রয়োজন বোধ ক'রে তাঁর কাছে আসে। তখনও অনেকে সংসার বাসনা ও সংসার সুখের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। ক জন লোক ঠিক বাসনা নিবৃত্তির জন্য তাঁর কাছে যায়? যাচ্ছ বাসনা বৃদ্ধি করতে, আর মুখে বলছ বাসনা নিবৃত্তি করতে যাচ্ছি,

তাতে কি বাসনা নিবৃত্তি হয়? তুমি পূর্ব্ব মুখে যখন যাচ্ছ তখন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি বললেই কি দক্ষিণ দিকে এক পা এগুতে পার? কারণ তোমার পা যে পূর্ব্ব মুখেই রয়েছে সেই দিকেই যে গতি করছ। তবে যারা বাস্তবিক দক্ষিণ মুখো যেতে চায়, অথচ এমন কর্ম্ম রয়েছে যে পূর্ব্ব দিকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই সে দিকে যাওয়া বন্ধ করতে পারছে না, তাদের পূর্ব্ব দিকে গতি হলেও অনিচ্ছা সত্ত্বে গতি করছে, তাতে যে পূর্ব্ব দিকে যাবার জন্যই যাচ্ছে, তার চেয়ে ঢের কম গতি করবে, এর আর কোন রকম ফের নেই। ইচ্ছা অনুযায়ী সেই দিকে মনের সাধন শক্তি একই, অর্থাৎ সকলেই সমান ইচ্ছা নিয়ে এক দিকে যেতে চাইলে একই রকম মনের শক্তি সেই দিকে লাগাবে। কিন্তু সকলের ইচ্ছা ত সমান নয় ব'লে, সাধারণ দৃষ্টিতে ফলের তারতম্য হয় ব'লে তফাৎ মনে হয়। তাই সংসারে থেকে কিছু সময় অন্ততঃ ঠিক ঠিক তাঁর চিন্তায় দিলে তিনি অনেক সময় অনেক কর্ম্ম ক্ষয় করিয়ে দেন এবং তাঁকে ডাকবার ঠিক ইচ্ছা মনে উঠলে তিনি সময়ও ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেন। তাঁর দিকে ঠিক গতি করছ কি না, তার লক্ষণ হচ্ছে তোমার দীনতা আসবে, অহঙ্কার ক'মে আসবে। অহঙ্কার থাকতে দীনতা আসতে পারে না, আর শুনে বা শিখে দীনতা বেশী ক্ষণ রাখতে পারা যায় না। কাজেই কারুর যদি ঠিক দীনতা আসে ত বুঝতে হবে যে সে বাস্তবিকই ধর্ম্মের দিকে কিছু গতি করছে। এই লক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ, এ ছাড়া আর কোন কারণে এ লক্ষণ আসতে পারে না। আবার, আমি সাধু হব, সকলের চেয়ে বড় হব, এ অহঙ্কার বরং ভাল, কিন্তু আমিই এক মাত্র ভাল, আর সব খারাপ এ অহঙ্কার অতি নীচ আত্মার পরিচায়ক। সঙ্গের এমনি প্রভাব যে কিছু সময় অন্ততঃ ঠিক ভাবে তাঁকে দিলে জন্ম জন্মান্তরীণ অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়, অনেক বাসনা ও আসক্তি ক'মে যায়, গ্রহের প্রকোপ অনেক ক'মে যায়, মনের শক্তি বাড়ে, এবং অনেক সময় তিনি নিজে এসে তাকে বিপদ থেকে

উদ্ধার করেন। তখন গ্রহও তার কোন মন্দ করতে পারে না. বাধা বিঘ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং সংসারে দুঃখ কিছু এলেও নৌকাডুবি হবে না অর্থাৎ মূলে কোন ক্ষতি হবে না। (এইখানে ঠাকুর ২৩ ঘণ্টা রাজার চাকর এবং এক ঘণ্টা মাত্র ভগবানের চাকর সাজায়, তিনি নিজের রাজার কাছে এসে কাজ ক'রে দিয়ে তাকে বাঁচান'র গল্প বললেন, অমৃতবাণী ১ম ভাগ ২২৩ পৃং।).

ভগবানের চাকর সাজা মানে কি? না, মনকে অপর সব দিক থেকে তুলে এনে তাঁকে দেওয়া অর্থাৎ অপর বাসনা সব নিবৃত্তি ক'রে মনটি কেবল তাঁতেই রাখা। আর, যে সর্ব্বদাই তাঁতে মন ফেলে রাখতে পারে সে ত তাঁকে পেয়েই আছে। রাবণ এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও সর্ব্বদা রাম চিন্তা করত, বাইরে সে যে ভাবেই ব্যবহার করুক না কেন, ভেতরে সর্ব্বদাই রাম চিন্তায় বিভোর ছিল এবং রামকে পাবই, এই স্থির বিশ্বাসে ছিল ব'লে যে সমস্ত জিনিষ তাকে বাধা দিচ্ছিল, তার রামের দিকে গতি করবার বিঘ্ন করছিল, সব আপনি নষ্ট হয়ে গিয়ে শেষে সে রামের সঙ্গে মিশে গেল। তাই বলেছে, ***সদগুরুতে স্থির বিশ্বাস রেখে গতি করলে তার হতেই হবে।*** সদগুরু বলার উদ্দেশ্য ঠিক ত্যাগী শক্তি সম্পন্ন গুরু। আগে গুরু বলতেই, সাধন ভজন ক'রে শক্তি সম্পন্ন ত্যাগী গুরুই বোঝাত, তখন আর সদগুরু বলতে হ'ত না, কিন্তু এখন গুরুবংশীয় ব'লে, পেশা হিসাবে গুরু গিরির প্রথা হয়েছে বলেই, সদগুরু বলতে হয়। সাধারণ পেশা হিসাবে যারা গুরুগিরি করে তারা নিজেরা শক্তি সম্পন্ন নয় ব'লে শিষ্যকে জোর ক'রে করিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু তাদের মন্ত্র সিদ্ধ বীজ ব'লে তাতে কাজ হয় এবং শিষ্য সে রকম উপযুক্ত হ'লে নিজের চেষ্টায় কাজ করতে পারে। তা এ রকম শিষ্য আর কটা? কিন্তু গুরুর গুরুত্ব থাকাই দরকার। নইলে, গুরু হওয়ার কাজ যদি না করতে পারলে ত গুরু হওয়ার স্বার্থকতা কি? সৎ-গুরু নিজের শক্তিতে সকলকে জোর ক'রে করিয়ে নেন। শিষ্যের

কিছু ক্ষমতা থাক, আর নাই থাক, তিনি যার যেমন ক্ষমতা সেই ভাবে গতি করিয়ে, জোর ক'রে কাজ করিয়ে শক্তি বাড়িয়ে দেন, তখন সে আপনিই গতি করতে থাকে। তবে যার গুরুতে স্থির বিশ্বাস আছে, তাঁর কথা ধ্রুব সত্য ব'লে ধারণা আছে তার কথা আলাদা। সে সব অবস্থায় তাঁকে নিকটে দেখে, এবং সব জিনিষেই তাঁকে দেখতে পায়। সেই বিশ্বাসই তাকে নিয়ে যায়, তা গুরুর শক্তি না থাকলেও ক্ষতি নেই। তখন সিদ্ধ বীজের দরকার হয় না, একমাত্র বিশ্বাসই তাকে নিয়ে যায়। (এখানে ঠাকুর "গুরু কর্তৃক শূকর মন্ত্র দান ও শিষ্যের শূকর মূর্ত্তিতে দর্শনের" গল্প বল্লেন, অমৃতবাণী ৩য় ভাগ ২৬৯ পৃঃ)। তিন ভাবে লোকে ভগবৎ চর্চ্চা করে। অর্থের জন্য কথক পণ্ডিতরা প্রায় সর্ব্ব ক্ষণই ভগবানের চর্চ্চা নিয়ে থাকে এ অতি নিকৃষ্ট, কারণ শুধু মুখেই পয়সা রোজগারের জন্য ভগবানের নাম করছে, লোককে অনেক বড় বড় কথা বলছে এবং ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু নিজে জেনে শুনেও সমস্ত বিরুদ্ধ গুলি করছে। এরা জ্ঞান পাপী, জেনে শুনে অন্যায় করছে। আর আছে ভগবৎ চর্চ্চা করলে মঙ্গল হয়, সৎ হওয়া যায়, এই ভেবে নীতি রেখে কাজ করে। আর এক, প্রেমে গতি করে। তখন এত ভালবাসা প'ড়ে যায় এবং সেই কথা এত মিষ্টি লাগে যে এ ছাড়া কোন কথাই সে কইতে পারে না। মোট কথা সংসারীদের পক্ষে সদ্গুরুর সঙ্গই হচ্ছে একমাত্র উপায়, তা ভিন্ন গতি করা প্রায় অসম্ভব। পরমহংসদেব বলতেন এখানে এলে ত পেলা দিতে হয় না তা আসতে দোষ কি?

জ্ঞান (গোস্বামী) গাহিল

ভীষ্ম জননী ভাগিরথী মাতঃ গঙ্গে।
তারণ কারণ ভব ভয় বারণ নিস্তার তারণ ত্রিজগতে।
হরিদ্বার বতী অতি দ্রুত গতি জহ্নু মুনির ধ্যান ভঙ্গে,
সাগর সন্ততি পারে দিতে গতি মা বিহর সাগর সঙ্গে।

———

চতুর্থ ভাগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ১৮ই ভাদ্র ১৩৪০,
ইং ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর ভক্তরাজ, ললিত, কালু, কৃষ্ণ শীল, কানন, গতিকৃষ্ণ, প্রভাস, জ্ঞান, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, দ্বিজেন, হরপ্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, কালীমোহন, দ্বিজেন সরকার, মতি ডাক্তার, অমল, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। সাধু সঙ্গটা কি? যে সাধুর কাছে এল, সে যদি সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে বা যদি সাধু ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে ঐ দুই অবস্থায় কি সাধু সঙ্গ হবে?

ঠাকুর। সাধু সঙ্গ মানে সাধুতে মন প্রাণ সব দেওয়া। সাধুর কাছে এলেই দেহ সঙ্গ হতে লাগল তাতেও কিছু কাজ হবে। তারপর মন তাঁতে দিয়ে রাখলে অর্থাৎ মন থেকে অপর সব চিন্তা তাড়িয়ে কেবল সাধুর চিন্তা করতে পারলে ঠিক সাধু সঙ্গ হ'ল। যখন সাধুর কাছে আসে তখন তাঁর সঙ্গ করবে এই উদ্দেশ্যেই আসছে। তখন কোন কারণে যদি একটু ঘুমিয়ে পড়ে তাতে ক্ষতি হয় না। তার আসার যে সৎ উদ্দেশ্য সাধু সঙ্গ করব, এই ভাবটাই তার সঙ্গ করিয়ে দেবে। আর, সাধু বলতে দেহটা ত নয়। ভেতরের শক্তিটাই আসল সাধু। সাধু ঘুমুলে সে শক্তিটাত ঘুমুচ্ছে না, সে ঠিক কাজ করতে থাকে। তা ছাড়া, যেখানে সাধু থাকে সেখানে নানা দেব শক্তি থাকে। কাজেই সে সাধুতে মন দিয়ে ব'সে থাকলে সাধু ঘুমুলেও তার সঙ্গ ঠিক হতে থাকল। এই যে দেব স্থানে লোকে যায় সেখানে দেবমূর্ত্তি ত আর কথা কইছে না, তা ব'লে কি তার দেবস্থানে যাওয়ায় কোন কাজ হয় না? মনটা লাগালেই হ'ল।

সাধুকে ভালবাসলে মনটা শীঘ্র তাতে পড়ে, সেই জন্য ভালবেসে সাধুর কাছে এলে ঠিক সাধু সঙ্গ হয়।

পুত্র। রসনা জয় হয় কি ক'রে?

ঠাকুর। রসনা সুখটা সংস্কার, যে জিনিষ তোমার ভাল লাগে অপরের হয় ত সেটা ভাল লাগে না। আবার, মাছ, মাংস তোমার খুব প্রিয় কিন্তু হিন্দুস্থানীরা মাছ, মাংস ছোঁবে না, দুধ, ঘিতে যথেষ্ট লোভ আছে। আমি কখনও পেঁয়াজ খেতে পারিনি, খেলেই উঠে যায়। অথচ পেঁয়াজের গুণজ দোষে হয় ত আমার কিছু করতে পারবে না। মনের শক্তি হ'লে এই লোভ ক'মে যাবে। আসল কামনা জয় হলেই হল, তখন আপনি অপর সব জয় হয়ে যাবে। আহার তিন প্রকার আছে, কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যে সংস্কারে আছে সেই অনুযায়ী, আয়াস লব্ধ আহার সাত্ত্বিক; লোভ পরবশ হয়ে কটু, তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রসনা তৃপ্তিকর যে কোন আহার রাজসিক; জ্ঞান শূন্য অর্থাৎ অপরিমিত যা তা আহার তামসিক।

কানন। সাধন পথে যাবার সময় অনেক রকম বিভীষিকা দেখা যায় কেন? তখন একটু মদ খেলে কি ভাল হয়?

ঠাকুর। পরিমিত মদ খেলে কিছু দোষ হয় না, তাতে মনের শক্তি কিছু বাড়ে, কঠোরতা নিয়ে গতি করবার সময় কিছু সুবিধা হয়, দুর্ব্বলতা আসতে দেয় না এবং বিভীষিকা আদিতে একটু সাহস থাকে। কিন্তু এই মাপ রাখা বড় শক্ত। সেই জন্য কলিকালে এই দুর্ব্বল মন নিয়ে মাপ ঠিক রাখতে পারবে না ব'লে ও সব ছোঁয়াই বারণ করা আছে। তা ছাড়া, শরীরের মধ্যেই ত সুধা ভাণ্ড আছে। এটা ব্যবহার করার মত শক্তি করলে আর বাইরের উত্তেজনার দরকার হবে না। আর এ সব বাইরের উত্তেজনা দরকার হয় কখন জান? যখন তাঁর দিকে যাবার জন্য কঠোরতা নিয়েছ অথচ ঠিক ততটা প্রয়োজন বোধ করছ না; নইলে, তাঁকে পাবার জন্য

পূর্ণ আগ্রহ এলে দুর্ব্বলতা কিছু করতে পারে কি? দুর্ব্বলতার সাধ্য কি কাছে ঘেসে? বড় সাধনা করতে গেলে সংসার প্রভৃতি অপর কোন দিকে মন থাকে না। তবে এই বড় কাজে আসবার আগে সংসারের ভেতর থেকে কামনা বাসনা জয় ক'রে, রিপু অধীন ক'রে, মনের শক্তি বাড়িয়ে উপযুক্ত হয়ে বেরুলে ভাল হয়। তখন সে কি আর স্ত্রী পুত্রের জন্য ভাবে? কারণ সে জানে সে যাঁর কাছে যাবার জন্য ছাড়ছে এরাও যে সব তাঁরই। তিনি ত সব সময় এদের জন্য ভাবছেন, তবে এত দিন তাকে দিয়ে করিয়েছিলেন বই তো নয়। আসল কথা, ভাবটা ঠিক লাগলে তখন তার সমর্থনে প্রমান গুলোও ঠিক নজরে পড়ে। বিভীষিকার কথা বলছ, বিভীষিকা হচ্ছে, যে যে বস্তুতে তুমি ভয় খাও সেই সেই বস্তু সামনে আসা। এ গুলো আসার কারণ হচ্ছে একেবারে বড় শক্তিতে মন রাখবার আগে দেখ, ছোট শক্তিতে কি রকম দাড়াতে বা মন স্থির রাখতে পার। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয়টা নষ্ট ক'রে নির্ভীক ক'রে দেওয়া। ধর বিভীষিকা এল না, তাতে যে যে বস্তুতে তোমার মনে ভয় আসত সে সংস্কার গুলো ত র'য়ে গেল। পরে সেই গুলোই হয় ত, তোমার মন চঞ্চল ক'রে দিতে পারে তাই একেবারে ভয় নষ্ট ক'রে, যাতে প্রকৃতি আর তোমায় জড়াতে না পারে সেই ভাবে খাঁটি তৈরী করবার জন্য এ গুলো আসে। আবার যেই তোমার মনের শক্তি বাড়লো সেই গুলো অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন যে গুলোকে বিভীষিকা মূর্ত্তি বলছ সেই গুলোই সব শান্ত মূর্ত্তি মনে হবে। অনেক সময় সাধুর কাছে থাকতে গেলেও বিভীষিকা আদি দর্শন হয়। আর, যখন রাজার কাছেই যেতে হবে ব'লে গতি করছ অর্থাৎ সমস্ত কামনা বাসনা ছেড়ে যাচ্ছ তখন কি তার পেয়াদা চাকর বা আমলা, সরকারের উৎপীড়ন গ্রাহ্য কর? না, তারাই তোমার উপর বেশী অত্যাচার করতে সাহস পায়। একটু বাধা দিয়েই তোমায় বুঝতে পেরে বরং আরও রাস্তা ছেড়ে দেয় এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিজেন। গীতায় বলছে "যারা দেব দেবীর পুজা করে তারা আমারই পুজা করে বটে কিন্তু বিধি শুদ্ধ নয়" এ কেন?

ঠাকুর। দেব দেবী সবই তাঁর খণ্ড শক্তি। সুতরাং দেব দেবীকে পুজা করলেই তাঁকে পুজা করা হল। কিন্তু সাধারণতঃ কামনা বাসনা নিয়েই দেব দেবীর পুজা কর তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁকে বা তাঁর শক্তিকে চাচ্ছ না ত? চাচ্ছ, সেই বাসনা কামনা পুরণ এবং তাঁর যে শক্তিতে এই বাসনা কামনা পুরণ হয় বাস্তবিক পক্ষে সেই শক্তিরই আরাধনা করছ। রাজার কাছে গিয়ে তোমার বাড়ীর চুরির তদন্ত করার কথা বললে রাজা নিজে আসেন না পুলিশ নামে যে শক্তিকে এই কাজ করবার ভার দিয়েছেন তাকে পাঠিয়ে দেন। তেমনি টাকার জন্য তাঁকে ডাকলে তিনি লক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দেন, সন্তানাদির জন্য ডাকলে ষষ্ঠীর কাছে পাঠিয়ে দেন অর্থাৎ যে কোন কামনা বাসনা নিয়ে পরমব্রহ্মকে ডাকলেও সেই সেই খণ্ড শক্তিরই (দেব দেবীর) পুজা কর, আবার সমস্ত বাসনা কামনা ঠিক ত্যাগ ক'রে যে কোন খণ্ড শক্তিকে (দেব দেবীকে) সেই ভাবে পুজা করলে সেই পরমব্রহ্মের আরাধনা হল। কামনা বাসনা থাকলেই দেব দেবীর অধীন রইলে। এমন কি বিভূতি আদি পেলেও দেব দেবীর অধীন রইলে। তখন লোকের কাছে নাম কিনলে বটে, কিন্তু ভেতরে অশান্তি ঠিকই রইল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও গুণের ভেতর ব'লে তাঁরাও মায়ার অধীন। তাই বাসনা কামনা সব ত্যাগ ক'রে এই মায়ার রাজ্য না ছাড়লে অর্থাৎ প্রকৃতির (গুণের) বাইরে না গেলে তাঁকেও ঠিক ঠিক পাবে না, এবং ঠিক শান্তিও আসবে না।

কানন। ভগবানের সাধনা আর সংসার করা দুটো এত বিপরীত যে একটা ধরলে আর একটা ছাড়তেই হবে।

ঠাকুর। জিনিষ কিন্তু এক। সংসার করার সময় যেমন অপর সব ভুলে দেহ, মন, প্রাণ সব তাতে লাগিয়ে রাখ এবং যত দুঃখ

কষ্ট আসুক কিছুতেই ছাড় না, তেমনি ভগবানের দিকে যেতে গেলেও, সংসার আদি সব ছেড়ে, যত বাধা বিঘ্ন আসুক সব উপেক্ষা ক'রে, একলক্ষ্য হয়ে গতি করতে হয়। দুয়েতে একই রকমে গতি করতে হয়, কেবল লক্ষ্য আলাদা। তবে ভগবানের দিকে গতি করার পথ ভিন্ন ভিন্ন আছে। পরমহংসদেব বলতেন কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, কঠোর সাধন ভজন ক'রে যেতে পারবে না, তাদের করুণা দিয়ে গতি করানই সোজা। যেন তেন প্রকারে সংসারটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়। দুর্ব্বল মন যত ক্ষণ মায়া বদ্ধ থাকে করুণা দ্বারা বেশী আকর্ষণ পায়, তার প্রমান করুণা পূর্ণ কীর্ত্তনে যত লোক সমাগম হয় বীরত্ব ব্যঞ্জক গানে তার তুলনায় কিছুই লোক হয় না। করুণা টা কি? ভালবাসার বিরুদ্ধ হলেই অর্থাৎ ভালবাসার বিচ্ছেদ হ'লে করুণার উৎপত্তি হয়। মনের স্বভাব হচ্ছে যাকে ভালবাসা যায় তাকে না পেলে বিচ্ছেদ জনিত করুণা আসে। সংসারে অনবরত এই করুণার ভেতর দিয়ে চলছ ব'লেই এই পথে তাঁর কাছে যাওয়া খুব সোজা। সংসার, অনিত্য বিষয়ে করুণা না দিয়ে তাঁতে করুণা দিয়ে গতি করলে সংসার করুণা সব আপনি ছেড়ে যাবে। তাই শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাবের সাধনা দিয়েছে। সংসারে এই সব কটা ভাব নিয়েই চলছ কাজেই এর যে কোন ভাব ধ'রে গতি করবার জন্য নতুন ক'রে কিছু করতে হয় না। যে ভাব যার ভাল লাগে সেই ভাবে উন্মাদনা এলেই কাজ হয়ে গেল। মধুর ভাবে যে রাস লীলার বর্ণনা আছে তা থেকে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগে সব ত্যাগ ক'রে সেই প্রেমোন্মাদ ভাবটাই গ্রহণ করবার জিনিষ। এইটেই মূল জিনিষ সেখানে দেখাচ্ছে, তা ছাড়া যে সব বর্ণনা আছে সে গুলো গল্পচ্ছলে মনটা লাগাবার জন্য। ***যে ভাবেই যাও, আর যে ধর্ম্মেই যাও, সকলের মুলেই এক মন্ত্র ত্যাগ, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। ত্যাগ ভিন্ন তাঁর কাছে যাবার যো নেই।*** তা সে কঠোর ভাবেই ত্যাগ হোক, আর সরস ভাবেই ত্যাগ

হোক, ত্যাগ চাইই। তন্ত্রের বীর সাধন কি? সেও বাসনা প্রভৃতি সব ছেড়ে, রিপু অধীন ক'রে তাঁর জন্য বেরিয়ে পড়া। জিনিষ সবই এক, দুই হতে পারে না কারণ মন ত সব এক। মূলে তলিয়ে দেখবে সব এক, কেবল গতি করবার পদ্ধতিতে তফাৎ থাকতে পারে তবে তাই নিয়ে গোঁড়ামি ক'রে অপর ধর্ম্মের নিন্দা করাটা অত্যন্ত হানিকর। ***ধর্ম্ম পথে আসবার প্রধান জিনিষ মনে রাখবে কখনও কাহারও দোষ দেখ' না বা অপকারের চেষ্টা ক'র না।*** তোমার ভাব যদি ঠিকও হয়, বিরুদ্ধ ভাবের লোককে সংশোধন করতে পার ভাল নইলে তার সঙ্গ ক'রো না, সেও ভাল, কিন্তু তাই নিয়ে তার দোষ বের ক'রে তাকে অপদস্থ করতে যেও না। এই ***পর চর্চ্চায় আত্মার ভয়ানক অবনতি হয়। অপরের কি আছে তা তোমার দেখবার দরকার কি? তার ভাল করার ভার ত তোমার ওপর পড়ে নি।*** তুমি নিজে ভাল হতে, মনের উন্নতি করতে, এসেছ তা কেবল নিজের দোষ টুকু খুঁজে বের করবে এবং সেটা নষ্ট করবার চেষ্টা করবে। তোমার নিজের ভাবটা ঠিক রক্ষা করবে এবং ভাল ক'রে বেড় দিয়ে রাখবে, যাতে অপর ভাব এসে না ভেঙ্গে দেয় এবং জগতে অপর আর কিছুই নেই, এই ভাবে চোখ বুজে সাধু সঙ্গে সেটা বাড়াতে চেষ্টা করবে। তবে তুমি মানুষ হতে পারবে, তবে তুমি তাঁর দিকে গতি করতে পারবে। যাঁরা লোক শিক্ষার জন্য এসেছেন তাঁরাই কেবল নানান ভাব ধারণ করতে পারেন। আর তাঁরাই কেবল বিভিন্ন ভাবের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রচার ক'রে, যার যেমন দরকার তাকে সেই ভাবে গতি করান। ভাব কোনটাই ভুল নয় সব ঠিক, তবে যেটা যার ভাল লাগে সেইটে নিয়েই চলা উচিত, অপরের প্রতিবাদ করা উচিত নয়।

ললিত। গুরুগিরি ক'রে অর্থ নেওয়াটা কি দোষের?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই। গুরুর কাজ ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া, তা অপরকে মুখে ত্যাগ শিক্ষা কর বলছে, অথচ নিজে বেশ ভোগ বাসনা পোরাবার

জন্য অর্থ নিচ্ছে। গুরু নিজে জানে যে বাসনা ত্যাগ করাই আসল, অপরকে শিক্ষাও তাই দিচ্ছে অথচ নিজে ঠিক শিষ্যের দক্ষিণা প্রভৃতির উপর বেশ আশা রেখেছে। যদি দক্ষিণার উপর মনটা রইল ত শিষ্যের মঙ্গল চিন্তা করবে কখন? সেই জন্যই আজ কাল ঠিক ত্যাগী গুরু বোঝাবার জন্য সদগুরু বলতে হয়। আগে কিন্তু তা দরকার হত না কারণ গুরু বললেই ত্যাগী গুরু বোঝাত। তবে শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য যত টুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ দক্ষিণা হিসাবে নেওয়া চলে তা ছাড়া আমার টাকা ব'লে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য অর্থ লওয়া এবং ঐ ভাবে খরচ করা খুব অন্যায়। সদগুরু কোন চিন্তা রাখবেন না কাল কি হবে তার ভাবনাও মাথায় রাখবেন না। ***সদগুরুর সঞ্চয় থাকবে না। সঞ্চয় মানে হচ্ছে "নিজে চেষ্টা ক'রে জোগাড় ক'রে এনে ভবিষ্যতের জন্য এমন কি কালকের জন্য জমান।"*** তাই সদগুরুর নিজের প্রয়োজনের জন্য ব্যাঙ্কে বা কোথাও টাকা রাখা বিষম বিসদৃশ ও অত্যন্ত হানিকর। তবে যখন আপনিই বেশী আসছে, তাতে নিজের যে টুকু প্রয়োজন ঠিক সেই টুকু নিয়ে বাকী যারা যারা তাঁর কাছে আসে তাদের কাউকে না ফিরিয়ে সবটা তাদের জন্য খরচ ক'রে ফেলতে পারেন। এর পরেও যদি কিছু থাকে ত ফেলে না দিয়ে পর দিন যারা আসবে তাদের জন্য খরচ করবার জন্য রেখে দেওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু মঠে অনেক সময় সাধু ছাড়া অপর লোক থাকে, তারা ত তখনও সাধুর মত ত্যাগী নয়, তাঁর উপর সে পরিমাণ বিশ্বাস করতে পারে না। কাজেই তারা কিছু সঞ্চয় না করলে দাঁড়াতে পারে না ব'লে মঠে প্রায়ই সঞ্চয় থাকে। তবে যখন সাধুর কাছে আছে, তখন কোন চিন্তা না রেখে বা কোন সঞ্চয় না রেখে নিজেদের সে পরিমাণ তাঁতে বিশ্বাস না থাকলেও সাধুর উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে, তখন সঞ্চয় দরকার হয় না।

কালীমোহন। গৃহীদের কি কিছু সঞ্চয় দরকার?

ঠাকুর। হ্যাঁ। সাধারণ গৃহীদে॰ আয়ের চতুর্থাংশ দান, চতুর্থাংশ সঞ্চয় ও অর্দ্ধেক সংসারে খরচ করা উচিত। কিন্তু ত্যাগী সংসারীরা তিন চতুর্থাংশ দানে খরচ করবে এবং বাকী থেকে পারে কিছু সঞ্চয় করবে। এই অর্দ্ধেকে সংসার চালাতে গিয়ে যদি ঠিক সংকুলন না হয় অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ও অতি ন্যায্য খরচ যেমন ছেলের লেখা পড়া শেখান, মেয়ের বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি সব না কুলায় ত প্রথমে সঞ্চয় কমিয়ে সেই খরচ করবে যদি দেখ সমস্ত সঞ্চয় খরচ করেও এই ন্যায্য খরচ চলছে না তখন দান কিছু কমাতে পার নইলে নয়। যে ঠিক ভক্ত সে ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে তার আর সঞ্চয় নেই। ঠিক ভক্তের সঞ্চয়ও হবে না এবং তার কোন অভাবও হবে না। অনেক সময় দানের পাত্র সম্বন্ধে কথা ওঠে। তা শাস্ত্রে আছে দেশ কাল পাত্রে দান করলে বেশী পুণ্য সঞ্চয় হয়। অর্থাৎ দেবস্থানে, গঙ্গাতীর প্রভৃতি সৎস্থানে, গ্রহণ বা পার্ব্বণাদি সৎকালে যথার্থ ক্ষুধা নিবৃত্তিব অন্নের অভাবগ্রস্ত পাত্রকে দান করলে বেশী ফল হয়। কিন্তু সকল সময় এই রকম সৎ পাত্র বোঝা বড় শক্ত। তবে তুমি ত সদভাব নিয়ে দিচ্ছ এবং যাকে দিচ্ছ সে ত ঠিক না হলেও অন্ততঃ দৈন্যভাব দেখিয়ে ত তোমার কাছে এসেছে তখন তুমি ত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভাল ভেবেই দিলে, তোমার আর চিন্তা করার দরকার নেই। সে তোমায় ঠকালে তার ফল ভোগ সে করবে। দাতার ভাব হওয়া উচিত, তার স্বভাব হচ্ছে যখন দান করা, এবং এই পরিমাণ দানে খরচ করা, তখন তার কাছে যে প্রার্থী হয়ে এসেছে তাকে দোব এই ভাবে দিলে দাতার কোন লোকসান নেই বটে কিন্তু কাহাকেও বেশী টাকা দান করবার সময় এক বার খবর নিয়ে দেওয়া ভাল কারণ এই রকম দানে দাতার পরিমাণের টাকা ফুরিয়ে গেলে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত কেউ পরে এলে ইচ্ছা থাকলেও অর্থের অভাবে দাতা আর তাকে দিতে পারে না। সাত্ত্বিক দান অর্থাৎ নিষ্কাম দান হচ্ছে আমার আছে ওর নেই এখানে

আমার কর্ত্তব্য ওকে দেওয়া। এ দান, দাতা ও গৃহীতা ছাড়া বড় কেউ জানতে পারে না, কিন্তু সাধারণ কিছু ফল আশা রেখে দান করে কারণ তারা ত বাসনা ত্যাগ ক'রে ত্যাগী হয় নি যে নিষ্কাম দান করতে পারবে।

বিভূতি। যে ভক্ত, যার গুরুতে বিশ্বাস আছে সে কি বাইবে যা তা করতে পারে? তার কি তখনও কর্ম্ম বেশী থাকে?

ঠাকুর। তিন প্রকারে কর্ম্মক্ষয় হয়। কতক নিজের ভোগ দ্বারা ও কতক সৎ কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় হয় এবং কতক সদগুরু টেনে নেন। কিছু কর্ম্ম ভোগ করতেই হয়। মন দেহেব সঙ্গে খুব জড়িত থাকলে দেহ ও মন দুই মিলিয়ে ভোগ হয়। কিন্তু যাব মন দেহ থেকে কিছু তফাৎ হয়েছে অর্থাৎ মনেব কিছু শক্তি এসেছে তার পক্ষে যে কর্ম্ম গুলো মনে ভোগ হয় কেবল সেই গুলো ছাড়া মনকে চঞ্চল করতে পাবে না কাবণ যে কর্ম্ম দেহে ভোগ হয় সেই দেহের ভোগ মনকে চঞ্চল করতে পাবে না। এমনও দেখা যায় যে মন এত উঠে গেছে যে সর্ব্বদাই গুরু চিন্তা ছাড়া অপব কোন চিন্তাই তার মনে নেই, অথচ দেহে ভয়ানক কঠিন ব্যাধি ভোগ হচ্ছে। এ ভোগের বেশী যন্ত্রনার সময় ক্ষণিক মন চঞ্চল কবলেও এর মন সর্ব্বদাই স্থির থাকে, যেমন ছাদের নল দিয়ে বৃষ্টিব জল পড়ছে ব'লে সেই নলেব কাছে জল থাকলেও ছাদের অন্য জায়গা শুকনো থাকে এবং এর মুখে কখনও এত কঠিন পীড়ার যন্ত্রণা ভোগের ছায়া পড়ে না, কারণ সাধারণের মত এ পীড়ার যন্ত্রণা ত সে মনে ভোগ করে না, তার দেহই কেবল ভোগ করে। আর দেহ থাকা মানেই কিছু কর্ম্ম ভোগ রয়েছে, সব কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে আর দেহ থাকে না। যার গুরুতে বিশ্বাস আছে সে কি আর বাইরে যা তা করতে পারে? তবে যে টুকু ক'রে ফেলে সেটা সংস্কার বশতঃ। তার স্বতঃই ইচ্ছা আছে কাম ক্রোধাদি রিপু দমন করবে, বাসনা ত্যাগ করবে, তত্রাচ জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্মের এমনি প্রভাব হয় ত রয়েছে যে সবটা

জয় করতে পারছে না। কিন্তু এই যে কমাবার চেষ্টা করছে এতেই ত অনেক ক'মে যাচ্ছে, তা ছাড়াও আবার চেষ্টা ক'রে কমাচ্ছে। অর্থাৎ হয় ত দশ জায়গায় ওদের হাতে না প'ড়ে পাঁচ জায়গায় সামলে গেল, আর পাঁচ জায়গায় বা প'ড়ে গেল এবং যে গুলোয় পড়ল সেগুলোতে হয় ত পুর্ব্বের মত প্রায় সমান জোরেই পড়ল। তা বলে, যে তার ভক্তি ভালবাসা নেই বা বিশ্বাস নেই এ বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, আমার জন্য সব ছেড়ে আসতে পারে, এত জোর ভালবাসা নেই বটে। এ ত তার পুরো দোষ নয়। এ জিনিষ গুলো কি? এর উৎপত্তি কোথায়? কি কি কারণেই বা এর উৎপত্তি আর কোথায়, কি কি কারণেই বা নিবৃত্তি হয়, এ সব ত আমার জানা আছে, কাজেই তাদের কি ঘৃণার চক্ষে দেখতে পারি, বরং বেশী ভালবাসতে হয়, যাতে শীঘ্র শীঘ্র তার সে গুলো চ'লে যায়। তাদের যে বাহ্যিক তাড়া দিই, সেটা তাদেরই মঙ্গলের জন্য, ওটা ভেতর থেকে নয়। এই সংস্কারের জন্যই ছুটে এসেও দাঁড়াতে পারছে না, আবার চ'লে যাচ্ছে, আর দুঃখ ভোগ করছে। এই করতে করতে দেরী হ'লেও এক দিন না এক দিন তাকে ফিরতেই হবে। তোমরা সংসারী, তোমরা এদের সঙ্গে বেশী মিশবে না, তাতে তোমাদের ভাবটা নষ্ট হয়ে ক্ষতি হতে পারে। আমাকে কিন্তু, তাদের নিজেদের ক্ষতি হচ্ছে ব'লে ভয় দেখিয়ে, ভালবেসে, বুঝিয়ে, যে রকমে হোক গতি করাতে হবে।

ভূপেন ৩।৪ বছর আগে ঠাকুরের কাছে সব ছেড়ে আসবে ব'লে এসেছিল, কিন্তু এর ভিতরে বিয়ে ক'রে একটী ছেলে হয়ে মারা গেছে ব'লে এসে বলছে ভগবান দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করলেন কেন?

ঠাকুর। তুমি এ কথাটা ত আগে জিজ্ঞাসা করনি? তখন কি তুমি কারুর ছেলে মরতে দেখনি, না সংসারে লোকে কত দুঃখ পাচ্ছে সেটা দেখনি, না বোঝ না। তত্রাচ আবার বিয়ে ক'রে যন্ত্রণা ভোগ করতে গেলে কেন? বাসনাই এই রকম ভুল করিয়ে দেয়। আর

অপরের ছেলে কত মরছে, কিন্তু এমনি মায়া, যেই নিজের ছেলে ব'লে ধরলে অমনি তার মৃত্যুতে অধীর হয়ে পড়েছ। তুমি বিয়ে করেছ ব'লে দোষ দিচ্ছিনি, তবে তখন "মা" "মা" ব'লে সব ছেড়ে আসছিলে যখন, তখন সেই বড় জিনিষটা ধ'রে থাকতে পারলে এ যন্ত্রণা গুলো পেতে না ত? সংসারে রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধির হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায়নি, তবে মনের শক্তি থাকলে এ সবের ধাক্কায় দাঁড়াতে পার। সেই জন্য সংসার করতে গেলে যেমন টাকারই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন মনে কর, তেমনি ভগবানের চিন্তা ক'রে মনের শক্তি আনাটা তার চেয়ে বেশী না হলেও অন্ততঃ সেই রকম প্রয়োজন ব'লে ধরবে তবে কিছু শান্তি পাবে, নইলে যতই টাকা আন না কেন, শান্তি পাবে না, এই মনের শক্তি আনবার জন্যই সঙ্গ। সদগুরু সঙ্গ ছাড়া সংসারীদের মনের শক্তি আনবার এমন সোজা উপায় নেই কারণ সাধন ভজন ক'রে গতি করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ভক্তরাজ। এই যে এত সঙ্গ করার কথা বলেন, তা আমার মত লোকের পক্ষে কি ক'রে ঠিক সঙ্গ হবে?

ঠাকুর। সঙ্গটা বেশী দরকার কাদের? যারা সর্ব্বদাই অর্থ সম্পদ, যশ, মান, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন সবায়ের সঙ্গ করছে, তাদেরই অন্ততঃ কিছু সময় সঙ্গ দরকার। কারণ সংসার সঙ্গে মন তো আরও জড়িয়ে পড়ে এবং নীচগামী হয় তাই মনের শক্তি করার জন্য সঙ্গ বিশেষ দরকার, যাতে প্রকৃতির ধাক্কায় দাঁড়াতে পারে। যার সংসার সঙ্গ নেই, তার মন ত সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ করছে। যে গুলো বাধা দেয় এবং তার থেকে তফাৎ ক'রে রাখে সে গুলো যার নেই তার আর স্থূলে সঙ্গ নাই বা হ'ল, মন ত সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় রয়েছে। সংসারে থাকতে গেলে কিছু কর্ত্তব্য থাকে, সেই টুকু ছাড়া আর তাতে ডুবতে নেই। সংসারে ছেলে মেয়ে ম'রে গিয়ে, সংসার আপনি ক'মে আসা মানেই যেন ভগবান বলছেন, এই দুঃখ পেলে ত, যেন ওতে আবার ইচ্ছা ক'রে ডুবতে যেও না। কিন্তু

শুনছে কে? যার মনের কিছু শক্তি এসেছে সেই বরং কিছু ছাড়বার কথা ভাবতে পারে। এখন সংসারে সকলেই বাধা দেবে, তাদের স্বভাব এবং সংসারের ধর্ম্মই হচ্ছে এই, যে কোন কিছু বিপরীত দেখলেই বাধা দেবে। তাই সংসারে যত ক্ষণ রয়েছ তত ক্ষণ স্ত্রী পুত্রাদি পোষ্য দের খাওয়া পরার ও কিছু দেখা শোনার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্য। কিছু দেখাও দরকার কারণ শুধু খাওয়া পরার জন্য অর্থ ব্যবস্থা ক'রে দিলে হয় ত, কিন্তু সংসারে থেকে তাদের অসুখ বিসুখে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া এবং ঠিক ব্যবস্থা মত সব চলছে কিনা এ গুলো কিছু দেখতে হবে-বই কি? এ ছাড়া তাদের মূলে কোন ক্ষতি না হলে শুধু তাদের মায়া ও অজ্ঞানতার আকর্ষণে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে, বাকী সময় তাঁর দিকে দিতে পার ত তাদের এ বাধা শুনবার দরকার হয় না। তাই, পরমহংসদেব বলতেন "পিতা মাতাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করবি, তাদের কথা শুনবি, তবে ধর্ম্মের দিকে বাধা দিলে শুনবি নি, তখন একটু রোক নিবি, শালার বাপ।" এ শালা কথাটী তিনি কোন মন্দ ভাবে ব্যবহার করতেন না, এটা তাঁর কথার মাত্রা ছিল। রামপ্রসাদও ব'লে গেছেন "অবিদ্যা পিতামাতাকে তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি" অর্থাৎ যে পিতা মাতা অবিদ্যা কিনা অজ্ঞান, ধর্ম্ম পথে তাদের কথা তুচ্ছ করবি। আর এক হতে পারে, অবিদ্যা পিতা মাতা কিনা, অহঙ্কার পিতা ও অবিদ্যা মাতা এই অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন পিতা মাতা স্বরূপ অহঙ্কার ও অবিদ্যা দুটীকে তুচ্ছ ক'রে রাখবি, কিংবা অহঙ্কার ও অবিদ্যা এ দুটী অজ্ঞানতা জনিত বৃত্তি তুচ্ছ ব'লে ত্যাগ করবি। এরা এত মজ্জাগত হয়ে গেছে ও পিতা মাতার মত এদের এত ভালবেসে যত্ন ক'রে রেখেছ যে যেমন পিতা মাতাকে ত্যাগ করা যায় না, তেমনি এদেরও ছাড়তে পারছ না। এ সবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সদ গুরুর সঙ্গ ছাড়া আর উপায় নেই। ***যে যত মন দিয়ে সঙ্গ করবে তার তত কাজ হবে।*** সদগুরু পাওয়া মানেই নর্দ্দমাকে

গঙ্গার সঙ্গে যোগ ক'রে দিলে। যেমন নর্দ্দমার জল আপনা আপনি কিছু আসবেই, তার উপর ভাল ঢাল ক'রে দিলে এবং বেশ সাফ ক'রে রাখলে ত হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে গিয়ে নর্দ্দমা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তেমনি তুমি ইচ্ছে না করলেও কিছু কর্ম্ম সদগুরুতে যাবেই, আবার বেশ মন দিয়ে, বিশ্বাস রেখে, ভালবেসে সঙ্গ করলে তোমার কর্ম্ম আপনা আপনি সেই বিশ্বাস ভালবাসার জোরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্য পা স্পর্শ ক'রে প্রণাম করা নিষেধ, কারণ স্পর্শ করলে বেশী কর্ম্ম চ'লে যায়। ভক্তরা ত সঙ্গ করছে যখন, তখন আর তাদের স্পর্শ করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, তবে তাদের দেখা দেখি বাইরের সকলেই স্পর্শ করলে অযথা কতক গুলো বেশী কর্ম্ম সাধুর ভেতর গিয়ে বেশী অশান্তি উৎপত্তি করে। ভক্তরা স্পর্শ করলেও যেমন ক্ষতি হয় না, তেমনি তারা স্পর্শ না করলেও তাদের দিক দিয়ে তাদের কোন লোকসান নেই, কারণ দর্শন ও চিন্তা দ্বারা তাদের কাজ ঠিকই হয়ে যায়, স্পর্শ করলে যে বেশী কিছু লাভ হবে তা নয়, তবে তারা স্পর্শ না করলে সাধুর একটু লাভ আছে, যে অপরের কতক গুলো কর্ম্ম এসে লাগতে পারে না। শাস্ত্রে পায়ের ধুলো নেওয়া ও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করার মানে আছে, শুধু সংস্কার নয়। মাথা দিয়ে তড়িৎ শরীরে প্রবেশ করে এবং পা দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাই মাথা স্পর্শ করা মানে শরীরে তাড়িৎ শক্তি দেওয়া হল, পায়ে হাত দেওয়া মানে শরীরের তাড়িৎ শক্তি নেওয়া হল, তাই পায়ে হাত দিয়ে মাথায় দেয়। পিতা মাতা গুরুজনকে ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করার অর্থ এই, আর তারাও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। যোগ ক্রীয়ায় যে সব আসন করার পদ্ধতি আছে সবই শরীরের তাড়িৎ রক্ষা করবার জন্য। শরীরের তাড়িৎ স্বতঃই পৃথিবী অর্থাৎ মাটী আকর্ষণ করছে, তাই কুশাসন, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি তাড়িতের গতি রোধ করে, এমন জিনিষ দিয়ে আসন করতে বলেছে। মানে হচ্ছে, তাতে ব'সে যোগ ক্রিয়া

করলে শরীরের তাড়িৎ আর মাটীতে ঠেকে নেই ব'লে, চ'লে যেতে পারে না। কাজেই যেটুকু তাড়িত অর্জ্জন করলে শরীরেই রয়ে গেল। ***আসল কথা যাই কর, মনটী লাগান চাই।*** দর্শনই বল আর স্পর্শই বল সবই মন দিয়ে হয়। তবে চোখে দেখা বা দেহের স্পর্শ, আসল দেখা বা ছোঁয়ার সাহায্য করে মাত্র। ***মনে ঠিক সৎ হবার বাসনা এলে তিনি অনেক সময় সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। আবার সৎ হবার কোন ইচ্ছা না থাকলেও তিনি কৃপা ক'রে সদ্গুরু পাঠিয়ে দেন,*** যেমন রত্নাকরের হয়েছিল। তবে যেমন রত্নাকরের দিক থেকে দেখলে তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু নয়, তেমনি এও আছে যে কর্ম্মে ও প্রালব্ধে এইরূপ যোগাযোগ ছিল, সময় না হলে ত কিছু হয় না।

কালু। সাধুকে স্পর্শ ক'রে নিজের কর্ম্ম তাঁকে দেওয়া অত্যন্ত নীচস্তরের স্বার্থ মনে হয়।

ঠাকুর। সদ্গুরুর ত লাভের দিকে বা (thankyou) ধন্যবাদের দিকে লক্ষ্য নেই, তুমি ইচ্ছে কর আর নাই কর, কর্ম্ম যাচ্ছেই। স্পর্শ না করলেও শিষ্যের কর্ম্ম যাবেই। তবে তোমার যদি এ ভাব হয় যে আমার কর্ম্মের জন্য তাঁকে ভোগাতে চাই না, ত এমন ভাবে তাঁর উপদেশ মত চলতে চেষ্টা কর যে আর বেশী কর্ম্ম সঞ্চয় না হয়। এই ভাবে চলতে পারলে তোমার কর্ম্ম কমল ব'লে নয়, কারণ কর্ম্ম আর তাঁর এমন কি ক্ষতি করবে, তবে তুমি যে সৎ হলে তাতেই তাঁর খুব বেশী আনন্দ হয়। যাঁরা আচার্য্য হয়ে আসেন তাঁদের সেই রাজার (অনন্ত শক্তির) সঙ্গে যোগ আছে, কর্ম্ম তাঁদের কিছু করতে পারে না। কর্ম্ম ঘাড়ে নিয়ে গতি করানই তাঁদের কাজ। সাধু নিজে গতি করতে পারেন, কিন্তু কারুর কর্ম্ম নিয়ে গতি করাতে পারেন না। কিন্তু সদ্গুরু বা আচার্য্যের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকৃতিকে নিয়ে কর্ম্ম ক্ষয় করিয়ে গতি করান। যেমন বড় কাঠ সমুদ্রের ঢেউ সামলে নিজেও ভেসে যায় ও অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে

যায় কিন্তু ছোট কাঠ নিজে চট ক'রে চড়ায় লেগে যায় বা কিছুতে জড়িয়ে ডুবে যায়। তাই বড়কে বিশ্বাস ক'রে ধ'রে থাকলে বড়ই আপনি টেনে নিয়ে যাবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান। সংসারীর সঙ্গ করলে বাসনা, কামনা, মায়া, দেহ সুখ প্রভৃতি বড় করবে। আর মায়ার এমনি প্রভাব যে যত ক্ষণ মায়ায় বদ্ধ রয়েছ তত ক্ষণ সংসার প্রভৃতি কর্ত্তব্য ব'লে মনে হবে, যদিও মানুষ কর্ত্তব্য কি ঠিক বোঝেও না এবং সংসারে কিছুই করতে পারে না। সঙ্গে ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হবে ও তাতে দুঃখের নিবৃত্তি হবে। যত ক্ষণ না দুঃখের নিবৃত্তি হবে তত ক্ষণ তাকে ঠিক জ্ঞান বলা যায় না। ওটা জীবত্ব জ্ঞান, ও ত সাধারণ মানুষ মাত্রেরই আছে। ***মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বরূপ জানা, ঠিক ঠিক জ্ঞান আসা।*** যতক্ষণ না ঠিক জ্ঞান আসে তত ক্ষণ কর্ত্তব্য ব'লে নানান বাসনার চাকর হও, আবার জ্ঞান এলে সেই বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা কর। সাধু সঙ্গ, সদগুরুর সঙ্গ এরই উদ্দীপনা ক'রে দেয়। সাধু সঙ্গে জ্ঞান লাভ হ'লে এ জগতটা স্বপ্নের মত মায়াতে একটাই বহু দেখায়। তখন এসব অনিত্য, ঠিক এই বোধ আসে এবং ঠিক কর্ত্তব্য কি জানতে ইচ্ছা হয়। সদগুরু সঙ্গে ঠিক কর্ত্তব্য কি জানিয়ে দেয়। এইখানে ঠাকুর "রাজা ও বাজীকরের গল্প" বললেন। এক রাজা সিংহাসনে ব'সে আছে, এমন সময় এক জন এসে বললে, মহারাজ! আমি বাজী দেখাব। এই ব'লে সে একটী ময়ূর পুচ্ছ ঘোরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার তন্দ্রাবেশ হ'ল। প্রায় আধ ঘণ্টা এই রকম থাকবার পর রাজা, 'উঃ উঃ', শব্দ ক'রে ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল এবং তার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সভার সকলেই মহারাজ কি হয়েছে বলে ছুটে আসতে রাজা চোখ চেয়ে দেখে যে সে পূর্ব্বের মতই সিংহাসনে ব'সে রয়েছে। তখন তার সে ঘোর কেটে যাওয়ায় জিজ্ঞাসা করলে সে বাজীকর

কোথায় গেল? সবাই বল্লে সে ত অনেক ক্ষণ চ'লে গেছে। রাজা তখন বলছে দেখ, স্বপ্ন দেখলুম যে এক প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়া আমায় পিঠে ক'রে নিয়ে জোর ছুটছে। এত জোরে ছুটছে যে আমার হাঁপ ধরতে লাগল কিন্তু কিছুতেই তাকে থামাতে পারলুম না। সে দিনের পর দিন সেই ভাবেই ছুটে চলেছে আর আমার অনাহারে, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হ'ল। উপায় নেই, সেই ভাবে যেতে যেতে দেখি এক মাঠের মধ্যে একটা বড় বটগাছের তলা দিয়ে ঘোড়াটা দৌড়ুচ্ছে। সেই বটগাছের একটা ডাল খুব নীচু হয়ে রয়েছে তা থেকে অনেক ঝুরি নেমেছে। সেই খানে আসতেই আমি সেই গাছের ঝুরি ধ'রে ঝুলে পড়তেই ঘোড়াটা নীচে দিয়ে চ'লে গেল। আস্তে আস্তে গাছ তলায় নেমে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করার পর ভাবলুম এখন আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ত প্রায় মরবার সামিল হয়েছি, এক পা যে হাঁটি তার ক্ষমতা নেই, অথচ এখানে থাকলে কেই বা এই মাঠের মধ্যে আমাকে খাবার দিয়ে বাঁচাবে। এই ভেবে যদিও শরীরে কোন শক্তি নেই, পা কিছুতেই চলছে না, তত্রাচ কোন রকমে হাঁটতে, হাঁটতে, নিকটস্থ এক গ্রামের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলুম। কিছু দূর গিয়ে দেখি একটী ১৫।১৬ বছরের সুন্দরী যুবতী মেয়ে হাতে খাদ্য ও জল নিয়ে আসছে। তাকে দেখে বল্লুম ক'দিন অনাহারে আমার প্রাণ যায় যায় হয়েছে যদি তোমার খাবার থেকে আমায় একটু দাও ও কিছু জল দাও ত আমি এ যাত্রা বেঁচে যাই। আমার কথা শুনে মেয়েটী বল্লে, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হও তবে কিছু খাবার দিতে পারি। তখন প্রাণ যায়, কি করি অগত্যা দায়ে প'ড়ে বিয়ে করতে স্বীকার করলুম কিন্তু মেয়েটী বল্লে তা এখন দিতে পারব না। আমার বাবা মাঠে কাজ করছে সেখানে চল বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে রাজী ক'রে দিতে পারি। তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মাঠে গেলুম সেখানে সে তার বাপের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমায় অর্দ্ধেক খাবার ও জল

দিলে। আমি খেয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে তাদের বাড়ী গেলুম। পরে জানতে পারলুম তারা জাতিতে শবর অর্থাৎ চণ্ডাল কিন্তু সর্ত্ত অনুযায়ী বিয়ে করতে হ'ল। বিয়ের পর শবর পল্লীতে বাস ক'রে মাঠে কাজ করতে লাগলুম। ক্রমান্বয়ে ৪।৫ টী সন্তান হ'ল, এমন সময় শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যু হওয়ায় সমস্ত ভার ঘাড়ে পড়ল। কিছু দিন যায়, শবর পল্লীতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেল, আমাদেরও বাড়ী, ঘর, জিনিষপত্র সব পুড়ে গেল, আমরা স্বামী স্ত্রী ও সন্তান কটী কোন রকমে প্রাণে বেঁচে ছিলুম। সেই গ্রামে সব পুড়ে গেছে, তাই ভাবলুম এখান থেকে চ'লে গিয়ে অপর গ্রামে বাস করিগে। এই ব'লে ছোট ছেলেটী কাঁধে নিয়ে দু জন অপর ছেলে গুলির হাত ধ'রে চলতে লাগলুম। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সবাই খুব কাতর হয়ে পড়েছি। ছেলেদের ক্ষিদের কান্নায় প্রাণে খুব কষ্ট হতে লাগল কিন্তু সঙ্গে এমন কিছু নেই যে তাদের খেতে দিই, বাধ্য হয়ে ঐ ভাবে যেতে হচ্ছে। খানিক দূর যেতে ছোট ছেলেটা বল্লে বাবা আমার এত ক্ষিদে পেয়েছে যে আমি আর বাঁচব না। তখন কি করি, পুত্র মায়ায় আর কোন উপায় না দেখে বল্লুম আমার উরুতের মাংসটা খুব নরম আছে এইটে খেয়ে প্রাণ বাঁচা। সে যখন তার ক্ষুরধার দাঁত দিয়ে আমার উরুতে কামড়ালে আমি যন্ত্রনায় 'উঃ উঃ' শব্দ ক'রে উঠলুম। তা এখন দেখছি, এ সবই মিথ্যা, আমি যেমন রাজ সিংহাসনে ব'সে ছিলুম সেই ভাবেই ত ব'সে রয়েছি, মাঝখানে খানিক ক্ষণের জন্য যেন ধাঁধা লাগিয়ে কতক গুলো দুঃখ ভোগ করিয়ে নিলে। মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে এই রকম চণ্ডালের মত এ সংসারে বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছ, কিন্তু সদগুরু সঙ্গে এই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে, নিজের স্বরূপ জানতে পারবে ও দেখবে তুমিও ত রাজা সিংহাসনে ব'সে আছ। তা ভিন্ন, কেবল আশার বায়না ক'রে দুঃখ টেনে আনছ। তাই সংসারীদের এত বার বার ক'রে সঙ্গ করতে বলেছে। ***যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে, গুরু শক্তিই তাকে***

রক্ষা করে। এ রকম পুরো বিশ্বাস না রাখতে পারলে, খানিকটা বিশ্বাস রাখলেও তাতেই কাজ হবে। যেখানে সাধু থাকে সেখানে সব দেব শক্তি তাঁকে ঘিরে রক্ষা করে। তাই সাধুর সহজে ক্রোধ বা কোন রূপ ক্ষতি হয় না। গুরুতে ঠিক স্থির বিশ্বাস রাখলে এই সব দেব শক্তি দেখা যায় এবং এমন কি ইষ্টও দর্শন হয়। ভিন্ন স্তরে নানান রূপ দেখা যায়, নানান বাণী বা আদেশ শোনা যায়। (এই খানে ঠাকুর "সনাতনের শিষ্য ও রাধার অন্নদান" এবং "মহম্মদের শিষ্যের ডিম্বাকৃতি আল্লার" গল্প বল্লেন, "সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ" (১৫ পৃঃ ও ২৩ পৃঃ)। ***তোমরা সংসারী, তোমাদের পক্ষে সদগুরুতে বিশ্বাস ও সদগুরু সঙ্গই একমাত্র সাধনা। অবিচারে গুরু আজ্ঞা পালনের নামই গুরুসেবা।*** ত্যাগী গুরু অর্থাৎ সদগুরু দৈহিক সেবা চান না ত, তিনি দেখেন কতটা তাঁর আদেশ পালন করতে পারে। ***যার স্থির বিশ্বাস আছে ও যে, গুরু যেটা ব'লে দেন প্রাণপণে সেই নীতি পালন করতে পারে তার ত আপনিই সব হয়ে যাবে। এমন কি ব্রহ্ম জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়। গ্রহ আদি কেহই তার কিছু করতে পারে না, গুরু শক্তি তাকে সর্ব্বদা আগলে নিয়ে যায়। হয়, নিজে খেটে কর, নয় আমিত্ব নষ্ট ক'রে ঠিক কাঠের পুতুলের মত, জড়ের মত হয়ে গুরুতে স্থির বিশ্বাস রাখ তবে হবে।*** মাঝামাঝি হ'লে হবে না? সদগুরুর কাছে ঠিক ভাবে এলেই হবে কিন্তু সেই রকম ঠিক আসা চাই অর্থাৎ মন প্রাণ দিয়ে আসা চাই। গুরুতে বিশ্বাস এলেই আপনি ত্যাগ আসবে, সংসার ছেড়ে আসবে, তেমনি যদি কারুর ত্যাগ আসে ও সংসার বাসনা ক'মে আসে ত বুঝতে হবে গুরুতে ঠিক বিশ্বাস ও ভালবাসা এসেছে। সংসারে উন্নতির জন্য দেব শক্তি আর আত্মার উন্নতির জন্য ব্রহ্ম শক্তি কাজ করে। সুতরাং সদগুরু স্থানে দেব শক্তি সব যখন থাকে, তখন সংসারী সদগুরু

সঙ্গ করলে সংসার নষ্ট হতে পারে না বরং দেবশক্তির সাহায্যে কিছু ভাল হয়। ***সঙ্গে যত মন পড়বে তত সঙ্গের জন্যে ছুটো ছুটি করবে। এই লক্ষণ। আর তত ভেতরে সংসার ম'রে আসবে।***

জ্ঞান (গোস্বামী) গাহিল

মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী,
কৃষ্ণ মুরারী আনন্দ ব্রজে তব সাথে বিহারি।
যেন নিশি দিন মূরলী ধ্বনি শুনি,
উজান বহে প্রেম যমুনারি বারি!
নুপুর হয়ে যেন হে বনচারি,
চরণ জড়ায়ে ধরি কাঁদিতে পারি॥

চতুর্থ ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র ১৩৪০,
ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, কালু, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণকিশোর, দ্বিজেন, তপেন, কানন, হরপ্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, ধনকৃষ্ণ, বটুক, মৃত্যুন, সুধাময়, পঞ্চানন, অজয়, মতি ডাঃ, অমল, ভোলা, অভয়, প্রভৃতি আছে।

পুত্তু। এক জনের সঙ্গে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তার মত, পূর্ব্ব জন্ম, পর জন্ম, কর্ম্ম, প্রারব্ধ ও সব কিছু নয়। যেমন থিয়েটারে কেউ বা রাজা, কেউ বা চাকর, কেউ বা পাগল এই রকম নানান ভাবে সেজে নামছে, আবার থিয়েটার শেষ হ'য়ে গেলে ঐ সাজার কোন চিহ্ন রইল না, তেমনি ভগবান তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি ক'রে পাঠিয়েছেন। এই ষ্টেজে (রঙ্গ মঞ্চে) কেউ বা এই সুখ ভোগ করবে কেউ বা এই দুঃখ ভোগ করবে এই রকম সব ঠিক ক'রে পাঠিয়েছেন। এই দেহ শেষ হলেই অর্থাৎ এই খেলা শেষ হলেই আর কারুর কিছু অস্তিত্ব রইল না।

ঠাকুর। প্রথমেই দেখ, যদি জান, যে তিনি সব করিয়ে পাঠিয়েছেন, এই সুখ দুঃখ তাঁর খেলার জন্য দিয়েছেন, আর খেলা শেষ হলেই অর্থাৎ এই দেহ শেষ হলেই সব শেষ হ'য়ে যাবে, তা হ'লে আর দুঃখ বোধ করই বা কেন, আর তা থেকে নিস্তার পাবারই বা চেষ্টা কর কেন? থিয়েটার করতে গিয়ে ছেলে মেয়ে ম'রে গেলে বা নিজে ভিখারি সাজ ব'লে কি দুঃখ বোধ কর? আবার, থিয়েটারের প্রথম অঙ্কে হয় ত রাজা সাজলে আবার শেষ অঙ্কে হয় ত ফকির সাজলে। এই পোষাক বদলে ফেলায় তোমার কি কিছু পরিবর্ত্তন হল, তেমনি তাঁর এই থিয়েটার লীলায় এক দেহ নিয়ে এক রকম সেজে এলেই

যে তোমার কাজ শেষ হোল তা ত জান না? হয় ত আবার অন্য দেহ নিয়ে অন্য রকম সেজে আবার খেলা দেখাতে হ'তে পারে। থিয়েটারে নেমে এক অঙ্ক দেখেই চ'লে যাও কেন? তিনি যদি কলের পুতুলের মতই তোমাকে দম দিয়ে পাঠিয়ে থাকেন ত দম কবে শেষ হবে জান কি? আর দম কমছেই বা কই? বাসনা ত কমছে না। তোমার এই দেহটা অর্থাৎ যেন গায়ের জামাটা ধ্বংস হয়ে গেলেই যে তোমার অস্তিত্ব চ'লে যাবে তা কেন? তুমি ত শুধু এই দেহটা নও। মন বুদ্ধি অহঙ্কার মিলে সূক্ষ্ম শরীরে হাওয়ায় মিশে আছে তখন হাওয়ার চেয়ে হাল্কা, তাই হাওয়ায় ভেসে আছে। যেই বাসনা নিয়ে ভারী হতে থাকে, অমনি নীচে স্থূল হয়ে পড়তে থাকে। বেশী স্থূল হলেই একটা দেহ ধ'রে থাকে। আর দেখা যায়, যে বাসনা ত মৃত্যুর সময়ও থেকে যাচ্ছে। কাজেই সেই বাসনা নিয়ে আবার স্থূল শরীরে আসা খুব স্বাভাবিক। যেমন ঘর বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার সময় ঘর বাড়ীর উপর মন থাকে ব'লে দিন কতক পরে আবার সেই ঘর বাড়ীতে ফিরে এস। যত ক্ষণ মরার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাসনা থাকবে তত ক্ষণ সেই বাসনা অনুযায়ী আসতেই হবে। সেই জন্য এই দেহ গেলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না ব'লেই না, সেই দুঃখের নিবৃত্তির এত উপায় রয়েছে। আর এই উপায় গুলো বাজে অনুমানের উপর নয়। সাধু, ঋষিরা এ সব প্রত্যক্ষ ক'রে দেখেছেন ব'লেই এত রকম ভাবে লিখে গেছেন। তুমিও সেই জন্য দুঃখের হাত থেকে নিবৃত্তির চেষ্টা কর এবং ঠিক সেই ভাবে চল্লে বাস্তবিক দুঃখের কিছু নিবৃত্তি হয়, কিছু ফল দেখতে পাও। তখন দেখেছ, যে আমিত্ব বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু চেষ্টা করলে কিছু ফল হয়ই। তা হলে এ গুলোকে উড়িয়ে দিতে পার না ত? আবার যদি বল, এ সব স্বাভাবিক, সূর্য্য ওঠা, ডুবে যাওয়া, দিন হওয়ার মত সব আপনা আপনি আসছে, যাচ্ছে তাতেও দেখ, স্বভাবের এই গতি বিধির শক্তি কে দিচ্ছে? নিশ্চয়ই আর একটা অপর শক্তি ওপরে ব'সে এই গুলো চালাচ্ছে। সেই শক্তি যে

কখন কোন দিকে শেষ হবে, তা যখন জান না, বোঝ না, তখন এইটাই স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সে আছ কি ক'রে, যে এই দেহ গেলেই তোমার সব শেষ হয়ে গেল? তোমায় যে সেই শক্তি আবার অন্য ভাবে নাচাবে না তাই বা জানলে কি করে? আর যদি স্থির জানই যে এই দেহ গেলেই তোমায় আর আসতে হবে না, তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তা হলে ত নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ করতে কিছু কম করতে কি? যা হবে, এই দেহটা যত দিন, তার পর ত, আর নয়! কিন্তু সে ভাবে থাকতে পার না কেন? না জান, যে এতেই শেষ হয় না, আবার আসতে হয়, ভোগ হয়। এ মর্ত্ত্য কেন, ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে যেখানে মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ হয়। সেই জন্য এ সবের অস্তিত্ব আছে ব'লেই মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধাদি এত ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

জিতেন। সব দেব দেবীর স্থানে কি একই শক্তি কাজ করে, না, ভিন্ন শক্তি কম বেশী ভাবে আছে?

ঠাকুর। শক্তি সেই একই। শক্তি কি ভিন্ন আছে? তবে স্থান বিশেষে খণ্ড শক্তি আছে হয় ত, অবার স্থান বিশেষে সেই শক্তি জমাট হয়ে বেশী থাকে। স্থান বিশেষে, প্রয়োজন হিসাবে কোথাও বেশী সাত্ত্বিক শক্তি, কোথাও বা রাজসিক আবার কোথাও বা বেশী তামসিক শক্তির প্রকাশ রয়েছে। নানা রূপে এসে, নানা ভাবে কাজ করছেন ব'লে রূপে বহু শক্তি আছে। রূপ ছেড়ে অরূপে যাওয়াও ত রূপের মধ্যে হল। একেবারে রূপের সীমানা ছাড়িয়ে অরূপের ভেতর গেলে আর রূপ থাকে না বটে। সদগুরু কৃপা ক'রে সেই অনন্ত রূপের সাগর অর্থাৎ অনন্ত জ্যোতির সাগর যেখান থেকে সব রূপের সৃষ্টি হয়েছে, দেখিয়ে দেন।

জিতেন। দেব স্থানে যে সব শক্তি দেখা যায় সে গুলো কি এক?

ঠাকুর। দেবস্থানে সব শক্তিই আছে। তোমার যেমন শক্তি তুমি তেমনি দেখবে। যার কাছে মোহর আছে, তার কাছে টাকাও আছে, পয়সাও আছে, তোমার অবস্থা অনুযায়ী, আধার অনুযায়ী বেছে নেবে। এই যে তারকনাথে রোগ সারাবার জন্যে লোকে হত্যা দেয়, তা তারা তারকনাথকে ত চায় না, তাঁর যে শক্তিতে রোগ সারে তারা সেই শক্তিকে চায়। এখানেও কি সকলেরই রোগ সারে? তা হতে পারে না। যার যেমন অবস্থা, যেমন কর্ম্মফল তেমনি হবে। তোমার কর্ম্মফল যত ক্ষণ না কমবে তত ক্ষণ তিনি তোমার অসুখ সারাবেন কেন? তুমি কত অন্যায় ক'রে কত কর্ম্ম সঞ্চয় করেছ আর এক বার দুঃখে প'ড়ে তার কাছে হত্যে দিয়েছ ব'লেই তিনি সব কর্ম্ম ফল কাটিয়ে দেবেন? তা ব'লে কি তাঁর রোগ সারাবার ক্ষমতা নেই? তিনি ইচ্ছা করলেই সব পারেন। তবে তিনি যা খুসি তাই করবেন কেন? এমন অনেকে ত আছে, ঝাড়, লণ্ঠন, বিছানা সব আছে তবু অপরে চাইলে দেয় না, তা ব'লে কি সে মন্দ লোক হবে? তার নিজের জিনিষ সে না দিলে মন্দ হবে কেন! মন্দ লোক কে? যে পরের ক্ষতি করে বা অপকার করে এবং যে পরের পীড়াজনক কাজ করে সেই মন্দ লোক। যেমন অপরের জিনিষ চেয়ে নিয়ে এসে ফেরত দিলে না বা ভেঙ্গে ফেল্লে। তেমনি স্পষ্ট বক্তা কে? যে যখন মনে যা এল স্পষ্ট ক'রে অপরকে সব মুখে বলে আবার অপরেও যখন তাকে বলবে সেও অম্লান বদনে সব সহ্য করে। কিন্তু অপরে বললে যদি সহ্য করতে না পারে ত সে স্পষ্ট বক্তা নয়, সে দুর্ম্মুখ। রজোগুণের স্বভাব হচ্ছে নিজেও যেমন খুব কড়া হবে তেমনি কড়া লোককে ভাল বলবে। আর নিজে কড়া হবে অথচ অপরে কড়া হ'লে ঘৃণা করা ত তমোগুণের লক্ষণ। আসল কথা হচ্ছে নিজের যেমন অবস্থা সেই রকম সব কাজ হবে। কর্ম্ম ফল ভোগ হবেই। স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে ত কিছু নেই। তবে সে ত আছে গরুকে যতটা দড়ি ছেড়ে দিয়ে

খোঁটায় বাঁধা আছে সেই টুকুর মধ্যে সে স্বাধীন। স্বাধীনই হও আর পরাধীনই হও তাতে কি? যে কর্ম্মের যে ফল, সে স্বাধীন হ'লে এক রকম আর পরাধীন হ'লে আর এক রকম হবে না ত? আগুনে হাত দিলে তোমারও হাত যেমন পুড়বে, তোমারও যেমন যন্ত্রণা হবে তোমার অধীনস্থ চাকরেরও ঠিক সেই রকম হবে। মনে এই এই সংযোগ হ'লে এই এই বুদ্ধি উঠবে এ সব বাঁধা আছে। যেমন সোডা আর লেবুতে ফোঁস করবেই। আমিত্ব ধ'রে থাকে ব'লে ভাবে সে করছে, তার স্বাধীনতা আছে। যদি স্বাধীনতাই থাকে, তা হলে দুঃখ কষ্ট ত কেউ চায় না, তত্রাচ কেউ ইচ্ছে ক'রে দুঃখ কষ্ট নিবৃত্তি করতে পারছে কি? যার যা কর্ম্মফলে আছে, যতই চেষ্টা কর ঠিক হবেই। কর্ম্ম ফল একেবারে খণ্ডন হয় না। সদগুরুতে বিশ্বাস রেখে তাঁর উপদেশ মেনে চল্লে তিনি কতক কর্ম্ম কাটিয়ে দেন, কতক বা নিজের ঘাড়ে নেন আর বাকী কিছু বা তার উপর দিয়ে ভোগ করিয়ে নেন। কিছু ভোগ করতেই হবে। এ হল ভক্তের ভাব কিন্তু জ্ঞানী ধরে, কর্ম্ম ফল ভোগ হয় হোক, দেহ ভুগুক, তার তাতে কি? সে সবটাই তার দেহের ওপর দিয়ে ভোগ করিয়ে নেয়। তা যে ভাবেই হোক কর্ম্মফল ভোগ হচ্ছেই। তবে জ্ঞানী সাধন পথে যাবার সময় শুধু নিজের চেষ্টায় যেতে চায় ব'লে অনেক কষ্ট ভোগ করে। গীতাতেই ভগবান ব'লেছেন "সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়। বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়" সে এটা ভাল এটা মন্দ এই বিচার রেখে গতি করে। তা হ'লেও তাকে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী চলতেই হবে। কাজেই গুরুতে কিছু বিশ্বাস না থাকলে তাঁর উপদেশ শুনে চলবে কেন? সেই জন্যে বলেছে ***গতি করতে হলে বিশ্বাস চাইই।*** সে জানে গুরু যেটা ব'লে দিয়েছেন সবটাই তাকেই করতে হবে তাই গুরু যেমন পথ দেখিয়ে দেন তেমনি ভাবে ঠিক নীতি নিয়ে সে চলতে থাকে। কিন্তু ভক্ত এ সব কিছুই ভাবে না বা বিচার করে না। সে জানে সদগুরুর আশ্রয় পেয়েছে গুরুই সব করিয়ে নেবেন

সে জ্ঞানীর মত কোন চেষ্টা করে না। অথচ গুরুতে ভালবাসা প'ড়েছে ব'লে তাঁর কাছে না গিয়ে তাঁর কথা মত কাজ না ক'রে থাকতে পারে না। গুরুতে ঠিক বিশ্বাস এলে গুরুর শক্তি আকর্ষণ হয় এবং গুরু শক্তি তাকে রক্ষা করে ও আপনি তার সব করিয়ে দেয়। সেও এই ভালবাসায় প'ড়ে সব ছাড়তে থাকে। ***যে দিকেই যাও ত্যাগ চাইই।*** জ্ঞানী না হয়, বিচার ক'রে চেষ্টা ক'রে ছাড়ে আর ভক্ত গা ভাসিয়ে দেয় ব'লে তার না হয় আপনি সব ছেড়ে যায়, যে ভাবেই হোক ফল একই দাঁড়াল। পূর্ণতা এলে দু ভাবেই ব্রহ্ম জ্ঞান হল তখন আর ভেদ নেই। ভক্ত শেষ পর্য্যন্ত রস আস্বাদন করবার জন্য 'আমি তুমি' রাখতে চায়, কিন্তু প্রেম এলে আর 'আমি তুমি' দুই ভাব থাকে না, এক হয়ে যায়। সাধারণতঃ লোকে বৈধী ভক্তি নিয়ে গতি করে। তাতে কিছু বিচার করে বটে কিন্তু এটাও জানে যে তার কোন হাত নেই যেন একটা টানে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। তত্রাচ একেবারে তাঁর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে গা ঢেলে দিতে পারে না ব'লে তাঁর উপদেশ মত কিছু কাজও করে। জ্ঞানী তার হাত নেই একথা মানে না। তার ধারণা তাকেই চেষ্টা ক'রে সব করতে হবে কিন্তু গুরুতে নিষ্ঠা থাকবেই। নইলে সাধন পথে যাবার আগে গুরু গৃহে গিয়ে গুরু উপদেশ মত চ'লে মন তৈরী করার বিধি থাকবে কেন ? এই ভাবে চললে মনের শক্তি কিছু বাড়লে ব্রহ্ম আছেন এই বিশ্বাস ঠিক আসে, তবে সেই আশায় সাধন পথে গতি করতে পারে ত ? যে দিকেই যাও যে ভাবেই চল মন একটাতে ঠিক ফেলে রেখে সদ গুরুর উপদেশ মত চলতেই হবে। তা ভিন্ন রকম রকম করতে গেলে কোন ভাবই দাঁড়াবে না। যত ভাব আছে সবই ঠিক, কোনটাই ভুল নয়। এর বিচার করতে না গিয়ে যে ভাব যার ভাল লাগে সেই ভাব নিয়ে কেবল সেইটে ধ'রে গতি করলে তবে কিছু উন্নতি হবে।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সদগুরুর সঙ্গই প্রধান। সদগুরু কে ? যার মধ্যে সেই ব্রহ্মময়ীর খেলা চলে, যার ভেতর

থেকে তিনি কাজ করেন। তাই বিভিন্ন প্রকৃতির এত লোক তাঁর কাছে আসে এবং এত সহজে তাদের সংস্কার গুলো ম'রে যায়। তিনি সদা আনন্দময়। তাঁর কাছে এলেই সেই আনন্দময় কোষের আনন্দের ছায়া এসে লাগবে, সাধন ভজন করার দরকার হবে না। মন যখন নীচের দিকে বাসনা কামনার অধীন, তখন ঠিক আনন্দ পাওয়া যায় না, সে আনন্দ নিরানন্দকেই বায়না করে কারণ কিছু আনন্দ পাওয়ার পরই যখন আবার নিরানন্দ আসে তখন তাঁকে আনন্দ বলা যায় কি ক'রে? সদগুরু সঙ্গে ভালবাসা পড়লে সেই বড় আনন্দের ভাব কিছু আসে ব'লে এই **সংসার আনন্দ** ভাল লাগে না। সংসারে ঠিক সুখ পাওয়া যায় না, যেটাকে সুখ ব'লে ধর সেটা ত সুখ নয়, সেটা দুঃখ। এখানে সুখ মানেই দুঃখের বায়না করলে। সেই জন্য সংসারীদের পক্ষে সদগুরু সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। সৎ এর সঙ্গে ঠিক ঠিক ভালবাসা পড়লে অপর সব দিক আপনি ছেড়ে যায়। একটু সামান্য আসক্তি নিয়ে থাকলেও স্বার্থ গেল না, আর ঠিক আনন্দও পেলে না। ভাল বাসার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যাকে ভালবাসা যায় তার সঙ্গে দেখা হ'লে আলাপে এত বিভোর হয়ে যায় যে অপর কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, এমন কি অতি প্রিয় জিনিষও ভুল হয়ে যায়। এখানে সৎ সঙ্গ বলতে যে সঙ্গ দ্বারা মনকে ক্রমশঃ আনন্দময় কোষের দিকে নিয়ে যায়, আর অসৎ সঙ্গ বলতে এখানে বুঝতে হবে যে, যার দ্বারা মন আনন্দময় কোষ থেকে দূরে নেমে আসে। (এখানে ঠাকুর "দেহ সুখ থাকায়, কুন্তীর কৃষ্ণকে ভুল হয়ে যাওয়ার" গল্প বল্লেন অমৃত বাণী ৩য় ভাগ ৯১ পৃঃ)। বাস্তবিক দেহ সুখ থাকায় কৃষ্ণকে ভুল হয়েছিল এই কথা কুন্তী যখন বুঝতে পারলে তখন কৃষ্ণকে বলছে, একটু সুখের আশাতেই তোমায় ভুলে ছিলুম, অতএব এই প্রার্থনা যেন সুখের অন্বেষণ আর কখনও না করি। দুঃখই আমার ভাল, তা হলে ত তোমায় ভুলব না। এই প্রেমের স্বভাব। প্রেমে আর কিছু চায় না কেবল তাঁকেই চায়।

দুঃখ পেলে তাঁকে পাওয়া যায় ত দুঃখই ভাল, সুখ দরকার নেই। আর সুখ পেলে তাঁকে পাওয়া যায় ত সুখই ভাল, দুঃখ দরকার নেই। সে সুখ দুঃখ কিছুই চায় না, চায় কেবল তাঁকে। সে দেহ মন প্রাণ সব তাঁকে দিয়ে দেয় কিছুই রাখে না, অর্থাৎ নিজে সব ত্যাগ করলে। আবার জ্ঞানী দেহ আদি সব অনিত্য ব'লে ছেড়ে দেয়। ভক্ত জ্ঞানী দু জনে দু ভাবে ছাড়ে বটে, কিন্তু মুলে সেই একই দাঁড়াল, ত্যাগ হয়ে গেল। ভক্তি তিন প্রকার রাগাত্মিকা বা সামর্থা, সামঞ্জস্যা ও সাধারণী। রাগোত্মিকা মানেই সমস্ত ছেড়ে সেই একটা নিয়েই প'ড়ে থাকে, আর কোন দিকে নজর দেয় না। সামঞ্জস্যা মানে দুই ই চায়। তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে চায়, অথচ স্বার্থটাকে বড় না করলেও একেবারে স্বার্থ ছাড়তে পারে না। সাধারণ স্বার্থটাকেই বড় করে, সেটা পুরো বজায় রেখে যদি সুবিধা হ'ল তো তাঁকে চায়। এই রাগাত্মিকা প্রেমের ভেতরও আবার স্তর ভেদ আছে। এর পূর্ণতা এলে ভাল কি মন্দ কোন রকম বিচার থাকে না। কারণ তখন আর ভক্তের নিজের কিছুই থাকে না নিজের অস্তিত্বও রাখতে চায় না। (এইখানে ঠাকুর "গুরু ও লালা বাবু, চরণ দাস ও ভগবান দাসের" গল্প বল্লেন, অমৃতবাণী ৩য় ভাগ, ৩৬ পৃঃ)। তিন জনেরই সাত্বিক প্রেম অর্থাৎ তিন জনেই সংসার আদি সব ছেড়ে এসেছে। তিন জনেই কঠোর নীতি নিয়ে গুরু নিষ্ঠা বজায় রেখে দেহ মন প্রাণ অর্পণ ক'রে গুরু সেবায় আছে এবং অতি সৎ ভাবে দিন কাটাচ্ছে, তত্রাচ লালা বাবু ও চরণ দাসের এ টুকু বিচারও মনে এল গুরুর অঙ্গে পা দেবে কি ক'রে? কিন্তু ভগবান দাসের সে টুকুও নাই। সে যখন দেহ মন প্রাণ সব দিয়েছে তখন পাও ত তাঁর, তাঁর জিনিষ দিয়ে তাঁরই সেবা করবে তাতে দোষ আবার কি? তার ওপর আবার যখন তিনি বলছেন এতে তাঁর আরাম হবে। এরই নাম পুর্ণ ভালবাসা, প্রেম। তা ছাড়া সাধারণতঃ খণ্ড ভালবাসাই বেশী। কোন বস্তুর উপর বা কোন কারণ নিয়ে ভালবাসা পড়ল,

আবার সেটা স'রে গেলেই ভালবাসাও চ'লে গেল। তবে এও ঢের ভাল, কারণ যেন তেন প্রকারে কিছু ভালবাসা পড়ল ত, মনটা কিছু সময়ের জন্যও ত এ-পথে এল। আবার সদগুরুর সঙ্গে এই খণ্ড ভালবাসা পড়লেও ঢের বেশী কাজ হয় কারণ তাঁর শক্তির প্রভাবে এবং তাঁর সেই পূর্ণ আনন্দের ছায়ায় নিরানন্দময় কোষের জিনিষ-গুলো সব আপনা আপনি স'রে যায়। তাই সৎ গুরু সঙ্গকে এত বড় ক'রেছে। তাই বার বার বলেছে অন্ততঃ কিছু সময় ঠিক মন দিয়ে সৎ গুরু সঙ্গ কর তা হলে তোমার আর আলাদা সাধন ভজনের দরকার হবে না তিনি নিজে ভালবেসে আপন ক'রে সব করিয়ে দেবেন। ভালবাসায় এই আপনত্ব এলেই বুঝবে যে ঠিক স্রোতের মুখে পড়লে তখন আর কোন চিন্তার দরকার হয় না আপনি টেনে নিয়ে যাবে।

ইন্দ্র গাহিল

যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম সকলি নিও হে স্বামী
যত সাধ আশা প্রীতি ভালবাসা সঁপিনু চরণে আমি।
ধ'রে যারে রাখি আমার বলিয়া
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া
অনিমেষ আঁখি তুমি ধ্রুবতারা জাগ দিবস যামি
মায়ারই ছলনায় পুতুল খেলায় ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়
আমি ভুলেছি সে খেলা আজি অবেলা তোমারি দুয়ারে আমি

———

চতুর্থ ভাগ—ষোড়শ অধ্যায়

——(০)——

কলিকাতা, রবিবার, ২৫শে ভাদ্র ১৩৪০,
ইং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, কালু, ললিত, পুত্তু, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, দ্বিজেন, হরপ্রসন্ন, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, অজয়, মতি ডাক্তার, অমল, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

ডাঃ সাহেব। স্থূলে সঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বেশী কাজ হয় ত? তা হ'লে দূরে থাকলে সূক্ষ্মে তত কাজ হবে কি?

ঠাকুর। কাজ ত সব সূক্ষ্মেই। এই যে ভালবাসায় এত কাজ হয় এও ত সূক্ষ্মের ব্যাপার। মন ত সকলেরই আছে, ভালবাসাও সকলেরই আছে। কোনটাই ত স্থূলে দেখা যায় না অথচ কোন একটায় ভালবাসা লাগলে মনটা তাতে পড়ে ব'লেই কাজ হয়। তবে স্থূলে চট ক'রে ভালবাসাটা লাগতে পারে। তা ছাড়া, সাধারণ সংসারীরা সর্ব্বদাই রূপ রস আদি স্থূল নিয়ে ব্যস্ত ব'লে স্থূলে কাজটা তারা বেশী ধরতে পারে, বুঝতে পারে। সেই জন্য তাদের দিক দিয়ে স্থূলটাই বড়। তা ভিন্ন, আসল কাজ ধরতে গেলে সূক্ষ্মেই ত সব হচ্ছে। স্থূলে কটা লোকই বা আসছে এবং কত দিন ধ'রে ও কটা যায়গাতেই বা কাজ হতে পারে? তবে সাধারণ ভাবে স্থূলে বেশী কাজ হয় কারণ স্থূলে সহজে মনটা তৈরী করিয়ে বীজ ফেলায় তাড়া তাড়ি কাজ হয়। বীজ ত একই, কিন্তু মাটি ভাল হলে তবে ত ভাল গাছ হবে আবার সেই গাছ বড় হ'লে তবে ত ফল ফুল হবে। তোমরা এই ফল ফুলটা দেখলে তবে বুঝতে পার যে কাজ হোল, কিন্তু যিনি মাটী তৈরি ক'রে বীজ ফেলে যান তিনিই যে প্রধান, এটা ধারণা করতে পার না। তার পর কেউ বা আগাছা মেরে গাছটা বড় ক'রে দিলে, কেউ বা ফল ফুলে তাকে সাজালে। সেই হিসাবে স্থূলে সঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা যত বেশী কাজ হয়, দূরে ঠিক ততটা কাজ

হয় না বটে। সেই জন্যই যত ক্ষণ স্থূলে সদগুরুর সঙ্গ করা সম্ভব হয় তত ক্ষণ নীতি পালনের উপর তত জোর না দিলেও, তিনি দূরে থাকলে তাঁর উপদেশ মত কড়া ভাবে ঠিক নীতি পালন করা বিশেষ দরকার।

পুত্তু। ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর যে ভিন্ন ভিন্ন বীজ মন্ত্র আছে এ গুলো কি সব ভিন্ন না এক?

ঠাকুর। ভিন্ন ভিন্ন বীজ মানে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কাজ। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দ দ্বারা সৃষ্টি। এ শব্দ যে কেন হয়, এ কেউ বলতে পারে না। আপনা আপনি শব্দ উঠছে। তা থেকে জ্যোতি আসতে লাগল এবং তারপর সব মূর্ত্তি এল। যখন যে যে রূপে এসে কাজ ক'রে গেছেন সেই সেই শব্দ গুলো সেই সেই জপের বীজ। গোলাপের যেমন নির্য্যাস এই বীজ গুলো তেমনি সেই সেই রূপের চরম শক্তি। এই বীজ গুলো সব সিদ্ধ জিনিষ ব'লে এতে বেশী কাজ হয়।

বিভূতি। তা হলে এই বীজ মন্ত্র ধ'রে জপ কল্লেই ত বেশী কাজ হবে?

ঠাকুর। জপ জিনিষটা হল সাধকদের, যা দ্বারা সাধনা করা যায়। নিয়মিত বীজ মন্ত্র জপ করা একটা সাধন বিধি। সাধনা মানেই একটা বাঁধি জিনিষ ধ'রে গতি করা। প্রেমে এইটে আপনা আপনি হয়, কারণ প্রেমে আর সব ত ছেড়ে গেছে কেবল একটাই ধ'রে আছে। কাজেই তার ত সর্ব্বদাই আপনা আপনি সেই রূপ ধ্যান হচ্ছে। এ ভাব এলে কি বাঁধি কোন জিনিষ আর থাকে? তবে ভক্তি পথেও বীজ মন্ত্র জপ করা হচ্ছে, বৈধী ভক্তির জিনিষ। তখনও সেই ভাব ঠিক আসেনি।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সাধারণ সংসারীদের সঙ্গই হচ্ছে প্রধান। সৎ কথা ত অনেকেরই বিশেষতঃ হিন্দুদের ঢের জানা আছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী চলতে পারে কই? সংসারীদের মন সাধারণতঃ অন্নময় ও প্রাণময় কোষে থাকে তখন সংসারটা খুব ভাল লাগে এবং দেহ সুখ আদি সংসারীয় বাসনা

গুলোকে বড় করে। এ হ'লো বদ্ধ অবস্থা। বাসনাই দুঃখের সৃষ্টি করে। দুঃখ ব'লে ত আর একটা আলাদা জিনিষ নেই। বাসনা না পুরলেই দুঃখ। মানুষের সাধারণতঃ ক্ষুধার যন্ত্রণা, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর তাড়না ও ব্যাধির যন্ত্রণা এই তিনটী স্বাভাবিক দুঃখ। এ ছাড়া সব ধার করা দুঃখ। মন জ্ঞানময় কোষে এলে ঠিক বোধ আসে যে সংসারে দুঃখের ইতি নেই এবং এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করে। এ হ'লো প্রবর্ত্তক অবস্থা। এ অবস্থায় জ্ঞানী যেমন দুঃখের নিবৃত্তি চায়, ভক্ত তেমনি ভগবানকে চায়, তাতে দুঃখ থাকে থাক, যায় যাক, সে সুখ দুঃখের খবর রাখে না, সে চায় ভগবানকে। তা হ'লে দেখ, এতেও ভক্ত দুঃখ গ্রাহ্য করে না ব'লে তার কাছে দুঃখের নিবৃত্তি হ'লো। মন বিজ্ঞানময় কোষে এলে জ্ঞানীর বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত বোধ আসে, তখন সংসার ভাল লাগে না, এই সাধক অবস্থা। ভক্তরও এ রকম একটা অবস্থা আছে, তখন ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে, তখন তারও সংসার প্রভৃতি কিছুই ভাল লাগে না। সাধারণতঃ প্রবর্ত্তক ও সাধক অবস্থার মাঝে সদগুরু লাভ হয়, সাধক তখন বস্তু লাভের জন্য এক লক্ষ্য হয়ে তাঁর উপদেশ মত চলে। এর পর আনন্দময় কোষে এলে তীব্র বৈরাগ্য আসে এবং সব ছেড়ে যায়। তখন বস্তু লাভ হবেই। এ হ'ল সিদ্ধ অবস্থা। ভক্তেরও ব্যাকুলতার পর অনুরাগ আসে তখন দর্শন হয়। আনন্দময় কোষের ওপর মনের অস্তিত্ব থাকে না, এই হ'ল সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থা। ভক্তেরও অনুরাগের পর প্রেম এলে মিলন হয়। ভক্তও নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়। কি রকম জান ? সংসার করতে করতে বাবুকে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু গিয়ে দেখা করা হ'য়ে উঠছে না। এই হ'লো প্রবর্ত্তক অবস্থা। তার পর একটু জোর ইচ্ছে হচ্ছে, এমন সময় এক জন সঙ্গীও জুটল। সে তখন বল্লে, চল না বাবুর সঙ্গে দেখা করবে চল, এই সাধক অবস্থা। তার পর বাবুর বাড়ী গিয়ে

বাবুকে দেখলে, এ সিদ্ধ অবস্থা। এর পর বাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'লে সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থা। তখনই ঠিক বিজ্ঞান অবস্থা হয়। এ সব কি জান, ত্যাগীদের জন্য, কিন্তু সংসারীদের পক্ষে সাধু সঙ্গ এক মাত্র উপায়। সাধন ভজন ক'রে গতি করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা দান, পরোপকার, অতিথি সেবা, সাধু সঙ্গ এই কয়টী দ্বারা গতি করবে। সাধু সঙ্গের এমনি প্রভাব যে অন্ততঃ কিছু সময়ও ঠিক সাধু সঙ্গ করলে অনেক লাভ হয়। (এই খানে ঠাকুর "কথক, ব্যবসাদার ও মুটের" গল্প বল্লেন অমৃত বাণী ২য় ভাগ ১৪৩ পৃঃ)। সাধুর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ক্ষমা। সাধু কখনও কারুর দোষ দেখে না। সে সকলকে ভালবেসে আপন ক'রে নিয়ে গতি করায়। তাই সাধু সঙ্গে চট্ ক'রে ভালবাসা লেগে যায়। কারুর বা দেখা মাত্র লেগে যায়, আবার কারুর আসতে আসতে হয়। যে রকমেই হোক ভালবাসা পড়া চাই তা ভিন্ন কাজ হয় না। ভালবাসা মানেই ত্যাগ। ত্যাগ না থাকলে প্রেম আসতে পারে না। আবার দেহ মন প্রাণ সব অর্পণ না করলে তাঁর দর্শনও হয় না।

জ্ঞান (গোস্বামী) গাহিল

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণা টুকু যদি হারায় তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায়।
নদী তট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউ গুলি কোথা ধায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমার এ ক্ষুদ্র হারাধন গুলি রবে না কি তব পায়॥

চতুর্থ ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায়

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ২৯শে ভাদ্র ১৩৪০,
ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

সন্ধ্যার পর ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, পুত্তু, ললিত, কালু, দ্বিজেন, কেষ্ট, বিজয়, অজয়, জিতেন, কৃষ্ণ কিশোর, হর প্রসন্ন, বিজয়, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, ধনকৃষ্ণ, কিরণ মজুমদার, কালীমোহন, মৃত্যুন, মতি ডাঃ, অমল, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। দেখা যায় ভগবানকে ডাকলে আরও বেশী দুঃখ বাড়ে। যেমন ধরুন ভারতবর্ষ ত চির কালই ধর্ম্ম ক'রে আসছে, ভগবানকে ডাকছে। এখানে বহুলোকে তপস্যা ক'রে সিদ্ধ হয়েছে। অবতারেরা প্রায় সকলেই এখানে জন্মেছেন, তত্রাচ ভারতবর্ষের অবস্থা আজ কাল সকলের তুলনায় এত হীন কেন? এ রকম যখন, তখন ভগবানকে না ডাকলেই বা কি হয়? শুধু সাংসারীক ডাকার চেয়ে না ডাকাই ভাল।

ঠাকুর। এ ত ভগবানকে ডাকলে আরও বেশী দুঃখ হয় এর উদাহরণ হ'লো না। সমস্ত জাতিটা ত আর ভগবানকে ডাকতে পারে না। কয়েক জন লোক হয় ত ঠিক ভগবানকে ডাকে বাকী ত তাঁকে পাবার জন্য ডাকে না। কামনা বাসনা নিয়ে সংস্কার বশতঃ তাঁর নাম করে মাত্র। তা হ'লেই কি সব দুঃখ চ'লে যাবে? ভারতবর্ষের চিরকাল ত্যাগই আদর্শ। অবতাররা মাঝে মাঝে এসে এই ত্যাগ নীতিই জোর ক'রে প্রচার ক'রে গেছেন। আর এই ত্যাগ নীতিতে আছে ব'লে হিন্দু সভ্যতা সব চেয়ে পুরান হ'লেও এখন পর্য্যন্ত ঠিক রয়েছে এবং এখনও পর্য্যন্ত অপর দেশের তুলনায় ছেলে পরিবার নিয়ে দু বেলা দু মুঠো খেয়ে ঢের সুখে আছে, তাদের মত অত অভাবে হা হা কচ্ছে না। পৃথিবীর অপর কোন জাতি কি

এত দিন এই ভাবে থাকতে পেরেছে? গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব কই? ভগবানের আবার এ জগতে নিজের দেহ ধারণ ক'রে আসার দরকার কি? তিনি দেখাচ্ছেন যে এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ ধারণ ক'রেও তাঁর নামে থাকলে আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। তা ছাড়া দুঃখটা বলছ কাকে? টাকা কড়ি হচ্ছে না, ভোগ বাসনা মিটছে না, একেই না দুঃখ বলছ? তা, বাসনা কামনা থাকতে দুঃখ আসবেই এর আর নতুন কি? ভগবান সকলকেই বিবেক দিয়েছেন, যার সেই বিবেক জাগে সে বোঝে যে বাসনা মানেই দুঃখ। তখন সে বাসনা ত্যাগ করতে চেষ্টা করে ও শান্তি পায়। সাধু ও ঋষি, যারা সমস্ত বাসনা ত্যাগ ক'রে তাঁর নামে রয়েছে তারা কি দুঃখী? তারা ত, বরাবরই নিজেদের সুখী ব'লে গেছে এবং ত্যাগ ছাড়া সুখ নেই ব'লে সকলকে এই ভাবে চলতে উপদেশ দিয়ে গেছে। গোটাকতক লোক বের ক'রে দেখাও যে ভগবানকে ডেকে বাস্তবিকই বেশী দুঃখ পেয়েছে। সংসারে অর্থ, সম্পদ, যশ, মান, দেহ সুখ প্রভৃতিকেই যদি সুখের লক্ষণ ব'লে ধর, ত রাজা রাজড়াদের এর কোনটীরই ক্রটী নেই, তত্রাচ একটা রাজা বের করতে পার কি, যে প্রাণ খুলে বলতে পারে, যে সে সুখে আছে? শাস্ত্রে ত এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে, সাধারণ তোমাদের তুলনায় তারা হয় ত অনেক সুখী। আর তা ত হবেই, অনেক সুকৃতি না থাকলে রাজা হয় না। গীতাতে বলেছে "নরাণাঞ্চ নরাধীপ।" সুখ দুঃখ ব'লে ত কোন জিনিষ নেই। বাসনা মিটলেই সুখ, নইলে দুঃখ। তা, কারুর বা টাকার বাসনা, টাকা না পেলে দুঃখ, আবার কারুর বা ছেলের বাসনা, ছেলে না হলেই দুঃখ, অথচ সে হয় ত গরীব, তার টাকার অভাবও আছে। প্রয়োজন হিসাবে দুঃখ বোধ হয়, এর কোন একটা বাঁধা নিয়ম নেই, যে এ না হ'লেই দুঃখ হবে। আবার জ্ঞানের উপর এই প্রয়োজন বাড়ে কমে। তিনি ত তোমার ডাক শুনবার জন্য লালায়িত নন, তোমার প্রয়োজন হয় তাই ডাক। শুনেছ, সাধু

ঋষি প্রভৃতি তাঁকে ডেকেই শান্তি পেয়ে গেছেন এবং এখনও শান্তি পাচ্ছেন, তখন তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমিও শান্তি পাবার জন্য তাঁকে ডাকছ, তা ভিন্ন, শুধু শুধু কি তাঁকে ডাক? আর তাঁকে না ডাকলে ক্ষতি নেই, যদি তুমি কাউকে না ডাক। সংসারে অপর সকলকে ডাকবে আর তাঁর বেলাই ডাকবে না কেন? এই সংস্কারও ভাল। শুধু সংস্কার হিসাবে তাঁকে ডাকলেও তিনি অনেক মঙ্গল করেন এবং হয় ত ডাকতে ডাকতে এক সময় ভালবাসাও প'ড়ে যেতে পারে। আসল কথা, যারই বাসনা নিবৃত্তি হয়েছে সেই সুখী। আর এই ভারতবর্ষে এমন লোক পাবে যারা বাস্তবিকই সব বাসনা কামনা ত্যাগ ক'রে সর্ব্বদাই তাঁর নাম নিয়ে আনন্দে রয়েছে। আবার বাসনা ত্যাগ না হতে থাকলে তাঁকে ডাকতেই পারবে না।

জিতেন। তা হলে, তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান তিনি সব পারেন এ আর দেখাচ্ছেন কই?

ঠাকুর। তুমি কি চাইছ, সব নিয়ম উল্টে দিয়ে অলৌকিক দেখিয়ে সর্ব্বশক্তিমানের প্রমান দেখাবেন? তা করবেন কেন? তিনি লৌকিকের মধ্যে অনেক অলৌকিক এবং সাধারণের মধ্যে অনেক অসাধারণ দেখাচ্ছেন ত কিন্তু তুমি তা বুঝবে কি ক'রে? সে বোঝবার মত শক্তি তোমার কই? যারা সাধন ভজন ক'রে শক্তি অর্জ্জন ক'রেছে তারাই বুঝেছে এবং ব'লে গেছে। তাদের কথায় বিশ্বাস কর, নয় ত নিজে সেই শক্তি আনতে চেষ্টা কর।

জঃভঃ। কি করে একটা ভাব রক্ষা করা যায় বা বাড়ান যায়?

ঠাকুর। ভাব ভাঙ্গে কারা? সংসারীর বাসনাই ভাব নষ্ট ক'রে দেয়। যে বাসনা নিয়ে একটা ভাব ধ'রে রেখেছ সেটা রক্ষা করতে গেলে অপর সব বাসনা থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ অপর বাসনা ঢুকলেই, অপর ভাব এসে এই ভাবটা নষ্ট ক'রে দিতে পারে। ঘোলা জল পরিষ্কার করতে গেলে আগে দেখতে হবে যাতে আর অপর ময়লা জল না ঢোকে। নর্দ্দমার সঙ্গে যোগ থাকলেই

আপনি অপর ঘোলা জল এসে ঢুকবে তাই আগে নর্দ্দমা গুলো বন্ধ ক'রে দিতে হবে, তবে জল পরিষ্কার করার কথা ভাবতে পারবে। যে যে সঙ্গে তোমার ভাব নষ্ট হবার ভয় আছে, সেই সেই সঙ্গ আগে ত্যাগ করবে, এই ভাবে চলতে পারলে ভাব আর নষ্ট হতে পারবে না, তখন সাধু সঙ্গে, সৎ সঙ্গে সেটা শীঘ্র বেড়ে যাবে।

ডাঃ সাহেব। নর্দ্দমা গুলো কি ?

ঠাকুর। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভেতরের বৃত্তি গুলো অন্তঃ শত্রু আর আত্মীয় স্বজন যারা নিজেদের ভাব নিয়ে এই ভাবটা নষ্ট করতে চায় তারা বহিঃ শত্রু। এই দুটোর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তবে কিছু ফল বুঝতে পারবে।

জঃ ভঃ। পর পর কয় দিন কীর্ত্তন শুনলেই মনটায় বেশ একটা ভাব আসে। এটা কি ?

ঠাকুর। এটা এমন কিছু নয়। কীর্ত্তনে সাধারণতঃ মনে কোমল ভাবে ঘা মারে ব'লে ঐ রকম হয়। ও স্থায়ী নয়, কারণ কীর্ত্তন ভেঙ্গে গেলেই আর সে ভাব থাকে না। প্রেমের স্থান শুদ্ধ সত্ত্ব মনে। শুদ্ধ সত্ত্ব না হলে প্রেম আসতে পারে না। তা ভিন্ন, সাধারণ ভালবাসা, কারণ তখনও স্বার্থ রয়েছে। কীর্ত্তনে নেবার জিনিষ হচ্ছে গোপীদের প্রেম, গোপীরা আত্মীয় স্বজন ত্যাগ ক'রে, দেহ সুখ প্রভৃতি তুচ্ছ ক'রে কত অপমান সহ্য ক'রেও নির্ভয়ে সেই এক কৃষ্ণকে ভালবেসে, এক লক্ষ্য হয়ে ছুটছে এইটেই নিতে হবে। ভয় থাকলেই স্বার্থ রয়েছে, তখন ঠিক ভালবাসা আসতে পারে না, তাই প্রেমে ভয়শূন্য ভাব আসে। এ দিকে কৃষ্ণেরও স্বভাব দেখ, অত লোকের প্রাণ পণ ভালবাসা গ্রহণ ক'রে, তাদের ভালবেসে ধন্য ক'রেছেন, কিন্তু কাজের সময় যখন দ্বারকায় যাচ্ছেন, এক কথায় এ সব তুচ্ছ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন, গোপীরা কেঁদে যে রথের চাকার তলায় পড়ছে সে দিকে লক্ষ্যই নেই। আবার সেখানে গিয়ে অপরকে ভাল বাসছেন, সাধারণ এ ধারণা করতেই পারবে না। জীবের মনের স্বভাব হচ্ছে এক সঙ্গে দুটো ধরে না, এক জনকে

ভাল বাসলে সে ভালবাসা রেখে আবার এক জনকে ভালবাসতেই পারবে না। যদি কেউ বলে, দু জনকে ঠিক ভালবাসে, হয় সে মিথ্যা বলছে, নয় ঠিক ভালবাসা যে কি তার জ্ঞান নেই। তাই গোপীরা এক কৃষ্ণ ছাড়া কাউকে ভালবাসতে পারে নি, আর সব ছেড়ে ছিল, এদের সম্বল এক ঘটী জল, এক জনের বেশী লোককে দিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণের ভালবাসা অনন্ত ব'লে এত লোককে ভালবেসেও ফুরোয় না। সেই জন্য তিনি গোপীদের সকলকে ভালবেসে আবার অন্যত্র গিয়েও তাদের সমান ভালবাসতে পেরেছেন। গোপীদের প্রেম ও কৃষ্ণের নির্লিপ্ততা এই দুটো কীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ। সংসার করবার মত শক্তি থাকে, সংসার কর। অপরের বাড়ীর লোক জন খাওয়াবার ভাঁড়ারী হ'য়ে যেমন সব জিনিষ নিজের মত টেনে কাজ ক'রে, লোক জন খাওয়া শেষ হ'লে বাড়ীর কর্ত্তাকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে এসো আর কোন চিন্তা রাখনা, সেই রকম সংসারে কোন বিষয়ে বদ্ধ না হ'য়ে সংসার করতে পার ত, দুঃখ আর বিশেষ স্পর্শ করতে পারবে না। এ খুব মনের শক্তির দরকার। সদগুরুর চরণে স্থির বিশ্বাস রেখে চলতে পার ত, বাসনা অধীন ক'রে এই ভাবে সংসার করতে পার। তখনই ঠিক ভালবাসতে পারবে। ঠিক ভালবাসা মানে, যাকে ভালবাসবে তার উপকার করবে, একান্ত উপকার না করতে পার ত, যেন অপকার কিছুতেই ক'রো না।

জঃভঃ। গুরু কি নিজে চেষ্টা ক'রে নিতে হয়, না আপনা হতেই পাওয়া যায়? গুরু চিনব কি করে?

ঠাকুর। নিজে চেষ্টা ক'রে নিতে হয়, আবার পূর্ব্ব সুকৃতিতে কারুর কারুর আপনি জুটে যায়। যে জিনিষের জন্য মন ব্যাকুল হয় তখন সে জিনিষ সহজে পাওয়া যায়। আবার সদগুরু চিনবার মত অবস্থা না এলে ত সদগুরু চিনতে পারবে না। তবে, প্রাণে ঠিক ঠিক আকাঙ্খা এলে, সৎ হবোই, মনে এই চিন্তা জোর ধ'রলে

তিনি সদগুরু জুটিয়ে দেবেন। এমন কি যদি ঠিক ঠিক মনে জোর চিন্তা কর যে, আমি সাধু, তখন আপনা আপনি সাধুর মত থাকবে, চলবে এবং ঠিক সাধু হ'য়েও যাবে।

ডাঃ সাহেব। আমি সাধু, এটা ভাবলে ত মনে অহঙ্কার আসতে পরে।

ঠাকুর। যদি আমি সাধু, এই ভাবটা অপরের কাছে প্রকাশ করতে যাও ত অহঙ্কার হোল। তা ভিন্ন যদি নিজে শুধু মনে মনে সাধু ব'লে চিন্তা কর ও সেই ভাবে চল ত অহঙ্কার হবে কেন? এও যে একটা সাধনা।

বিভূতি। সাধু সঙ্গ ক'রে কর্ম্ম ক্ষয় করছি, আবার চাকরি কচ্ছি এতে কি ঠিক কর্ম্ম ক্ষয় হচ্ছে?

ঠাকুর। তুমি ত সংসারের বাসনা নিয়েই এসেছ। ঘোলা জল নিয়ে ত ব'সেই আছ। সংসারে বাসনা মানেই অর্থ, সম্পদ, পুত্র, পরিবার, যশ, মান সবই তোমার ভেতর আছে এবং তার জন্য যা যা দরকার করছ। তবে এ গুলো ছাড়তে না পারলেও যদি এটা বোঝ, যে এ গুলো ঠিক নয়, এবং ছাড়তে পার না ব'লে মনে অশান্তি ভোগ কর, তখন আর এ গুলোতে ডুবে থাকবে না। এই ত হ'ল কিছু চৈতন্যের লক্ষণ। তখন আর সংসার বাসনায় ডুবে বেশী কর্ম্ম সঞ্চয় করবে না। সাধু সঙ্গের প্রভাবেই এই ভাবটা এসেছে, এর পর যে পরিমাণ মন সাধুতে দেবে সেই পরিমাণ কাজ হবে। সাধু সঙ্গের এমন প্রভাব যে কিছু সময় সঙ্গ ক'রলেও সেই পরিমাণ ফল পাবে। সাধু সঙ্গ অগ্নির তাপ, কাছে এলে আপনি জল ম'রে যাবে, এমন কি শুধু দেহ সঙ্গ ক'রলেও সামান্য কাজও হবে। ***সাধু সঙ্গ একেবারে নিষ্ফল হয় না।***

জিতেন। এক জনের নাম শুনে বড় ব'লে বিশ্বাস হওয়ায়, তাঁর কাছে দীক্ষাও নেওয়া হল। একে বিশ্বাস বলা যাবে ত?

ঠাকুর। যদি তুমি তোমার ভাব দিয়ে তাকে মাপতে না যাও, তাহলে বিশ্বাস আছে বলা যাবে। তুমি যখন তাকে বড় ব'লে ধ'রে নিয়েছ তখন তার সকল ভাবকে বড় করবে। তখন যদি তাকে এক দিন মদের দোকান থেকে বেরুতে দেখ, তা হলেও ধ'রে নেবে হয় ত এদের কোন মঙ্গলের জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। এইটা ভেবে তার সেই বড়ত্ব সমান রাখবে, তবেই ঠিক বিশ্বাস বলা যাবে। তা ভিন্ন, যেমন সাধারণ ভাষায় ভগবানকে সকলেই বড় বলে সেই রকম, কিন্তু ঠিক বোধ নেই। ভগবান বড় হ'লে তোমার কি? এ বড় বলার মানে হচ্ছে, যে যদি চেষ্টা ক'রে কোন সময়ে সেই রকম বড় হতে পার। গুরুকে যখন বড় বলছ তখন তার উপদেশ মত চ'লে তাকে ভালবেসে সেই রকম বড় হবার চেষ্টা কর যদি, তবেই ঠিক বড় করলে নইলে শুধু মুখে বড় ব'লে লাভ কি? বল-বানের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই বলবান হ'লে না ত? চেষ্টা ক'রে বলবান হতে হবে, তবে তার সঙ্গে থাকায় পথে বিপদ আপদ আসবে না। সেই রকম সদ গুরুর আশ্রয়ে থাকলে হঠাৎ বাইরের কোন বিপদ এসে নষ্ট ক'রে দিতে পারবে না, তখন চেষ্টা করলে সহজে উন্নতি করতে পারবে। যে প্রেম বা ভক্তি ভালবাসায় গতি করে, সে জানে যে গুরু যখন বড়, আর আমি যখন তাকে ভাল বেসেছি, তার কৃপা পেয়েছি, তখন আমার আর ভাবনা কি? আমি ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি, কারণ আমি জানি যে আমিও বড়। এই হ'ল বিশ্বাস। তাই পরমহংসদেব বলতেন ***যে সদগুরু পেয়েছে সে ত তাকিয়া পেয়েছে। সে ত ঠিক বিশ্বাস রেখে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরাম করতে পারে। তার কিছু করার দরকার হয় না। গুরুতে ভাল-বাসা পড়লেই সর্ব্বদাই সেই মুর্ত্তি চোখের সামনে ভাসে, এ হ'ল ভালবাসার লক্ষণ। কাজেই তার ত আপনা আপনি সর্ব্বদাই স্মরণ মনন ও সেই মুর্ত্তি ধ্যান হয়েই যাচ্ছে।*** যে জ্ঞান পথে যাবে সে জানে গুরু যখন বড়, তখন তিনি

যেটা ব'লে দিয়েছেন ঠিক সেই মত চল্লেই আমিও বড় হব। এই ভেবে সে ভাল মন্দ বিচার না ক'রে যে রকমে হোক গুরুর উপদেশ মেনে চলবার চেষ্টা করে। *যে দিকেই যাও গুরুতে ঠিক বিশ্বাস থাকা চাই। তিনি যা বলেন সবই তোমার মঙ্গলের জন্য, কেবল এইটী লক্ষ্য রেখে তাঁর কোন ভাবের বিচার করতে যেও না তবে ঠিক কাজ হবে।*

পুত্র। অবতার জগতের কল্যাণের জন্য আসেন আবার যাদের কৃপা ক'রে টানেন তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে না। এ দুটো কি উল্ট হ'লো না?

ঠাকুর। তিনি সকল সময়েই জগতের কল্যাণ কচ্চেন, তা ছাড়া অবতার রূপে দেহ ধ'রে এসে জগতে যে ভাবটা ছড়িয়ে যান তাতেই সব মঙ্গল হয়। এই ভাবটা ছড়াবার জন্যই আসেন, এবং এর পোষ্টাই করবার জন্য অনেক সময় অন্তরঙ্গ থাকের দু এক জনকে সঙ্গে আনেন। সেই জন্য দেখবে, অবতার জীবিত থাকার সময়ের চেয়ে দেহ রাখবার পর ঢের বেশী কাজ হয়, তখন সেই ভাবটা খুব ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কাছে এলেই যে হবে, নইলে হবে না এ ত নয়। কোন সময় একটা চোরও চুরি করবার মতলবে এসে তাঁর কাছে বসতে পারে, তবে যারা সব ছেড়ে পাগল হ'য়ে ছুটছে তাদের কথা ভিন্ন, তাদের থাক আলাদা। যে যেমন স্তরের লোক তার ঠিক সেই ভাবে কাজ হয়। কারুর বা জমী চাষ ক'রে তৈরী করতে হয়; কারুর বা জমী তৈরী থাকে, বীজ ফেলতে হয়; কারুর বা গাছ হয়েছে, আগাছা মেরে গাছ বড় করে দিতে হয়; আবার কারুর বা গাছ বড় হয়েছে, শুধু ফল ফুলে সাজিয়ে দিতে হয়। বেলে মাটী হ'লে হু হু ক'রে জল টানে, এঁঠেল মাটী হ'লে কিছু কম টানে, আবার পাথর হলেই যে মোটেই জল টানে না, তা নয়, খুব সামান্য টানে। সেই রকম যার যেমন আধার সেই অনুয়ায়ী সকলেরই কল্যাণ হয়। যে দেশে বা যে সময়েই হোন, ঠিক অবতার হ'লে অর্থাৎ ঠিক সেই স্তর থেকে

এলে তাঁকে ঠিক একই কথা বলতে হবে, কারণ দুই নেই, সেই স্তরে মন উঠলে এক ছাড়া দুই দেখতে পারে না। যেমন, যে যে এই ঘরে এসেছে তাদের সকলকেই বলতে হবে, ঘরের দেওয়ালটা সাদা, এ না বললে বুঝতে হবে, সে এ ঘরে কখনই আসেনি। তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে উপদেশের রকম ফের হতে পারে মাত্র। যেমন লোক পাওয়া যাবে, তাদের যেমন সংস্কার ও অবস্থা সেই অনুযায়ী উপদেশ দিতে হবে ত? নইলে কাজ হবে কেন? এক জন জেলেকে মাছ ধরার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে তার যত ভাল লাগবে এবং সে সেটা যত যত্ন ক'রে পালন করবে, তাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দু কথা বললে সে কি সেই রকম আগ্রহের সহিত শুনবে, না, সেই মত চলবে। এই হল অবতারদের বিশেষত্ব। সাধারণ মহাপুরুষ তার ভাবে হয় ত খুব ভাল উপদেশ দিয়ে গেল, হয় ত আধার অনুযায়ী দু এক জনের ভালই হল। কিন্তু সাধারণ সে ভাব নিতে পারবে কি না এবং কি ক'রে সাধারণকে এই ভাবে নেওয়ান যায় এ ধরতে বা ব্যবস্থা করতে পারবে না। আর অবতার যার যেমন ভাব সেই ভাব দিয়ে আগে তাকে লইয়ে, তার আধার তৈরী করিয়ে, ভাব ধরবার ও সেই মত গতি করবার ব্যবস্থা করিয়ে দেন। তা ছাড়া কল্যাণ জিনিষটাই ত সূক্ষ্ম, কাজও হচ্ছে মনে, সেও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীরটা এখানে আসবার আগেই সূক্ষ্ম মনটা এখানে এসে গেছে, মনটা এখানে আসায় তবে ত তোমার আসার ইচ্ছা হলো তখন দেহটাকে নিয়ে এলে। এই যে প্রণাম কর, এও সূক্ষ্মে মন দিয়ে আগে প্রণাম করা হয়ে গেছে। তার পর নীতি অনুযায়ী মাথা নীচু কর। কাজেই ***দেহ সঙ্গ না হ'লেও অবতার এলেই জগতের প্রত্যেকেরই মঙ্গল হয়, একটা ভাব ফিরে যায়।***

জিতেন। তা হলে অবতারদের ত সকল সময়েই দ্বৈত জ্ঞান রয়েছে।

ঠাকুর। নিশ্চয়ই, ঠিক দ্বৈত জ্ঞান না থাকলে লোকশিক্ষার কাজ হবে না। জগৎ যদি সেই এক ব্রহ্মময় হ'লো ত উপদেশ দেবেন কাকে?

অদ্বৈত ভাবের মধ্যে দ্বৈত ভাব রেখে কাজ করতে হবে। অবতার এই কথা বললেই বুঝতে হবে দ্বৈত ভাব রয়েছে। এ কি রকম জান, যেমন মাছ জলেই রয়েছে, তবে কম জলে থেকে যখন খেলা করছে তখন যে কেউ গিয়ে একটু ঠেলে দিলে মাছ বেশী জলে গিয়ে পড়ায় ভাল ভাবে খেলতে ও বাড়তে পারে, তেমনি অবতার আদি জীবের ভাবটা ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেন।

নগেন কাশী থেকে একটা লিখে পাঠিয়েছে তার ভেতর স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে সে লিখেছে, যে যখন যেটা তার ভাল লেগেছে তখন সে নিজের বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে অপরটা ছেড়ে সেইটে নিয়েই সে চলেছে। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর। এটা ঠিক স্বাধীন ইচ্ছা হল না। দুটো ভাব আছে, প্রকৃত স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারিতায় যখন যেটা ভাল লাগল সেটা যথার্থ ভাল কি মন্দ না বুঝে সেই মত চলবে। তুমি সেটা ভাল ব'লেই নিচ্ছ, কিন্তু তোমার সে জ্ঞান নেই, তুমি বুঝতে পার না, বাস্তবিক সেটা ভাল কি মন্দ। হয় ত যেটা ভাল ব'লে নিয়ে গতি করলে তাতে ভবিষ্যতে মন্দ হল। তা হ'লে ভাল কি মন্দ যখন এই, জ্ঞানই রইল না তখন স্বাধীনতা কোথায়? সাধারণ ভাবে বাজারে গিয়ে আলু না কিনে পটল কিনবে এই টুকু স্বাধীনতা হয় ত রইল কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার স্বাধীনতা আছে কি? তখন ডাক্তারের কথা শুনতেই হবে। সংসারে বাসনা প্রভৃতিতে বাঁধা রয়েছ, বাসনা যেমন চালাচ্ছে ঠিক তেমনি চলছ, এক চুল এ দিক ও দিক করবার ক্ষমতা নেই, আবার স্বাধীন বলছ কি ক'রে? ***আগে বাঁধন ছেঁড়, বাসনা কামনা জয় কর, নিজের মনের উপর নিজের কর্তৃত্ব আন, তবে ত বলতে পারবে স্বাধীন।*** তখনই স্বাধীন ভাবটা কি, ঠিক বুঝতে পারবে, তখনই এটায় ভাল হবে কি মন্দ হবে ঠিক ধরতে পারবে ও বিচার করতে পারবে। তা ভিন্ন, বাঁধা অবস্থায় বিচার করতে গেলেই একটা আধটা জায়গায় হয় ত

হঠাৎ মিলে যেতে পারে, কিন্তু প্রায় সব জায়গাতেই অবিচার ক'রে বসবে।

জিতেন। শাস্ত্র প'ড়ে অনেক সময় ভুল বুঝে গোঁড়ামি করতে গিয়ে যখন খারাপ হয় তখন শাস্ত্রের দরকার কি?

ঠাকুর। শাস্ত্র চাই বই কি, শাস্ত্র হচ্ছে যার দ্বারা মনকে শাসন করা যায়। শাস্ত্র না থাকলে সমাজ থাকবে না যে। শাস্ত্রে সবই ঠিক আছে, ভুল কিছুই নেই, তবে জিনিষ হিসেবে তফাৎ দেখায়। যেখানে ভক্তির কথা আছে, সেখানে তোমার ভাব বাড়াবার জন্য ভক্তিটাই সব চেয়ে বড় ক'রে ফুটিয়ে গেছে, নইলে তোমার মন অত জোর ক'রে বসবে না। তেমনি আবার যেখানে জ্ঞানের কথা ব'লে গেছে, সেখানে সেইটাকেই খুব বড় ক'রে গেছে কিন্তু তা ব'লে কি কোথাও লিখেছে যে কেবল এইটাই ঠিক আর বাকী সব ভুল? এই গুলো ঠিক বোঝবার দোষেই হয়। জ্ঞান পথে বলছে, যে তোমার বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, নিজে বিচার ক'রে মন্দ ত্যাগ ক'রে চলবে; আবার, ভক্তির জায়গায় বলছে অবিচারে গুরু বাক্য শুনে চলবে। যে ভক্তি পথে যাচ্ছে তার এই দুটো জায়গা পড়লেই ঠিক ভাব না ধরতে পারলে ভক্তি পথে একটা ধাক্কা লাগল, যে তা হ'লে. কিছু বিচার করা উচিত। সেই জন্য সদগুরুর কাছে ছাড়া শাস্ত্র পড়তে নেই তিনি সব ভাবে সমতা রক্ষা ক'রে বুঝিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক ভাব টা ঠিক খারাপ নয়, এই সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া গতি করতে পারবে না। যখন যে পথে গতি করছ, তখন ভাবতে হবে গুরু যেটি ব'লে দিয়েছেন নিশ্চয়ই ভালর জন্য, এ সম্বন্ধে ভাল কি মন্দ কোন বিচার না ক'রে বা তিনি অপরকেই বা কি বলছেন সে দিকে কান না দিয়ে তোমার ভাবটাই শুধু বড় ক'রে ধ'রে চলবে। অপর ভাব দরকার নেই ব'লে ছেড়ে দেবে, এ সাম্প্রদায়িকতা দরকার। কিন্তু তা ত কর না নিজের কাজ না ক'রে, যার যার নিজের ভাবটা শুধু তার নিজের জন্যই, ঠিক এইটা না

ধ'রে অপরের ভাব গুলো খারাপ বলতে গিয়েই না, যত গণ্ডগোল পাকাও, অপরের ভাব যাই হোক তোমার তাতে কি ? সে যে বোঝবার বুঝুক গে, তোমার নিজের ভাব রেখে চল। শেষে তোমার ভাব ঠিক হ'য়ে গেলে তুমি ঠিক জায়গায় পৌঁছুলে অপরের ভাব দেখতে পার। তখন দেখবে সবই এক, ভিন্ন পথ মাত্র, যে দিক দিয়েই যাও সেই এক জায়গায় পৌঁছুবে, মিছে গতি না ক'রে পথে, মাঝখানে পথ নিয়ে মারা মারি ক'রে আসল কাজ হারিয়ে ফেল। যে যে ভাবে চলছ, সেই ভাবের পূর্ণতা পেলেই হ'ল। তাঁর অনন্ত ভাবের পূর্ণতা বোঝবার ক্ষমতা কই যে বুঝবে ? বৃন্দাবনে পাঁচটা ভাব পূর্ণ হ'ল। তেমনি যার যে ভাব সেইটে পূর্ণ হলেই, তার কাছে সেই পূর্ণভাব। তুমি আনন্দ পেয়েছ ভাল, অপরের ভাবে সে আনন্দ পেলে কি না, এ মারা মারির দরকার কি ? তাঁর পূর্ণ ভাব বুঝতে গেলে সেই স্তরে উঠতে হবে, তবে ত বুঝবে, আর সেখানে গেলে তুমি নিজেই ত পূর্ণ হ'য়ে গেলে, বুঝবে আর কি ? ধর্ম্ম করতে গিয়ে যদি সংসারী ভাবে হিংসা দ্বেষ নিয়ে ঝগড়া কর ত ধর্ম্ম হ'ল কোথায় ? এ ত অধর্ম্ম। ধর্ম্ম হচ্ছে ময়ান, যেমন লুচিতে ময়ান দিলে নরম হয়, তেমনি ***ধর্ম্মের লক্ষণ হচ্ছে নরম হবে, উগ্রতা ক'মে যাবে। যত উপেক্ষা করতে পারবে, যত নম্রতা থাকবে, যত ধৈর্য্য থাকবে, যত স্থির থাকবে, তত বুঝতে হবে তোমার ধর্ম্ম হচ্ছে। ধর্ম্মের লক্ষণই হচ্ছে মনকে নির্ভীক রাখবে,—চিন্তাশূন্য রাখবে, মনে সর্ব্বদা আনন্দ রক্ষা করবে, এবং সকলকেই ভালবেসে আপন ক'রে নেবে।*** এই ত সাধনা, সাধারণতঃ সকলকে ভাল বাসতে পার না, তাই এই সাধনা করছ ত যাতে সকলকে ভাল বাসতে পার। এই হ'ল আসল। মনটা তৈরী করাই দরকার। দেহের কঠোরতা যে খুব দরকার, তা নয়, তবে কঠোরী হ'লে হঠাৎ প্রকৃতির ধাক্কায় তোমায় দুঃখ দিতে পারবে না একটুতেই শরীর এলিয়ে পড়বে না। কাজেই মনে একটা সাহস থাকে, নির্ভিক ভাব আসে।

ডাঃ সাহেব। চিন্তাশূন্য যে হওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ ভেবেই বেশী চিন্তা আসে যে ?

ঠাকুর। সেই টাই চেষ্টা করতে হবে। দুঃখে পড়লে না হয় চিন্তা এল, কি করবে। কিন্তু যখন ভবিষ্যৎ ত কিছুই জান না, কিছুই তোমার জানা নেই বা তোমার আয়ত্তে নেই, তখন তাই নিয়ে ভেবে মিছে দুঃখ পাও কেন ? অবস্থা না হ'লে অবশ্য চিন্তা ছাড়া শক্ত, তবে চেষ্টা করতে হবে যে চিন্তা করবে না, এলেও সেটাকে তখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। কেবল এই দিকেই লক্ষ্য রাখলেই চিন্তা আপনি ক'মে আসবে।

জিতেন। লোকে দেবস্থানে গিয়ে কত মানসিক করছে, তারকনাথে গিয়ে হত্যে দিচ্ছে। তিনি ত মানসিক প্রভৃতির জন্য লালয়িত নন, অথচ দেখা যায় যে অনেক জায়গায় যারা মানসিক করে বা হত্যা দেয় তাদের কামনা সিদ্ধ হয়।

ঠাকুর। তিনি কিছুই চান না, তবে তোমরা নিজেরা যে ভাবে ভালবাস সেই ভাবে আত্মবৎ সেবা করতে চাও ব'লে মানসিক করছ এবং দেখাচ্ছ, তোমায় তুষ্ট করবার জন্য না খেয়ে, দেহের উপর কত কষ্ট স্বীকার ক'রে, তোমায় ডাকছি তোমার দয়া হবে না কি ? মানসিক গুলোকে কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জরিমানা দেওয়ার সামিল ধরতে পার। তা ছাড়া, যখন মানসিক করছ, তখন তাঁকে ঠিক ডাকছ না। সেই সেই শক্তিকে ডাকছ, যার দ্বারা তোমার মানস পূর্ণ হতে পারে। তাদের জন্য নানা জিনিষ নিয়ে মানসিক করার প্রথা আছে। তারকনাথে হত্যা দেওয়ার অনেকেরই ফল হয়, খুব কম ব্যর্থ হয়। তারকনাথে একটা বিশেষ শক্তি আছে। একবার আমি গিয়েছিলুম, তা একটী জটাধারী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখেছিলুম, তার সঙ্গে কথা হয়েছিল।

জিতেন। এই যে সকাম উপাসনা, এ গুলো কি আন্তরিক ? সকাম হলেও তাঁকে ডাকার জন্য একটা ফল আছে ত ?

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাঁকে ডাকলেই কিছু ফল আছেই। যে যে কামনা নিয়ে তাঁকে ডাকে, সেই সেই ভাবে তাদের আন্তরিকতা আছে বৈকি। ধর ছেলের অসুখের জন্য যখন তাঁকে ডাকে, তখন খুব আন্তরিকতার সহিতই ডাকে, কিন্তু হয় ত কর্ম্মফলে সে সারল না, ম'রে গেল। কোন অন্যায় কাজের জন্য ছেলে ম'রে যাওয়ায় শোক পেলে বটে কিন্তু তাঁকে যে ডাকলে তার জন্য কিছু ভাল ফল হবে। সুখ দুঃখ যখন কোনটাই স্থায়ী নয় তখন কেবল সুখের কামনা করাই ভুল। যতই ডাক না দুঃখ আসবে না, টানা সুখ ভোগ হবে, এ ত আর হতে পারে না। তবে যদি বড় জিনিষ অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য প্রার্থনা ক'রে তাঁকে ডাক, ত, ক্রমশঃ দুঃখ ক'মে আসবে ও সুখের ভাগ বেড়ে আসবে এবং শেষে শান্তি পাবে।

জিতেন। এ দিকে বলছে, আত্মহত্যা করলে মহা পাপ, আবার, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে বা ব্রত ক'রে আত্মহত্যা করলে পাপ হয় না।

ঠাকুর। কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ গঙ্গায় ঝাঁপ দেয় বা ব্রত ক'রে আত্মহত্যা করে। এই সৎ উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা আর দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা কি এক হতে পারে? অসুখের সময় ব্রাণ্ডি খাওয়া আর নেশার জন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া কি এক জিনিষ হয়?

কৃষ্ণ কিশোর। আপনি যে বলেন, যে যেটা উপেক্ষা করে, সেটা তার পেছনে ছোটে, তা এ পথে আসবার সময় আত্মীয় স্বজন উপেক্ষা করলে, তারা পেছনে পেছনে এলে ত ভয়ানক অশান্তি। অথবা আমার সামনে স্ত্রী অন্য পথে গেলে লোকে আমায় যা তা বলবে, এসব সহ্য করা যায় কি ক'রে।

ঠাকুর। ওটা ত পাতঞ্জলের কথা। তুমি তাঁর নামে আছ, অর্থ, যশ, মান কিছুই চাচ্ছ না, অথচ আপনা আপনি তোমার হয় ত অর্থ আসছে, যশ মান আসছে, ওটা সাধারণ সংসার সম্বন্ধে নয়। আবার, সংসার ভাব নিলেও দেখ, তুমি যখন ধর্ম্মের পথে আসতে চাচ্ছ, এবং সেই জন্য আত্মীয় স্বজন ছাড়ছ, তখন আত্মীয় স্বজনের তোমার ওপর

মায়া রয়েছে ত ? তারা তোমায় ছাড়বে কেন ? তারা ত চাইবে, তারাও যে পথে যেমন ভাবে যাচ্ছে তুমিও সেই পথে সেই ভাবে চল। তার জন্যে তারা তোমায় গালাগাল দেবে, কত বাধা দেবে, এটা স্বাভাবিক, কারণ কেউ চায় কি, যে তার মায়ার জিনিষ তার কাছ থেকে অন্য পথে যায় ? তুমি যদি উপেক্ষা করতে চাও, ত এ সব উপেক্ষা করবে। আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, সবই যখন উপেক্ষা করতে চাচ্ছ, তখন তারা গালাগাল দিক, যা খুসি করুক, যার যে দিকে ইচ্ছে যাক, তার জন্য লোকে যত গালাগাল দিক, নিন্দে করুক, সমস্তই তোমার উপেক্ষা করতে হ'বে। তা না হ'লে উপেক্ষা করলে কি ? তুমি তাদের উপেক্ষা করবে, আর তারা তোমার মতে চলবে, এ চাও যদি, তাহলে উপেক্ষা করলে কই ? এর মানে হচ্ছে, তোমার তাদের ওপর মায়া আছে, তবে, ক্ষণিক উত্তেজনায় উপেক্ষা ক'রে ছেড়ে আসতে চাচ্ছ। তাই, তাদের চিন্তা মনে ঠিক সমান ভাবেই রেখেছ। যে জিনিষ উপেক্ষা করতে চাচ্ছ, সে সংক্রান্ত যে কোন জিনিষ, ভাল মন্দ, সমস্তই উপেক্ষা করতে হবে। মনে সে সংক্রান্ত কোন চিন্তাই আসতে দেবে না। মায়া থাকতে ঠিক উপেক্ষা হয় না। তা ভিন্ন, দুটো একটা ছাড়ার নাম উপেক্ষা নয়। সংসারে সকলেই সকল জিনিষে মন দিতে পারে না। আপনা হতেই কোন চেষ্টা না ক'রে অনেকে অনেক জিনিষ উপেক্ষা ক'রে থাকে। তুমি যখন উপেক্ষা করতে চাচ্ছ, তোমার মনের এমন শক্তি থাকা দরকার, যে, সে জন্য যে যাই বলুক যত অশান্তিই আসুক, কিছুই গ্রাহ্য করবে না। এই হ'ল ঠিক উপেক্ষা, এতে শান্তি পাবে। এমন কি ***ঠিক ঠিক সব জিনিষ উপেক্ষা করতে পারলে ভগবানকে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।*** যতক্ষণ না মনের সে শক্তি আসে, যতক্ষণ না মায়া চ'লে যায়, ততক্ষণ জোর ক'রে উপেক্ষা করতে গেলেই ঘোর অশান্তি পাবে। রাস্তার অপর পাঁচ জন তোমায় অশান্তি দিতে পারে না কেন ? আর তোমার আত্মীয় স্বজনই বা এত অশান্তির সৃষ্টি করে কেন ? আত্মীয় স্বজনের ওপর তোমার মায়া আছে,

তাদের কাছ থেকে কিছু আশা রেখেছ। তা ছাড়া তুমি কিসের ভয় করছ? মানুষ মানুষের কতটা অনিষ্ট করতে পারে? বড় জোর তোমার ভোগের ওপর আক্রমণ করতে পারে, তোমার মনের ওপর কারুর কোন হাত আছে কি? তুমি যদি ভোগ বাসনা সমস্ত ছেড়ে দাও, ত, তারা তোমার আর কি করবে? সবই তোমার নিজের মনের শক্তির ওপর। তুমি যদি জোর ক'রে বল, যে আমি এ কাজ করব না, কার সাধ্য আছে তোমায় জোর ক'রে সে কাজ করায়? তবে যতক্ষণ না, মনে শক্তি আসে, ততক্ষণ দু দিক সামঞ্জস্য ক'রে বজায় রাখ। সংসার কর, আবার সাধু সঙ্গও কর ও সৎ নীতিতে সৎ ভাবে থেকে তাঁকে ডাক। তার পর যখন মনের শক্তি আসবে তখন সব উপেক্ষা করতে চেষ্টা ক'র।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। সঙ্গই প্রধান। সদগুরুর সঙ্গ করলে সত্ত্ব গুণ বাড়ে এবং জন্ম জন্মান্তরীণ অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ঠিক ঠিক মন দিয়ে যার সঙ্গ করবে তার ভাব সব আপনি আসবে। সেই জন্যে ব'লেছে ***যার সদগুরুতে ঠিক ভক্তি বিশ্বাস আছে, যে সকল সময়ে তাঁর চিন্তায় থাকে সে মুক্ত হবেই।*** সদগুরু সঙ্গের এমনি প্রভাব যে যারা সংসারটা ছোট ক'রে তাঁর সঙ্গটাই বড় করেছে অর্থাৎ যারা সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকতে চায় এবং যতক্ষণ সংসার রয়েছে, যে টুকু না হ'লে নয়, সেই টুকু যময় মাত্র সংসারে দিয়ে বাকী সব সময় গুরুর কাছে থাকে, তাদের এক জন্মেই কাজ হ'য়ে যায়, অর্থাৎ এক জন্মেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হ'য়ে যায়: তারা সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকতে পায় এবং তিনি যে লোকে যান সেখানে তাঁর সঙ্গে যেতে ও থাকতে পারে। আবার তিনি যখন আসেন তখন তারাও সঙ্গে আসে। এই খানেই এদের লক্ষণ বোঝা যায়। এদের ভাব হচ্ছে "গুরু গত প্রাণ গুরু ধ্যান জ্ঞান গুরুপদে মতি আত্মসমর্পণ" গুরুর কাছে থাকা, তাঁর সেবা করা, তাঁর উপদেশ মতে

চলা ভিন্ন তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। তারা গুরু সঙ্গ ছাড়তে চায় না, যেতে বললেও যেতে চায় না, তবে দায়ে প'ড়ে নেহাত না গেলে নয় ব'লে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসারে যায় কিন্তু মনটা তাঁর কাছেই প'ড়ে থাকে, একটু ফুরসুত পেলেই ছুটে আসে, দেহ সুখ, সুবিধা, অসুবিধা কিছুই আর তখন দেখে না। যারা সদগুরুকে ভালবাসে ও গুরু সঙ্গ করে, অথচ সংসারে মায়া আছে ব'লে সেটাকে একেবারে ছোট ক'রে গুরু সঙ্গটাই বড় করতে পারে না, তাদের দুই জন্মে কাজ হবে। আর যারা সংসার টা বড় করেছে অর্থ, সম্পদ, যশ, মান, দেহ সুখ প্রভৃতি যাদের প্রধান লক্ষ্য অথচ সদগুরুতে কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাদের তিন জন্মে কাজ হবে। তা হলেই দেখ, ***কিছু মন থাকলেই সদগুরুর সঙ্গে বড় জোর তিনজন্মে কাজ হবেই।*** আবার কারুর বা এক জন্মেই তিন অবস্থা হতে পারে। প্রথমে হয় ত সংসার দুঃখের জ্বালায়, সংসার বাসনা নিয়ে সদগুরুর কাছে এল, তার পর সঙ্গ করতে করতে হয় ত একটু ভাল-বাসা পড়ল। তখন গুরু সঙ্গ করতে ভাল লাগে এবং সংসারে মায়া আছে ব'লে সংসারটা বজায় রেখে বাকী সময় গুরু সঙ্গে কাটাতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এই রকম করতে করতে হয় ত এমন ভাব আসতে পারে যে তখন তার সংসারটা আর মোটেই ভাল লাগে না এবং গুরুর সঙ্গ আর ছাড়তে পারে না, এইটাই তখন তার কাছে সব চেয়ে বড়, আর সব তুচ্ছ। তাই সঙ্গকে এত বড় ক'রেছে, সঙ্গ ছাড়া কিছু হবে না। সুখ দুঃখ জগতের নিয়ম, জীবন ভোর সুখের চেষ্টা ক'রে দেখছ ত, নিজে সুখী হতে পারছ না, বা কাউকেও সুখী করতে পারছ না, যা ঘটবার ঠিক ঘ'টে যাচ্ছে, তখন নিজে চেষ্টা ক'রে, নিজে খেটে, কিছু করা যায়, শুধু এটার উপর না থেকে, সকল সময় সংসারে ডুবে না থেকে, কিছু সময় অন্ততঃ সদগুরু সঙ্গ কর। তাতে মনের শক্তি বাড়বে, ঠিক জ্ঞানের উদয় হবে এবং তখন দুঃখ বেশী তোমায় অভিভূত করতে পারবে না। শাস্ত্রে ত আছেই

"কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ ও দেশ ক'রে মর, বিধির লিপি কপাল জোড়া" ॥

যেটুকু প্রালব্ধে আছে আসবেই, কাজেই তার পেছনে বেশী মন না দিয়ে আসল সুখের চেষ্টায় কিছু সময় কাটাও। যদি আসল সুখ পেতে চাও ত সদগুরুতে ঠিক ঠিক মন দাও, তাঁর ওপর স্থির বিশ্বাস রেখে চল, দেখবে দুঃখ এলেও তোমায় পেড়ে ফেলতে পারবে না। কবীর ব'লে গেছেন "যার গুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে সে সর্ব্বদাই অমর লোকের সঙ্গে বাস করে"। ঠিক বিশ্বাস বড় সোজা নয়, এতে স্বার্থ থাকে না, ভাল বা মন্দ কোন বিচার আসে না। সাধারণ বিশ্বাস, ভালবাসা ব'লতে খণ্ড বিশ্বাস খণ্ড ভালবাসা বোঝায়। যত ক্ষণ ঠিক মনের মত কাজ হয় তত ক্ষণ বিশ্বাস ঠিক আছে কিন্তু যেই একটু এ দিক ও দিক হ'ল বিশ্বাস অমনি নষ্ট হয়ে গেল। যত ক্ষণ দেহসুখ, অর্থ, সম্পদ প্রভৃতিতে মন থাকে তত ক্ষণ বদ্ধ, তত ক্ষণ ঠিক বিশ্বাস আসে না। কারণ অর্থ, সম্পদাদিতে মানুষ স্বতঃই দাস হ'য়ে থাকে। মনের খুব শক্তি না থাকলে এ সবের প্রভাব সহ্য করা যায় না। যে এই গুলো অধীন করতে পারে সেই কিছু বুদ্ধিমান, সেই কিছু শান্তি পায় তা ভিন্ন, সংসারে আজ যে বুদ্ধিমান কাল যে বোকা। সদগুরু সঙ্গ করলে এই সংসার বৃত্তি গুলো আপনি ক'মে আসবে এবং মন সংসার থেকে ঘুরে সৎ দিকে গতি করতে থাকে। সদগুরু বিজ্ঞানময় কোষে থেকে আনন্দময় কোষের ছায়া লাগিয়ে দেন ব'লে সদগুরু সঙ্গ করলে এত আনন্দ পাওয়া যায়। তাই সদগুরু এত আপন, আর এই আপনত্বে যারা ছোটে তাদের ভেতর স্বতঃই তাঁর সৎ ভাব আসতে থাকে ব'লে সহজে সেই দিকে গতি করে।

গোবর্দ্ধন গাহিল

মনের বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পারে মা কালী কালী।
হৃদ মাঝারে উদয় হ'য়ো মা যখন করবে অন্তর্জ্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিলায়ে ভক্তি চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে কালী নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে বলবে কালী উচ্চৈঃ স্বরে,
কেহ বলবে হরে হরে করে দিয়ে করতালি॥

চতুর্থ ভাগ—অষ্টাদশ অধ্যায়

কলিকাতা, রবিবার ১লা আশ্বিন ১৩৪০,
ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তরাজ, ডাঃ সাহেব, ললিত, কালু, পুত্তু, জিতেন, কেষ্ট, দ্বিজেন, হর প্রসন্ন, মৃত্যুন, কৃষ্ণ কিশোর, ললিত ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ, বিভূতি, কিরণ মজুমদার, কেবল, গতিকৃষ্ণ, দাশরথী, অজয়, মতি ডাঃ, অমল, ভোলা, অভয় প্রভৃতি আছে।

জিতেন। প্রেম না লাগলে কিছু হয় না বলেন, এ প্রেমটা কি চেষ্টা ক'রে আনতে হয়, না আপনি আসে?

ঠাকুর। প্রেম ত বাইরের জিনিষ নয়। এ ত ভেতরেই রয়েছে। খুব খণ্ড ভাবে অনেকের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। সেই গুলো গুড়িয়ে একটার ওপর প'ড়লেই সেইটার জন্য উন্মাদনা আসে।

প্রেমের প্রথম অবস্থায় বৈধী ভক্তি। গোড়ায় বৈধী না হ'লে গতি ক'রবে কি ক'রে? প্রেম লাগান ভক্তি তা'র জিনিষ।

বিভূতি। মন্ত্র জপের চেয়ে প্রেম বড় ত।

ঠাকুর। মন্ত্র জপ মন লাগাবার একটা উপায়। কিন্তু ***প্রেমটা হচ্ছে ফল, প্রেম না এলে ভগবান লাভ হয় না।***

কৃষ্ণ কিশোর। পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণ এটা কি আপনা আপনি হয়? এর হাত থেকে রক্ষা করা যায় কি ক'রে?

ঠাকুর। পুরুষ স্ত্রীর স্বতঃই স্বভাব পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের আকর্ষণ ঢের বেশী। তাই, কাম, ক্রোধ, লোভ রিপুর কাছ থেকে সর্ব্বদা আলাদা থাকতে ব'লেছে। এই রিপুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে চোখের দৃষ্টি ঠিক রাখতে হবে যাতে এই দিকে বেশী নজর না পড়ে। সৎ সঙ্গ ক'রে বা ধ্যান জপ দ্বারা মনকে অপর জিনিষে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখানে রিপুর জিনিষ গুলো খুব সুলভ না হয় অর্থাৎ খুব সহজে না পাওয়া যায়। তারা দুর্লভ হ'লে তোমার মনে ইচ্ছে হ'লেও যখন পাবে না, তখন তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

কৃষ্ণ কিশোর। পুরুষ স্ত্রী যে পরস্পর আকর্ষণ করে এটা তারা বুঝতে পারে ত?

ঠাকুর। তা কি সব সময় বুঝতে পারে? সংসারে যে প'ড়ে রয়েছ, তার মধ্যে যে সর্ব্বদা ডুবে রয়েছ, এ কি বুঝতে পার না ধরতে পার? বললেও কি ধরতে পার? যখন ঠিক বুঝতে পারবে তখন ত সব ছেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

বিভূতি। ভেতরে সব বৃত্তি পোরা থাকলেও, গুরুতে মন দিলে কি এ গুলো ক'মে আসে?

ঠাকুর। এ গুলো কমাবার জন্যই ত সদগুরুর সঙ্গ। সদগুরু সঙ্গ এক প্রকার সাধনা। অপর সকল সঙ্গ ছেড়ে কেবল সদগুরুর সঙ্গ করলে আপনি ক'মে আসবে, কারণ সঙ্গ করতে করতে, যত সঙ্গে মন

পড়বে তত এই বৃত্তি গুলো নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে। শেষে এমন হ'য়ে যায় যে ওদের কোন কাজ থাকে না।

বিভূতি। অর্থ ও ধর্ম্ম দুটোতে ত বৈরী ভাব মনে হয়, অথচ ঋষিরা নিজেরা রোজগার না ক'রে রাজার সাহায্য নেন কেন?

ঠাকুর। অর্থের জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ কর ব'লে বৈরী মনে হয়, তা ভিন্ন বৈরী নয়। আবার অর্থ না হলে ত ধর্ম্মের প্রচার হবে, না। ঋষিরা রাজাদের সঙ্গে থেকে তাদের মন ফিরিয়ে দিয়ে, সেই অর্থ ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করায়। তা ছাড়া, ধর্ম্ম প্রসারের বাধা বিঘ্ন গুলো নষ্ট হবে কি ক'রে। টাকাটা ত খারাপ নয় টাকায় বদ্ধতাই খারাপ। একটা ভাব আছে, তোমার সংসার বাসনা যায় নি, সে জন্য কিছু টাকা দরকার, শুধু সেইটের জন্যই চেষ্টা করছ, বেশী চাও না বা তার জন্য চেষ্টাও কর না। কিন্তু তা ব'লে আপনা আপনি বেশী এসে যায় ত আপত্তি করো না, সেই অর্থ সৎ কাজে ব্যয় করবার জন্য গ্রহণ কর। আবার একটা ভাব আছে, ঠিক যত টুকু দরকার সেই টুকু ছাড়া আর বেশী এলেও নাও না। তবে, কোন অর্থেরই প্রয়োজন নেই, এ অবশ্য আলাদা অবস্থা। সাধারণ, সম্পদের প্রভাব সহ্য করতে পারে না। খুব মনের শক্তি না থাকলে সম্পদে ঠিক থাকতে পারবে না।

বিভূতি। সদগুরুর কাছ থেকে বীজ মন্ত্র পেয়ে দীক্ষিত হলেই ত শিষ্য হ'ল, তখন তাদের তিন জন্মে কাজ হবে। যারা দীক্ষা নেয় নি, অথচ ভক্ত, তাদেরও কি তিন জন্মেই হবে?

ঠাকুর। হ্যাঁ, দীক্ষা নিলেই শিষ্য হ'ল, তাদের সকলেরই তিন জন্মে হবে, যে যে ভাবেই থাক, যে স্তরেই প'ড়ে থাক, তাকে তৃতীয় জন্মে ঘুরে আসতেই হবে এবং তিন জন্মে সে মুক্ত হবেই। তবে সদগুরু চান, সকলেরই এক জন্মে কাজ হোক। যারা অন্যত্র দীক্ষা নিয়ে কোন সদগুরুর কাছে ভক্তি সহকারে আসে, তাঁর সঙ্গ করে, এবং অপর পাঁচটা ভাব না নিয়ে বা অপর সব উপদেশ ছেড়ে কেবল তাঁর আদেশ মত ঠিক এক ভাবে চলে, তাদেরও তিন জন্মেই হবে। জন্ম

জন্মান্তরীণ কর্ম্ম ধরলে আলাদা কথা। তা ভিন্ন, এমন দেখা যায় যে হয় ত খুব নিচু স্তরে রয়েছে, সৎ অনুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুই করে না, এমন কি অসৎ বৃত্তিতেই রয়েছে, তত্রাচ সদগুরুর সঙ্গ হওয়া মাত্রই সব চট্ চট্ ক'রে ছেড়ে গিয়ে, সব বাধা বিঘ্ন ছিঁড়ে, ভাব এমনি বদলে গেল যে তার সেই জন্মেই কাজ হ'য়ে যায়। আবার হয় ত, বেশ সদনুষ্ঠানাদি ক'রে যাচ্ছে, কোন অসৎ বৃত্তিতে নেই, অথচ হঠাৎ একটা কিছু হ'তে পারে না, সাধারণভাবে রগড়াতে রগড়াতে গতি করে। কার যে কোথা থেকে কাজ হয় তা বলা বড় শক্ত। গোড়া দেখে সব সময় বলা যায় না শেষে কি হবে। শেষে যে অবস্থা হবে সেইটাই ত আসল। তখন তার প্রকৃত অবস্থা কি বোঝা যায়। সেই জন্য কেউ হীন অবস্থায় প'ড়ে থাকলেও তাকে ঘৃণা করতে নেই। সে যে হঠাৎ বদলে গিয়ে চট্ পট্ গতি করবে না, তা কে বলতে পারে? তুবড়ির ভেতর বারুদ আছে আবার হাউইয়ের ভেতরও বারুদ আছে, কিন্তু দুই বারুদের শক্তির কত তফাৎ। তেমনি কার ভেতরে কি শক্তি পোরা আছে, যখন প্রকাশ পাবে তখনই বোঝা যাবে, আগে ত ধরা যাবে না।

ভক্তরাজ। যে সকল ভক্তদের ভাব হচ্ছে সদগুরুকেই চায়, কেবল তাঁর কাছেই থাকতে চায়, তারাই ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তারাই ত পার্শ্বদ, তারা ত সকল সময়েই মুক্ত? তথাপি দেহ ধ'রে এলেও কি সাধারণ জীবের মত বদ্ধ ভাব থাকে ও তিনি কৃপা ক'রে সেটা আবার কাটিয়ে দেন?

ঠাকুর। বদ্ধতা কাটালেই না মুক্ত। যারা সংসার যন্ত্রণাটা আর ভোগ করতে চায় না, এ থেকে উদ্ধার পেতে চায়, তারা মুক্ত হয়ে চ'লে যায়। কিন্তু যাদের ভাব সদগুরুকেই চাই, তিনি নরকেই যান আর স্বর্গেই যান, তাঁর কাছে থাকতে চায়, তারা সুখ দুঃখ আদি কিছু বোঝে না, চায় তাঁকে, তাতে দুঃখ আসে আসুক, সুখ আসে আসুক, তারাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং তিনি যখন যেখানে

যান সঙ্গে সঙ্গে যায়। এদেরই পার্ষদ বলে। এরা হয় ত কোন জন্মে বদ্ধ ছিল, সে আলাদা কথা, তা ভিন্ন এরা সর্ব্বদাই মুক্ত। তবে দেহ ধারণ করলেই কিছু বদ্ধ ভাব আসতেই হবে, এ দেহের স্বভাব, মায়া কিছু আসেই। প্রকৃতির ভেতর এলেই তার কিছু ভাব লাগবেই। এমন কি সদগুরুও অনেক সময় খানিকটা বদ্ধ ভাব দেখান। এই পার্ষদদের বদ্ধ ভাব কি রকম? ঠিক একটা আবরণের মতন ঢাকা থাকে, সেটা সরিয়ে দিলেই আসল ভাব বেরিয়ে পড়ে। হয় ত বেশ সংসারে জড়িয়ে রয়েছে, দুঃখ কষ্টেও সাধারণের মত কাঁদছে, টাকার জন্য চাকরিও করছে, বা বিষয় সম্পত্তি দেখছে, কিন্তু যেই সদগুরুর সঙ্গ হওয়া অমনি চোখ খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে চট্‌পট্‌ ক'রে সব ত্যাগ হয়ে গেল। মনে আর তখন বদ্ধতা রইল না, বিষয় সম্পত্তিই যাক আর চাকরিই যাক, কিছুতে অস্থির হয় না। এ অবস্থায় তারা সংসারে থাকলেও গুরুর ইঙ্গিত মাত্রই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে বেরুতে পারে, কারণ তারা এতে মোটেই বদ্ধ নেই।

কালু। পার্ষদরা যখন মুক্ত তখন তাদের ত কোন কর্ম্ম থাকে না। তা হলে পার্ষদের ব্যাধি আদি ভোগ হয় কেন?

ঠাকুর। তাদের নিজেদের কোন কর্ম্ম থাকে না বটে, তবে গর্ভে অনেক সময় পিতা মাতার কর্ম্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ব'লে ব্যাধি প্রভৃতি যন্ত্রনার ভোগ হয়। এরা পিতা মাতাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে জন্ম নিয়ে আসে। অবতার ও পার্ষদ কারুর বাপ মা খুব উচ্চ অবস্থার হয় না। তারা অতি সাধারণ ভাবে থাকে। এদের দ্বারাই তারা উদ্ধার পায়। কোপিল তার মাতাকে দীক্ষা দিয়ে নিজের ঘাড়ে সব কর্ম্ম নিয়ে তাকে উদ্ধার করলে।

কালু। গীতাতে আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ কর তাতে জয়ী হলে স্বর্গে যাবে। আর যারা সাধন ভজন ক'রে যাবে তারাও স্বর্গে যাবে। তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে সাধন করার দরকার কি?

ঠাকুর। সাধন ভজন ক'রে, যে স্বর্গের চেয়ে বেশী উপরে চ'লে যায়। ত ছাড়া, নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল প্রজা রক্ষা প্রভৃতি রাজ ধর্ম্ম পালনের জন্য যুদ্ধ করলে জয় লাভ করলে, স্বর্গে যাবে। নিঃস্বার্থ হওয়া চই। রাজা নিজের সুখ সম্পদ বাড়াবার জন্য বা হিংসা পরবশ হয়ে যুদ্ধ করার কথা বলছে না। পুরা কালে রাজারা সাধন ভজন ক'রে, জ্ঞান লাভ ক'রে রাজত্ব করতেন, তারা নিজের স্বার্থ দেখতেন না। নিজেরা উন্নত হলেও রাজ কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা ঋষিদের পরামর্শ নিতেন, পাছে প্রজাদের উপর অবিচার বা অত্যাচার হ'য়ে পড়ে। তার পর, যেমন রাজার সে জ্ঞান কমতে লাগল তখন প্রজাদের ভেতরে থেকে মাথা ওয়ালা কয়েক জনকে বেছে নিয়ে সভা সদ ক'রে তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাজ কার্য্য ক'রত। তার মানে হচ্ছে, যাদের মঙ্গলের জন্য রাজা হয়েছে তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করেছে। কাজেই স্বার্থ রইল কোথায়? এ নেহাত সোজা ব্যাপার নয়। তবে এই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সভাসদদের দোষে যদি ঠিক পরামর্শ না পেয়ে রাজা স্বেচ্ছাচারিতা করে সে ত আলাদা কথা। প্রচলিত প্রথা টা ত উঁচু দরের।

কীর্ত্তনের পর ঠাকুর বলছেন

ঠাকুর। বেশ, কিছু সময় তাঁকে দেবে। সঙ্গই প্রধান। সঙ্গে অনেক কাজ হয়। জগতে সকলেই চাচ্ছে কিসে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সাধারণ ভাব হচ্ছে অর্থাভাবে কষ্ট আসে খুব অর্থ আসুক, ব্যাধির যন্ত্রণা দুঃখ দেয়, ব্যাধি না হয়, ছেলে মেয়ে ম'রে গেলে শোক হয় তারা অমর হ'য়ে থাক, তা হলেই সুখ হবে। কিন্তু এ ত সংসারের ধর্ম্ম নয়। এখানে সুখ দুঃখ পর পর আসবেই কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তাই সঙ্গ করতে বলেছে, তাতে মনের শক্তি বাড়লে এগুলো তত দুঃখ দিতে পারবে না, সংসারে থেকে যখনই কোন বাসনা নিয়ে তাঁকে ডাক, তখনই সেই সেই দেব শক্তির আরাধনা কর, তাতে তাঁকে ডাকার জন্য হয় ত কিছু সুখ হতে পারে কিন্তু

দুঃখের নিবৃত্তি হবে না। ত্যাগ ভিন্ন দুঃখের নিবৃত্তি হবে না, শান্তি আসবে না। যখনই ঠিক সব ত্যাগ ক'রে তাঁর দিকে গতি করে তখনই ঠিক ব্রহ্মশক্তির আরাধনা করে। তাই বলেছে হয় নিজে বীর হও, আর না হয় বীরের আশ্রয় নাও। এক একটা গ্রহের এক একটা আলাদা দেবতা আছে তারাই কার্য্য করে। অনেক দিন সুখ ভোগ হ'লে দুঃখ উঁকি মারতে থাকবেই। সুখের পর দুঃখ আসবেই। আবার ভিন্ন স্তরের অনেক দেবতা আছে তারা যখন কাউকে বেশ সুখে সদ্‌ভাবে তাঁতে মন রেখে গতি করতে দেখে তখন দুঃখে পড়লে কতটা ঠিক থাকতে পারে এই পরীক্ষা করবার জন্য দুঃখ দেয়। এখানে ঠাকুর "রাজা শিবি, অলক্ষ্মী প্রতিমা ও ধর্ম্মের" গল্প বল্লেন। (অমৃতবাণী ১ম ভাগ, ১৯৭ পৃঃ)। রাজা ধর্ম্ম ঠিক বজায় রেখে ছিল বলে তার আবার সব ফিরে এল। এই ***ধর্ম্ম হচ্ছে সদগুরু! তিনিই ধর্ম্মদাতা, ধর্ম্মের কর্ত্তা, ধর্ম্মের সোপান, তিনিই ধর্ম্ম ভাব নিয়ে ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়ে নিয়ে ধর্মের দিকে গতি করান। যার সদগুরুতে ঠিক বিশ্বাস আছে ঠিক নিষ্ঠা আছে, তার ধর্ম ঠিক থাকবেই। গ্রহ আদি তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। সদগুরুতে ঠিক নিষ্ঠা ও স্থির বিশ্বাস থাকলে বিপদ আপদ কেটে গিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।*** তাই সদগুরুর আশ্রয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রাখতে বলেছে। তা ভিন্ন নিজেকে অনেক কষ্ট ক'রে সাধন ভজন ক'রে গতি করতে হবে। সাধক অবস্থার প্রধান জিনিষই হচ্ছে যত বাধা বিঘ্ন আসুক, যত দুঃখ কষ্ট আসুক কিছুতেই বস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন দিকে চাইবে না, কেবল একলক্ষ্য হয়ে গতি করবে, কারুর কথায় ফিরবে না। রূপ বা কোন কিছুর আকর্ষণে পেছনে তাকাবে না এবং এই করলে সংসারের কি ক্ষতি হবে না হবে এ সব বিষয় কিছুই চিন্তা করবে না তবে এ দিকে কিছু এগুতে পারবে। এইখানে

ঠাকুর "ব্যাধ ও বিষধর পিপীলিকার গল্প" বল্লেন। (অমৃতবাণী ৩য় ভাগ, ২৮৫ পৃষ্ঠা)। সদগুরু সঙ্গই সংসারীদের একমাত্র সাধনা এ ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা গতি করতে পারবে না।

দ্বিজেন গাহিল—

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি পাইনা কেন হে ডাকিয়া,
অন্ধ জনে হেরে না তোমায়, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া।
খুলে দাও আঁখি মায়ারই বন্ধন ঢালিতে ভকতি কুসুম চন্দন,
যেন শান্তি সুধা লভে এ জীবন তোমারি চরণ পূজিয়া।
ডুবে যায় রবি নাই আর বেলা, পারি না খেলিতে মিছে ধুলাখেলা,
লভিতে চরণ আকুল এ মন দেখা দাও হৃদে আসিয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী

সূচীপত্র